



আল্লাহ্ বলেন, তোমরা নামায কায়েম করো।  
আর (তা না কোরে) তোমরা মুশরিক হোয়োনা।  
(সূরা রুম ৩১ আয়াত)

# আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা

২য় খণ্ড

অধ্যাপক মাওলানা হাফিজ  
<https://www.facebook.com/178945132263517>

শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

## প্রকাশক

সুফিয়া প্রকাশনী  
কিউ, ৪ আকড়া রোড  
কোলকাতা-৭০০ ০২৪  
ফোন- ২৪৬৯ ১০৫৫

১ম প্রকাশ-মে ১৯৮০

৩য় প্রকাশ-জানুয়ারী, ১৯৯৭

৫ম প্রকাশ-মার্চ ২০০৪

পরিমার্জিত ৭ম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারী- ২০০৯

মূল্য-৬০ টাকা

## মুদ্রাকর

স্বদেশী লেজার প্রিন্টিং  
৫৮ এ/বি লোয়ার রেঞ্জ  
কোলকাতা-৭০০ ০১৯  
দূরাভাষ- ২২৮০-০৫০৫

২য় প্রকাশ- আগষ্ট ১৯৯৩

৪র্থ প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০০১

৬ষ্ঠ প্রকাশ-মে ২০০৭

## -ঃ প্রাপ্তিস্থান :-

- ১) আহলে হাদীস কার্যালয়, ১নং মারকুইস লেন, কোলকাতা- ১৬
- ২) শেখ ফয়লুল বারী, এস ১০২, মারেরোড কোলকাতা ৭০০০১৮
- ৩) মোঃ সফওয়ান, জামেয়া রহমানিয়া, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
- ৪) রহমানী শিক্ষাকেন্দ্র-অফিস বড়ুয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
- ৫) মল্লিক বুক স্টল, ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০০৭৩
- ৬) শামসী বুক সেন্টার, শামসী, মালদহ
- ৭) আদর্শ বুক সেন্টার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
- ৮) মাওলানা মোশতাক হোসেন, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর
- ৯) মাওলানা রহমাতুল্লাহ, চান্দাই মাদ্রাসানগর, বাঁকুড়া।
- ১০) ইসলামিয়া লাইব্রেরী কেওটশাহ বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা
- ১১) মাওলানা আব্দুর রউফ, খারীচালা বাজার, বরপেটা আসাম

Ayni Tuhfa Salat-e Mustafa-

By-Prof Maulana Hafez Sk. Ainul Bari Aliavee.

Price : Rs 60 00

<https://www.facebook.com/178945132263517>

# এই লেখকের ইসলামী গ্রন্থাবলী

১) আল কুরআনুল হাকীম (বাংলা ও আরবী উচ্চারণসহ বাংলা অনুবাদ ২) তফসীরে আইনী, আমপারা প্রথমার্থ ৩) ঐ শেষার্থ। ৪) সূরা ফা-তিহার তফসীর ৫) তফসীর সূরায়ে ইয়াসীন ৬) তফসীর সূরা আর-রহমান- ৭) তফসীর সূরা ক-ফ । ৮) তফসীর সূরা ওয়া-ক্বিআহ ৯) বিশ্বনবীর অমৃতবানী ১০) প্রিয়নবীর অমিয়বানী ১১) নাবী ও রসূল ১২) সলাতে মুত্তফা ১ম খণ্ড ১৩) ঐ ২য় খণ্ড ১৪) সিয়াম-ও রমায়ান ১৫) ঈদুল আযহা ও কুরবানী ১৬) আকীকা ও নাম রাখা ১৭) ইমান ও আকীদা ১৮) একমাত্র অহিকেই মানতে হবে ১৯) দৈনন্দিন জীবন ও ইসলামী দর্পন ২০) পাকা মাযার ও অসীলার তত্ত্বসার ২১) স্বপ্নের দেশে তেইশ দিন। ২২) সংক্ষেপে হজ্জ উমরা ও যিয়ারাহ ২৩) মীলাদুননবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী ২৪) কাদিয়ানী কাহিনী ২৫) কুরআন ও তফসীরের ইতিবৃত্ত ২৬) হাদীসের ইতিবৃত্ত ২৭) হাদীসের সংরক্ষন যুগে যুগে । ২৮) ছয়জন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ২৯) চার-পাঁচশো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসূলে-হাদীস ৩০) বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইবনে তাইমিয়াহ। ৩১) অনুরসরণ যোগ্য ছয় ব্যক্তিত্ব ৩২) রসূলুল্লাহর মিরাজ । ৩৩) ইসলাম ও মা-বাপ। ৩৪) ভাগ্য ও ইসলাম। ৩৫) শরীআত বিরোধী প্রচলিত কিছু রীতি । ৩৬) ভারতের মুসলিম পার্সোনাল 'ল'। ৩৭) কালিমায়ে ত্বইয়িবার শব্দাবলী ৩৮) ইসলামী তলাকবিধী ৩৯) ইলয়াসী তবলীগ ও দ্বীনে ইসলামের তবলীগ ৪০) তলাকপ্রাপ্তার খোরপোষ ও সুপ্রীমকোর্ট ৪১) আকীদার শুদ্ধি (অনুবাদ) ৪২) আহলে সুন্নাত অলজামাআতের আকীদা (অনুবাদ) ৪৩) সালাফী কায়েদা (আরাবী) ৪৪) সালাফী বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ ৪৫) ঐ ২য় ভাগ ৪৬) সালাফী সাহিত্য বীধি। (ছাপার অপেক্ষায়)- ৪৭) তফসীর সূরা মূলক ৪৮) ইংল্যান্ডে ১৪ দিন। ৪৯) বিবাহ ও ইসলাম ৫০) শবেবরাতের প্রকৃত তত্ত্ব

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

রসূলুল্লাহ (স:) বলেন, তোমরা নামায পড় ঐভাবে, আমাকে নামায পড়তে দেখে যেভাবে (বুখারী শরীফ, ৮৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম, মিশকাত, ৬৬ পৃষ্ঠা)।

# আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা

দ্বিতীয় খণ্ড

: প্রণয়নে :

মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

অধ্যাপক কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া

এম, এম, ফাষ্ট ক্লাশ, ফাষ্ট রেকর্ড, প্রাইজ ও স্কলারশিপ প্রাপ্ত (কলিকাতা)

ডিপ, ইন, উর্দু ফাষ্ট ডিভিশন, ফাষ্ট রেকর্ড, স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত;

এম, এ (আলীগড়)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## উৎসর্গ

ইবনে মাসউদ (রযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সেই দাসের মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনে তা মুখস্থ করলো এবং সে ওটাকে সংরক্ষিত কোরে অন্যের কাছে তা পৌছে দিল (মুসনাদে শা-ফিয়ী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মা-জাহ, দা-রিমী, মিশকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)।

যাঁদের আন্তরিক চেষ্টা এবং ঐকান্তিক সাধনায় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কিছু হাদীস শুনে তা এই গ্রন্থে সংরক্ষিত কোরে অন্যদের কাছে পৌছাবার চেষ্টা করতঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উক্ত দুআ পাবার আশা রাখি সেই মা-বাপের তরফ থেকে সদাকায়ে জা-রিয়াহ স্বরূপ তাঁদের প্রিয় পুত্রের এই তুহফা ‘সলাতে মুস্তফা’ আল্লাহর দয়্যারায় উৎসর্গিত হল।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

মোর এই নগন্য কীর্তি  
তাই মম অগোচরে

স্মরণ करावे मम स्मृति।  
दुआ करिओ मोर तरे।

বিনীত —গ্রন্থকার

## -ঃ সূচীপত্র :-

| বিষয়   | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| পূর্বাভাষ                                     | ১১     |
| জামাআতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব ও ফযীলত     | ১৫     |
| জামাআত ছাড়ার গোনাহ                           |        |
| জামাআত ত্যাগ করার শাস্তি                      | ১৭     |
| জামাআতের গুরুত্বদানকারী কতিপয় বিশিষ্ট নামাযী | ১৮     |
| জামাআত ত্যাগ করার শরীআতী ওযর                  | ১৯     |
| মসজিদ সালামী ও অযু সালামীর নামায              | ১৯     |
| মোনাফেকদের পক্ষে ভারী নামায এশা ও ফজরের নামায | ২১     |
| মেয়েরাও মসজিদে যেতে পারে                     | ২১     |
| কয়ব্যক্তি হলে জামাআত করতে হবে?               | ২২     |
| জামাআতে ইমাম ও মোক্তাদী কিভাবে দাঁড়াবে?      | ২২     |
| এক কাতরে একজন দাঁড়ানো যাবে কি না             | ২৪     |
| দুই ধামের মাঝে কাতার হবেনা                    | ২৫     |
| আযানের কতক্ষণ পর জামাআত হবে                   | ২৫     |
| শীত ও গ্রীষ্মে ফজরের অঙ্কে পার্থক্য           | ২৬     |
| ইসফারের ব্যাখ্যা                              | ২৭     |
| দ্বিতীয় জামাআতের প্রমান                      | ২৭     |
| এক মসজিদে একাধিক জামাআত চলে কিনা              | ২৯     |
| জামাআত না পেলে একা নামায ঘরে পড়া উত্তম,      |        |
| না মসজিদে?                                    | ২৯     |
| পুরাতন মসজিদের বৈশিষ্ট্য                      | ৩০     |
| মেয়েছেলে ইমাম কিভাবে দাঁড়াবে?               | ৩১     |
| মেয়েদের আযান ও একামত                         | ৩২     |
| ইমাম কে হতে পারে?                             | ৩২     |
| জারজ সন্তানের ইমামতী                          | ৩৪     |
| ফাসেক ও মোনাফেকের ইমামতী                      | ৩৪     |
| অযুহীন ইমামের ইমামতী                          | ৩৫     |

| বিষয়  | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| উলঙ্গ ব্যক্তির নামায ও ইমামতী                  | ৩৬     |
| ইচ্ছাকৃত বিনা অযুতে নামায পড়ার শাস্তি         | ৩৬     |
| আহলে হাদীসের ইমামতীতে হানাফীর নামায            | ৩৭     |
| ইমামের দায়িত্ব                                | ৩৮     |
| কতিপয় ইমামের বিদআত                            | ৪০     |
| মসজিদের বাইরে থেকে ইকতিদা হবে কিনা             | ৪০     |
| ইমামতীর বাস্তব অভিজ্ঞতার তথ্য                  | ৪১     |
| মোক্তাদীর কর্তব্য                              | ৪৫     |
| প্রথম কাতারের গুরুত্ব                          | ৪৫     |
| কাতার সোজা করার গুরুত্ব                        | ৪৬     |
| জামাআতের কাতারে পায়ে পা- মেলানো               |        |
| হানাফী-ফতওয়া                                  | ৪৮     |
| মাসবুক বা জামাআতে পিছু পড়ে যাওয়া             |        |
| মোক্তাদীর নামায                                | ৪৮     |
| ইমামের সালাম ফেরার পর চিল্লো দুআ পড়া সম্পর্কে | ৫০     |
| রুকু পেলো রাকআত হবে কিনা?                      | ৫১     |
| জামাআতের পরেই ইমাম ও মোক্তাদী মিলে             |        |
| হাত তুলে দুআ করা সুন্নত না বিদআত?              | ৫৩     |
| একই নামায দু বার পড়া                          | ৫৫     |
| আসরের জামাআতের সাথে যোহরের নামায হবে না        | ৫৭     |
| জামাআত চলাকালীন ফজরের সুন্নত হবে না            | ৫৮     |
| জুমআর নামাযের গুরুত্ব                          | ৬০     |
| সাহাবায়ে কেরামের নিকট জুমআর গুরুত্ব           | ৬১     |
| জুমআ নাম কেন?                                  | ৬২     |
| জুমআর দিনের বৈশিষ্ট্য                          | ৬২     |
| জুমআর মাহাত্ম্য ও নামাযীদের দায়িত্ব           | ৬৩     |
| জুমআর সময় ও আযান                              | ৬৫     |

| বিষয়                                      | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| হানাফী মতে জুমআর খুতবার আযান কোথায় হবে?   | ৬৬     |
| খুতবার সময় খতীবের কর্তব্য                 | ৬৭     |
| সুন্নতী খুতবার শব্দাবলী                    | ৭০     |
| সুন্নতী খুতবার অন্যান্য বিবরণ              | ৭১     |
| দ্বিতীয় খুতবার আরাবী শব্দাবলী             | ৭৩     |
| জুমআর খুতবাহ পরিস্থিতি অনুযায়ী হওয়া উচিত | ৭৫     |
| জুমআর আগে সুন্নত ও নফল                     | ৭৬     |
| জুমআর খুতবাহ চলাকালিন নামায                | ৭৭     |
| খুতবার সময় মুসল্লীদের কর্তব্য             | ৮০     |
| জুমআর জামাআত ও কিরাআত, তারপরে সুন্নত       | ৮১     |
| জুমআর জামাআত পুরো না পেলে                  | ৮১     |
| জুমআর পরে সুন্নত                           | ৮২     |
| জুমআর পর অযীফা                             | ৮৩     |
| জুমআর দিনে ঈদ ও বৃষ্টি হলে                 | ৮৩     |
| গ্রামে জুমআ পড়তে হবে কি না                | ৮৩     |
| গ্রামে জুমআ পড়ার হানাফী-ফতওয়া            | ৮৬     |
| জুমআর খুতবায় মাতৃভাষায় ওয়ায             | ৮৬     |
| ভিড়ের মধ্যে জুমআর নামায                   | ৮৭     |
| জুমআতে মেয়েদের শরীক হবার প্রমাণ           | ৮৮     |
| ইহুতিয়াতী বা আ-খিরী যোহর বিদ্আত           | ৮৮     |
| জুমআ 'তুল বিদা' - বিদ্আত                   | ৮৯     |
| মাসজিদে মিম্বার তৈরীকরণ                    | ৯০     |
| মাসজিদে মিম্বার কি বিদ্আত?                 | ৯১     |
| কাসর বা কাস্বের নামায                      | ৯২     |
| কতদূর গেলে কাসর চলে?                       | ৯৩     |
| কাসর কদিন পর্যন্ত চলতে পারে?               | ৯৪     |
| দ্বিখাগ্রস্থ মুসাফির কয়দিন কাসর করতে পারে | ৯৫     |



| বিষয়                                     | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| মুসাফির ইমাম কিংবা মুক্তাদী হলে           | ৯৬     |
| সফরে দু'অঙ্কের নামায এক অঙ্কে জমা করা চলে | ৯৭     |
| ঘরে থাকা অবস্থায়ও নামায জমা হতে পারে     | ৯৮     |
| কোন কোন অবস্থায় নামায জমা করা যায়       | ৯৯     |
| সফরে কাসর পড়তেই হবে কিনা                 | ৯৯     |
| সফরে সন্নত, নফল ও বিতর নামায              | ১০০    |
| সফরে কাযা নামায কয় রাকআত                 | ১০১    |
| জুমআর দিনে সফর নিষেধ নয়                  | ১০২    |
| কিবলার বিবরণ                              | ১০২    |
| সুতরার বিবরণ                              | ১০৩    |
| কাবা শরীফে সুতরা লাগে কি না               | ১০৫    |
| নৌকা, ষ্টীমার ও জাহাজে নামায              | ১০৬    |
| জন্তুর পিঠে ও গাড়ীতে নামায               | ১০৬    |
| রেলগাড়ী এবং উড়োজাহাজে নামায             | ১০৮    |
| ভয়ের সময়ে যুদ্ধের মাঠে নামায            | ১০৮    |
| তুমুল যুদ্ধের সময় নামায                  | ১১০    |
| অল্লেখক ও পলাতকের নামায                   | ১১১    |
| নফল নামাযের তহ্ব ও গুরুত্ব                | ১১২    |
| সন্নত এবং নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম        | ১১৪    |
| রাতের নফল নামাযের গুরুত্ব                 | ১১৫    |
| তাহাজ্জুদের মাহাত্ম্য                     | ১১৬    |
| তাহাজ্জুদের সময়                          | ১১৮    |
| তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা                  | ১১৮    |
| তাহাজ্জুদ নামাযের আগে করণীয়              | ১২০    |
| তাহাজ্জুদ নামাযের তরীকা                   | ১২১    |
| তাহাজ্জুদের কিরাআত                        | ১২২    |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| তাহাজ্জুদ ছেড়ে গেলে             | ১২৩ |
| বিতরের পর তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ম  | ১২৩ |
| রাতের ইবাদতের খেসারত দিনে        | ১২৫ |
| তারাবীহের বিবরণ                  | ১২৫ |
| তারাবীহের ফযীলত                  | ১২৬ |
| মেয়েদেরও তারাবীহ পড়া সুন্নত    | ১২৭ |
| তারাবীহ নামায কয় রাকআত?         | ১২৭ |
| হানাফী মতে বিশ রাকআতের অবস্থা    | ১২৯ |
| তারাবীহের জামাআত ও তার সময়      | ১৩৩ |
| জামাআতে তারাবীহ ও একা তাহাজ্জুদ  | ১৩৫ |
| তারাবীহতে কুরআন খতম              | ১৩৬ |
| খতম তারাবীহ ফরয ও সুন্নত নয়     | ১৩৮ |
| তারাবীহ চলাকালীন বিশেষ দুআ       | ১৩৯ |
| ইশরাকের নামায                    | ১৪০ |
| চাশ্ত ও আওওয়াবীনের নামায        | ১৪২ |
| চাশ্ত নামাযের সময়               | ১৪২ |
| চাশ্তের নামাযের ফযীলত            | ১৪৩ |
| চাশ্তের নামাযের রাকআত সংখ্যা কত? | ১৪৪ |
| চাশ্তের নামাযের খাস সূরা         | ১৪৫ |
| চাশ্তের নামাযে জামাআত            | ১৪৫ |
| দুপুরে নফল নামায                 | ১৪৫ |
| মগরেব পর নফল নামায               | ১৪৬ |
| কতিপয় বিশিষ্ট নফল নামাযী        | ১৪৭ |
| ঈদের নামায                       | ১৪৯ |
| ঈদের নামাযের গুরুত্ব             | ১৪৯ |
| ঈদের নামাযের আগে করণীয় কর্তব্য  | ১৫০ |
| ঈদের নামাযের সময়                | ১৫০ |
| ঈদের নামাযের জায়গা              | ১৫২ |

|  |     |
|--|-----|
| ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত নেই             | ১৫২ |
| ঈদের নামায কয় রাকআত                     | ১৫৩ |
| ঈদের নামাযের তরীকা                       | ১৫৩ |
| ঈদের নামাযে সুন্নতী কিরাআত               | ১৫৩ |
| ঈদের নামাযে বাড়তি তকবীর কয়টা           | ১৫৫ |
| তকবীর গুলোর গুরুত্ব                      | ১৫৭ |
| তকবীর গুলোর মাঝে দুই হাত তোলা হবে কিনা?  | ১৫৭ |
| মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া ওয়া-জিব          | ১৫৮ |
| শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর ফতওয়া   | ১৬০ |
| আল্লামা আন'অর শাহ কাশমীরীর ফতওয়া        | ১৬০ |
| ঈদের জামাআত না পেলো                      | ১৬১ |
| জানাযার নামায ও তার ফযীলত                | ১৬১ |
| জানাযার নামাযের জন্য অযু শর্ত            | ১৬২ |
| লাশ ও ইমামের অবস্থান কিরূপ হবে           | ১৬২ |
| মুত্তাদীদের লাইন কটা হবে                 | ১৬২ |
| মুসল্লী সংখ্যা কত হওয়া উচিত             | ১৬৩ |
| জানাযার নামায পড়ার নিয়ম                | ১৬৩ |
| জানাযার নামাযে তকবীর কয়টা               | ১৬৪ |
| জানাযার নামাযে সানা পড়তে হবে কিনা       | ১৬৪ |
| সানার পর সুরায়ে ফাতেহা ও একটি সূরা পাঠ  | ১৬৫ |
| দ্বিতীয় তকবীরের পর দরুদ পড়তে হবে       | ১৬৬ |
| তৃতীয় তকবীরের পর লাশের জন্য আন্তরিক দুআ | ১৬৬ |
| এক সাহাবীর প্রিয় দুআ                    | ১৬৭ |
| চতুর্থ তকবীরের পর একটু দেরী করা ও        |     |
| তার পরে সালাম ফেরা                       | ১৬৯ |
| জানাযার নামাযে সালাম কয়টা?              | ১৬৯ |
| শিশুদের জানাযায় আলাদা দুআ               | ১৬৯ |
| জানাযার দুআগুলো চোঁচিয়ে, না আস্তে?      | ১৭০ |

|  |     |
|--|-----|
| তকবীরগুলো দেবার সময় দুই হাত তুলতে হবে কিনা    | ১৭০ |
| জানাযার দুআর শব্দে কোন পরিবর্তন হবে না         | ১৭১ |
| মেয়েরাও জানাযা পড়তে পারে                     | ১৭২ |
| জানাযার নামায পুরো না পেলে                     | ১৭২ |
| সদ্য ভূমিষ্ট ও খসে যাওয়া সন্তানের জানাযা      | ১৭৩ |
| কোন লাশের কাটা অংশে জানাযার নামায              | ১৭৩ |
| আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও ফাসেকের জানাযা       | ১৭৪ |
| গায়েবী জানাযা                                 | ১৭৪ |
| মুসলমান ও অমুসলমানের লাশ মিশে গেলে,            | ১৭৫ |
| একাধিক লাশের জানাযার নিয়ম                     | ১৭৬ |
| মাসজিদে জানাযার নামায চলে কিনা                 | ১৭৬ |
| কবরে জানাযার নামায                             | ১৭৭ |
| দাফনের পরে কবরে আযান                           | ১৭৮ |
| জানাযার ইমাম কে হওয়া উচিত                     | ১৭৮ |
| জানাযার পরই দুআ করা প্রসঙ্গে                   | ১৭৯ |
| সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহনের নামায                 | ১৮০ |
| সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহনের নামাযের বিশেষ টং      | ১৮০ |
| এই নামাযে রুকু কয়টি                           | ১৮১ |
| এই নামাযের কিরাআত                              | ১৮২ |
| সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহনের নামাযে খুতবা আছে কিনা | ১৮৩ |
| চন্দ্র গ্রহনের নামাযও জামাআত সহকারে সূন্নত     | ১৮৪ |
| ইস্তিস্কা বা পানি চাওয়ার নামায                | ১৮৪ |
| ইস্তিস্কা সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞাতব্য             | ১৮৬ |
| ইস্তিস্কার অন্যান্য দুআ                        | ১৮৮ |
| ভূমিকম্পের নামায                               | ১৯০ |
| ইসতিখারার নামায                                | ১৯০ |
| ইসতিখারার দুআ                                  | ১৯১ |
| ইসতিখারা কয়দিন করতে হবে                       | ১৯২ |

|   |     |
|---|-----|
| সলা-তুত অস্বীহ                            | ১৯৪ |
| সলাতুত্ তাসবীহের জামাআত হবে না            | ১৯৬ |
| তওবার নামায                               | ১৯৬ |
| অভাব মোচনের নামায                         | ১৯৬ |
| শুকর ও কৃতজ্ঞতার সেজদা                    | ১৯৮ |
| কুরআন তিলাঅতের সেজদা                      | ১৯৯ |
| তিলাঅতে কুরআনের সেজদা কয়টা?              | ১৯৯ |
| এই সেজদার গুরুত্ব ও নিয়ম                 | ১৯৯ |
| তিলাঅতে সেজদার খাস দুআ                    | ২০১ |
| কতিপয় বিদআতী নামায                       | ২০২ |
| রজবের বিদআতী নামায সলা-তুর রাগা-য়িব      | ২০৩ |
| শবেবরাতের বিদআতী নামায হাযারী না          | ২০৪ |
| পাঁচঅঙ্ক জামাআতের পর জামাআতী দুআ প্রসঙ্গে | ২০৬ |
| ফরমায়েশী জামায়াতী দুআ বৈধ               | ২১১ |
| যরীফ হাদীস আমলযোগ্য কিনা?                 | ২১২ |
| জুরের দুআ                                 | ২১৩ |
| ফোঁড়া-ফুস্কুড়ী ও ঘা-এর দুআ              | ২১৩ |
| দাঁত ও কান ব্যথার দুআ                     | ২১৪ |
| চোখের রোগ দূর করার দুআ                    | ২১৪ |
| আগুন নেভাবার দুআ                          | ২১৫ |
| রাগ দূর করা ও গাধার ডাক শোনার পর দুআ      | ২১৫ |
| হারানো মাল পাওয়ার উপায়                  | ২১৫ |
| প্রমানপঞ্জী                               | ২১৬ |
| এক নম্বরে লেখক                            | ২২০ |
| এই লেখকের ইসলামী গ্রন্থাবলী               | ২২১ |
| জ্ঞানীগুণীদের দৃষ্টিতে এই লেখক            | ২২৩ |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পূর্বাভাস

الْحَمْدُ لِمَنْ أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَنْذَرْتَهُ بِأَنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \*  
وَرِضْوَانُ اللَّهِ عَلَى إِلَهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعِينَ \* وَرَحْمَتُهُ عَلَى الَّذِينَ  
خَافُوا وَيَحَافِظُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ \* وَالْحَسْرَةُ عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* فَاتَّضَرَّعُ إِلَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تَجْعَلَنَا وَالْقَارِئِينَ مِنَ الرَّاحِمِينَ  
السَّاجِدِينَ \* رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ  
الرَّحِيمُ \* آمِينَ \*

সমস্তপ্রশংসা তাঁরই যিনি তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা  
নামায কালেম করো এবং (তা না কোরে) তোমরা মুশরিক হোয়ো না।  
অতঃপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপরে যিনি নিজ  
উম্মতকে ভয় দেখিয়েছেন এই বলে, যে ব্যক্তি ‘ইচ্ছাকৃত’ নামায ছেড়ে দেয়  
সে কাকেরদের দলে ভিড়ে যায়। এরপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অবতীর্ণ হোক  
তাঁর বংশধর এবং সেইসব সঙ্গীদের উপর যাঁরা খুশুখু তথা অতি বিনয়  
ও একাগ্রচিত্তে নামায পড়তেন। তারপর তাঁর করুণা নাযেল হোক তাঁদের  
উপরে যাঁরা নামাযের পাবন্দ ছিলেন এবং যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত নামাযের  
পাবন্দি করতে থাকবেন। পরিশেষে আফসোস তাদের জন্যে যারা কিয়ামতের  
দিনে জাহান্নামে যাবার কারণ হিসেবে বলবে, আমরা মুসল্লী ছিলাম না।  
অতএব হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়! আমি তোমার কাছে এই কাকুতি মিনতি  
করছি যে, তুমি আমাদেরকে এবং এই বইয়ের পাঠকদেরকে রুকু সেজদাকারীদের  
মধ্যে বানিয়ে দিও। আমীন!

ইসলামের ভিত পাঁচটি। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে আল্লাহকে উপাস্যরূপে  
এবং মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-কে তাঁর প্রেরিত দূতরূপে বিশ্বাস করার মৌখিক  
স্বীকৃতি। দ্বিতীয় ভিত নামায, যা উক্ত মৌখিক স্বীকৃতিরই বাস্তব প্রকাশ।  
আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত এমন কোন নবী পাওয়া যায় না

যে, যাঁর উন্মত্তের জন্য নামাযের বিধান ছিলনা। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নামাযের গুরুত্ব কত। অন্যান্য নবীদের নামাযের ঢং ছিল বিভিন্নরূপ। আর উন্মত্তে মুহাম্মাদীর নামাযের নিয়ম অন্যরূপ। আমাদের নামায কিরূপ হবে সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা নামায পড় ঐভাবে, আমাকে নামায পড়তে দেখে যেভাবে (বুখারী ৮৮ পৃষ্ঠা)।

মহানবীর উক্ত ঘোষণা অনুসারে কুরআন ও হাদীসের বরাত সহকারে এই বইয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামাযের সঠিক চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। এই বইটি আইনী তহফা সলাতে মুত্তফার দ্বিতীয় খণ্ড। একজন লোক একা একা নামায পড়তে গেলে যেসব মসলার সম্মুখীন হয় এবং নামায পড়ার আগে নামাযের আনুষঙ্গিক যেসব বিষয়ের প্রয়োজন হয় সেইসব বিষয়গুলো প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যতরকম নামায জামাআত সহকারে পড়া হয় এবং নফল নামায যতপ্রকার আছে তা, আর কতিপয় বিদআতী নামাযসহ কিছু যরুরী জ্ঞাতব্য এই দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

এই বইয়ের দুটি খণ্ডে কেবল নামাযের মসলা সংক্রান্ত বিষয়াদি লেখা হয়েছে। মসলা ছাড়া নামাযের তত্ত্ব এবং গুণাবলী সংক্রান্ত এমন সব তথ্য আমার জানা রয়েছে বা লিখতে গেলে আরো প্রায় দুশো (২০০) পৃষ্ঠার একটি বই তৈরী হবে। কিন্তু তত্ত্বানসঙ্গী পাঠকের সংখ্যা অতি নগন্য বলে ঐসব বিষয়াদি এই দুটি খণ্ডে সন্নিবিষ্ট কোরে এর কলেবর অত্যাধিক বাড়তে সাহস পাইনি। আরবী, উর্দু ও বাংলাতে যত নামাযের বই লেখা হয়েছে তন্মধ্যে আমার নযরে পড়া চার খানা বই দুই থেকে তিনশো (৩০০) পৃষ্ঠার অধিক। তা হল আল্লামা মুহাম্মাদ না-সিরুদ্দীন আলবানীর সলাতুল্লাহী (আরবী), মওলানা সাদেক শিয়ালকেটি পাকিস্তানীর সলা-তুর রসূল (উর্দু), মওলানা আব্দুল জাব্বার হিন্দুস্তানীর আফযালুস সলা-ত (উর্দু) এবং বাংলাদেশী মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সাহেবের যাংলা সহী নামায ও দুআ শিক্ষা। এমতাবস্থায় এই বইয়েতে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার শতকরা চল্লিশ (৪০) ভাগ তথ্য উক্ত বইগুলোতে নেই।

১ম খণ্ড লিখতে আমি পঁচিশ খানা (২৫) কিতাবের সাহায্য নিয়েছিলাম। কিন্তু এই ২য় খণ্ড লিখতে আমি আটান (৫৮) খানারও বেশী গ্রন্থের সাহায্য পেলাম। বইটা লিখতে কতটা সার্থক হয়েছে সে বিচার তাদের উপর, যারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন। আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, বর্ধমানের বলগনার জনৈক এম,এ,বি,টি, অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাষ্টার, ও মুর্শিদাবাদ নওদার

জনৈক বি.এস.সি সহকারী শিক্ষক এবং ২৪ পরগনার বারাসাতের জনৈক ম্যাট্রিক পাশ গৃহীতী সহ অনেক মযহাবধারী ভাই ১ম খণ্ডটি পড়ে নামাযের বিদআতী ঢং ছেড়ে দিয়ে সুন্নতী পদ্ধতি মূতাবেক নামায পড়ছেন। সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

এই বইয়ে আরবী ‘যা-ল, যে, যোয়াদ ও যোয়’ প্রভৃতি হরফের বাংলা উচ্চারণ ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ (রহঃ) এর গবেষণা অনুসারে বাংলা বর্ণ ‘য’ এবং জীম হরফের বাংলা প্রতিবর্ণ ‘জ’ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা উচ্চারণে আরবী আয়েন বোঝাবার জন্য উপরে (‘) কমা দেওয়া হয়েছে। এবং টান বোঝাবার জন্য ড্যাস (-) এবং ঙ্কার (ী) ও উকার (ু) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন দুআর আরবী শব্দগুলোর বাংলা উচ্চারণে ‘মা’রুফ ও মজহুলের’ কোন তারতম্য করা হয়নি। কারণ, আরবীর বাংলা উচ্চারণ কোনটাই ঠিক হয়না। তথাপি আরবী অজানা লোকেদের অনুরোধে তাঁদের কাজ চালানোর মত বাংলা উচ্চারণ দিয়েছি এবং বিশুদ্ধ পড়ার জন্য তাঁদেরকে যত শীঘ্র সম্ভব আরবী বিশুদ্ধ পড়া শিখতে অনুরোধ করছি।

কোন বিষয়ে রেফারেন্স না থাকলে লেখকের বক্তব্য সত্য, না মনগড়া তা বোঝা যায়না। তাই আমি প্রত্যেকটি বিষয় হাওয়াল্লা দিয়ে লিখেছি। আমার জ্ঞানমতে এই বইয়ে লিখিত প্রতিটি বিষয়ই নির্ভুল। কিন্তু মানুষ মাত্রই ভুল হয়। তাই বলছি, এই বইয়ের কোন তথ্য যদি কারো নযরে ভুল বলে প্রমানিত হয় তাহলে তিনি কিতাবের পৃষ্ঠার বরাত সহ ঐ ভুলটা ধরিয়ে দিলে বাখিত হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে দেবো ইন-শা-আল্লাহ!

আমার মনে কয়েক বছর আগে ইসলামের পঞ্চাভিত্তি সম্পর্কে পাঁচটি অথেনটিক বই লেখার প্রেরণা জাগে। আল্লাহর রহমতে এই বইয়ের দুটি খণ্ড প্রকাশের সাথে সাথে একটি আশা পূরণ হল-ফলিল্লা-হিল হামদ!

এই বইটির ব্যাপারে যাঁরা আমাকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে এই দুআ করছি, আল্লাহ গো! দীন লেখকের এই হীন তোহফাটুকু সাদরে গ্রহন করো এবং ভবিষ্যতে তোমার মনোঃপুত কাজ করবার আরো তওফীক দিও-আমীন! ইতি

তারিখঃ শুক্রবার  
শবে মিরাজ, ১৪০২ হিঃ  
২১শে মে, ১৯৮০ ইং

আল্লাহর রহমত কামনাকারী  
শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী  
এস ১০২, মারে রোড,  
কলকাতা ৭০০০১৮



## দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

আল্লাহর অসংখ্য প্রশংসা যে, তাঁরই অপার কৃপায় এগার (১১) বছর পর এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। যদিও এর প্রথম সংস্করণটি ছাপার পাঁচ বছরের মধ্যেই তা নিঃশেষ হোয়ে গিয়েছিল। এর ১ম সংস্করণে আমি ৫৮ খানা গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছিলাম। এবার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় আরো ৬০ খানা বাড়তি গ্রন্থ অর্থাৎ ১১৮টি গ্রন্থের সাহায্য পাওয়ায় বইটির কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফলে বহু তথ্য এতে সংযোজিত হল এবং কিছু তথ্য পরিমার্জিত হল। সেই সাথে কিছু উদ্ধৃতিও পরিবর্তিত হল। আর এবার এটি অফসেটে ছাপা হল। তাই বইয়ের তথ্য বহু বাড়লেও পৃষ্ঠা সংখ্যা সে তুলনায় কম থাকলো। আল্লাহ এটাকে তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে কবুল করে নিন-আ-মীন!

ইতি

১২ই রবীউল আউঅল ১৪১৪ হিঃ নামাযীদের দুআ প্রার্থনাকারী  
৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৩ মঙ্গলবার শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী

## পরিমার্জিত ৭ম নতুন সংস্করণ

আল্লাহর অশেষ প্রশংসা ও তাঁর শেষনাবীর উপর আল্লাহর অসংখ্য করুণা বর্ষিত হোক। অতঃপর পাঠকদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত গত ২৭ বছরে এই বইটির ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্যন্ত এর তথ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানীদের মতামত ভাল ছাড়া কোন সমালোচনা আমার কাছে আসেনি। কিছুদিন আগে জানা যায় যে, মিশকাত থেকে সংকলিত এতে লিখিত নামমাত্র কয়েকটি হাদীস যরীফ আছে। তাই সেগুলো সংশোধন কোরে এই পরিমার্জিত ৭ম সংস্করণটি প্রকাশ করা হল। আল্লাহ এটাকে পাঠকের মাধ্যমে কবুল করুন-আমীন!

তাং-৮ই জানুয়ারী ২০০৯ ইং বিনীত-  
১০ই মুহাৰরম, (আশূরা) ১৪৩০ হিঃ গ্রন্থকার-এস,এ,বারী

## জামাআতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব ও ফযীলত

কুরআন দ্বারা বোঝা যায় যে, ফরয নামায জামাআতের সাথে পড়া অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনে নামায সম্পর্কে জামাআতেরই হুকুম দিয়ে বলেছেন: ‘আক্কীমূস সলা-ত’ (তোমরা নামায কায়েম করো। ‘অইয়ুক্কীমূনাস সলা-তা’ (তারা সবাই নামায কায়েম করে) ইত্যাদি। অন্ত্রে বলেছেন: ‘অরকাউ মাআ’র র-কিয়ীন’ (তোমরা রুকুকারীর সাথে রুকু করো) অর্থাৎ জামাআতে নামায পড়।

তাই আল্লাহর নবী (সঃ) বলেন: ‘যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ জামাআতে আসেনা তার নামাযই হয়না। অবশ্য ওয়র ছাড়া’ (ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী, ইবনে হিব্বান, বুলুগুল মারাম, ২৯ পৃষ্ঠা, মিশকাত হাদীস নম্বর-১০৭৭)। অন্য রিওয়ায়েতে তিনি বললেন, ‘ভয় ও অসুখ’ ছাড়া (আবু দাউদ, দারাকুতনী, মিশকাত, ৯৬ পৃষ্ঠা)। তিনি বলেন, ‘পুরুষ মানুষের সবচেয়ে উত্তম নামায তার ঘরে, কিন্তু ফরয নামায নয়’ (বুখারী ও মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ২৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ঘরে পুরুষের ফরয নামায বিনা কারণে হয়না। তাই একদা আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম এসে যখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মদীনাতে বহু কষ্টদায়ক জানোয়ার ও হিংস্র পশু রয়েছে। আর আমি অন্ধ মানুষ। আমার পক্ষে জামাআতে শরীক হওয়া খুবই কষ্টকর। মুসলিমের রিওয়ায়েতে আছে যে, আমার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবার কোন লোকও নেই। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে জামাআতে শরীক না হবার (ও ঘরে নামায পড়ার) অনুমতি দিতে পারেন কি? তিনি বললেন, তুমি হাইয়া আলাস স্বলা-হ্ ও হাইয়া আলাল ফালা-হ্ শুনতে পাও কি? তিনি বললেন, হাঁ। নবীজী বললেন, ‘তাহলে আসতেই হবে। তিনি (সঃ) তাঁকে জামাআত ছাড়ার অনুমতি দিলেন না (আবু দাউদ ও নাসায়ী, মিশকাত, ৯৫, ৯৭ পৃষ্ঠা)। হাদীস নং-১০৫৪ ও ১০৭৭)।

প্রিয় পাঠক! একবার চিন্তা করুন। একজন অন্ধলোক যাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবার কোন লোক নেই। তার ওপরে বাঘ-ভাল্লুক

ও হিংস্র পশুর হামলার ভয় রয়েছে। এরূপ একজন অসহায় ব্যক্তিকেও জামাআত ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছেনা। তাহলে যারা চোখওলা ও ওয়রহীন লোক তাদের নামায জামাআত ছাড়া ঘরে হবে কি? সেজন্য নাবী (সঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার কখনো ইচ্ছা হয় যে, একজনকে দিয়ে নামায শুরু করিয়ে দিই এবং তারপর যারা নামাযে হাযির হয়না আমি পেছন দিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই (বুখারী, মিশকাত ৯৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, জামাআতের সাথে নামায পড়লে একা নামায পড়ার তুলনায় ২৭ গুণ বেশী সওয়াব হয় (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃষ্ঠা)। আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, যে ব্যক্তি ৪০ দিন জামাআতে তকবীরে উলা (প্রথম জামাআতের তকবীর) পেয়ে নামায পড়বে তার জন্য দুটি মুক্তিসনদ লিখে দেওয়া হবে-একটি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয়টি মোনাফেকী থেকে মুক্তি (তিরমিযী, মিশকাত, ১০২ পৃষ্ঠা)। উসমান থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, যেব্যক্তি এশার নামায জামাআতে পড়ে সে যেন অর্ধেক রাত নামাযে কাটায় এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে সে যেন সারা রাত নামাযে কাটায় (মুসলিম, মিশকাত, ৬২ পৃষ্ঠা)।

নাবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জামাআতে এক রাকাআত নামায পায় সে পুরো জামাআতের সওয়াব পায় (আবু দাউদ) তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খুব ভাল কোরে অযু করতঃ জামাআত ধরার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। অতঃপর সে লোকদেরকে জামাআত শেষ করা অবস্থায় পায়। আল্লাহ তাআলা তাকে অতটাই নেকী দেবেন যত নেকী ঐসব মুসল্লীরা পায় যারা জামাআতে শরীক হোয়ে নামায পড়ে। অথচ জামাআতওলাদের কারো নেকী কম করা হবেনা (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ১০২ পৃষ্ঠা)।

নাবী (সঃ) বলেন, নামাযের জন্য দূর থেকে আসার কারণে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর তরফ থেকে সওয়াব লেখা হয় (ইবনে মাজা, ৫৭ পৃষ্ঠা)। ইবনে মসউদ বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে আল্লাহর সাথে

সাক্ষাৎ লাভে খুশী হয় তার উচিত জামাআত সহকারে নামায পড়া (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত দেখবে তখন তোমরা তার ঈমানের সাক্ষ্য দিও (ইবনে মাজা, ৫৮ পৃষ্ঠা)।

### জামাআত ছাড়ার গোনাহ

ইমাম মুজাহিদ বলেন, সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তিনি দিনে রোযা রাখেন এবং রাতে নফল নামায পড়েন। কিন্তু তিনি বিনা শরীআতী ওযরে জুমআ ও জামাআতে শরীক হননা। জওয়াবে ইবনে আব্বাস বলেন, লোকটি জাহান্নামী (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)। উক্ত প্রশ্নকারী এক মাস ধরে এই প্রশ্ন করতে থাকে, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস প্রতিবারই বলেন, ‘হওয়া ফিন্ না-র’ লোকটি জাহান্নামী (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, লোকেদের হয় মসজিদে হাযির হওয়া উচিত, নতুবা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উদাসীনদের মধ্যে গণ্য করবেন (ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা ৫৮)। বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাযিঃ) বলেন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায পড় তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ছেড়ে দেবে আর নবীর সুন্নত ছাড়লে তোমরা পথভ্রষ্ট হোয়ে যাবে (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা)।

এই জন্য নবী (সঃ) তাঁর জীবনের শেষ অসুখে চরম দুর্বলতা সত্ত্বেও লোকদের কাঁধে ভর দিয়ে জামাআতে শরীক হন। বিখ্যাত তবেয়ী হাসান বাসারী (রহঃ) বলেন, যদি কারো মা তার পুত্রকে স্নেহের কারণে মসজিদে এশার নামায পড়তে যেতে মানা করে তাহলে (মায়ের কথা মানা ফরয হওয়া সত্ত্বেও) ঐ পুত্র জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে তার মায়ের পরামর্শ কখনই গ্রহন করবেনা (বরং সে মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায পড়বে (বুখারী শরীফ, ৮৯ পৃষ্ঠা)।

### জামাআত ত্যাগ করার শাস্তি

বিশ্বনবী (সঃ) এর এন্তেকালের পর লোকেদের অলসতা ও দুর্বলতা

দূর করার জন্য মক্কার গভর্ণর ইতাব ইবনে ওসায়েদ জুমআর খোতবায় বলেন, হে মক্কাবাসীগণ! ভাল কোরে জেনে নাও, যদি কারো সম্পর্কে আমি এই খবর পাই যে, তিনি বিনা ওযরে মসজিদে আসেননি তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো (আসসলাতু অআহ্কা-মু তা-রিকিহা, ৩১৪ পৃষ্ঠা)।

আলী ইবনে মাহ্দী নামে এক বাদশাহ তাঁর বাদশাহী যুগে সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতেন যিনি নামাযের জামাআতে দেরীতে আসতে অভ্যস্ত হতেন। এইরূপ সেইসব ব্যক্তিদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোত যারা ওয়াযে হাযির হতেন না (তরীখে ইবনে খালদুন, ১ম খণ্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী লিখেছেন, শায়খ বোররাকের পরিবারবর্গের মধ্যে যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে জামাআতে হাযির হোত না তাদেরকে তিনি নিজ হাতে (৪০) চল্লিশটি চাবুক মারতেন (দুরারে কা-মিনাহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

জামাআত ত্যাগকারীদেরকে বাদশাহ মুহাম্মাদ ইবনে তোগলক সাজা দিতেন। একদিন তিনি ঐরূপ (৯) নয়জন লোককে হত্যা করেন (নুযহাতুল খাওয়া-তির ১ম খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)।

### জামাআতের গুরুত্বদানকারী কতিপয় বিশিষ্ট নামাযী

বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কোন নামায যদি কোন কারণে জামাআতে ছেড়ে যেত তাহলে তিনি ওর খেসারত স্বরূপ জামাআতের সওয়াব পাবার উদ্দেশ্যে তখন থেকে পরের অক্ত আসা পর্যন্ত অনবরত নামায পড়তেন (ইসা-বাহ, ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত তাবেরী আসাদ ইবনে ইয়াযীদ নাখরীর কোন মসজিদে জামাআত ছেড়ে গেলে তিনি অন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন, যাতে জামাআত পাওয়া যায় (বুখারী, ৮৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম মোযানী (রহঃ) এর কোন জামাআত ছেড়ে গেলে তিনি জামাআতের নেকী পাবার উদ্দেশ্যে ঐ নামাযটি পঁচিশ (২৫) বার পড়তেন, যাতে জামাআতের নেকী পাওয়া যায় (মিরআতুল জিনা-ন লিলইয়াফিযী)। বিখ্যাত তাবেরী ইমাম আ'মাশ (রহঃ) এর (৭০) সত্তর বছর যাবত প্রথম

জামাআত আরন্দের তকবীরও ফাঁক যায়নি (সিফাতুস সফওয়াহ ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)।

তাবেয়ী নেতা সাইদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, পঞ্চাশ (৫০) বছর গত হল আমার তকবীরে উলা ছাড় যায়নি এবং পঞ্চাশ (৫০) বছর পর্যন্ত আমি এশার অযুতে ফজরের নামায আদায় করেছি (সিফাতুস সাফওয়াহ, ২য় খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা)। প্রতিতযশা মুহাদিস ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাস্তান একাদিক্রমে বিশ (২০) বছর দিনরাতে কুরআন খতমে মশগুল থাকেন এবং চল্লিশ (৪০) বছর ধরে আযানের আগে মসজিদে পৌঁছতেন। তাঁর কোন জামাআত ছাড় যায়নি এবং তকবীরে উলাও বাদ যায়নি (ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

### জামাআত ত্যাগ করার শরীআতী ওয়র

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পাঁচটি কারণে জামাআতে শরীক না হলে আপত্তি নেই। তা হল এই ১) দুশমনের ভয় ২) অসুখ ৩) পেশাব ও পায়খানা লাগা ৪) খাবার জিনিষ হাযির হওয়া ৫) প্রচণ্ড শীত, বৃষ্টি ও তুফান। দুশমনের ভয় ও অসুখ সম্পর্কে হাদীস উপরে পেশ করা হয়েছে। বাকিগুলোর প্রমান এই।

মা আয়েশা বলেন, আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনিছি যে, খাবার হাযির হলে নামায নেই (অর্থাৎ আগে খাওয়া তারপরে নামায) এবং তখনও না যখন দুটো খবীস জিনিষ অর্থাৎ পেশাব ও পায়খানা চাপ সৃষ্টি করে (মুসলিম)। ইবনে ওমর বলেন, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির দিনে আল্লাহর রসূল মোআযযিনকে এই হুকুম দিতেন যে, সে যেন আযানে একথাও বলে দেয়:- ওগো, সবাই নিজের নিজের ঘরে নামায পড়ে নিও (বুখারী, মিশকাত, ৯৫, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

### মসজিদ-সালামী ও অযু সালামীর নামায

জামাআতে নামায পড়তে গেলে মসজিদে ঢুকতে হয়। তাই মসজিদে ঢোকার পর মুসল্লীর করণীয় কি? সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে ঢুকবে তখন

বসার আগেই সে যেন দু রাকআত নামায পড়ে নেয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭০ পৃষ্ঠা)।

উক্ত দুই রাকআত নামাযকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা মসজিদের সালামী নামায বলা হয়। তাই যখনই কোন ব্যক্তি মসজিদে আসবে তখনই তাকে প্রথমে নামায পড়তে হবে। কেউ যদি মসজিদে এমন সময় ঢোকে যখন সেখানে কোন ফরয নামাযের জামাআত চলছে তখন সে ঐ জামাআতেই শরীক হবে। তাকে আর মসজিদ সালামীর নামায আলাদাভাবে পড়তে হবে না। কিন্তু কারো মসজিদে ঢোকার পর যদি জামাআত শুরু হবার দেরী থাকে তাহলে তাকে প্রথমে দু-রাকআত মসজিদ সালামীর নামায পড়তে হবে। তারপর সে জামাআতের অপেক্ষায় থাকবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মার বলেন, আমি নামায পড়ি যেমন আমার সাথীদেরকে নামায পড়তে দেখিছি। আমি কোন ব্যক্তিকেই নামায পড়তে মানা করিনা রাতে এবং দিনে সে যা চায়। তবে তারা সূর্য ওঠা ও সূর্য ডোবার সময়ের খোঁজ করলে নয় (বুখারী ৮৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ও তাহিয়্যাতুল অযূর নামায ২৪ ঘন্টার সব সময়ই হবে। তবে এই নামায পড়া অবস্থায় কোন ফরয নামাযের ইকামত হলে এই নামায ছেড়ে দিতে হবে। তেমনি জামাআত চলা অবস্থায় তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এবং অযূর নামায হবে না (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)।

বিনা অযূতে নামায হয়না। তাই নামাযের জন্য অযূ করতে হয়। কখনো কেউ বিনা কারণেও অযূ করতে পারে। ঐ অযূর পরেই দু রাকআত নামায তাহিয়্যাতুল অযূ বা অযূর সালামী হিসেবে পড়া খুবই নেকীর কাজ। তথা জান্নাতে যাবার কারণ হয়। যেমন সাহাবী আবু হুরাইরাহ বলেন।

একদা ফজরের নামাযের সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিলালকে বলেন, হে বিলাল! আমাকে তুমি তোমার সেই অতি আকাংখিত আমলের বর্ণনা দাও, যা তুমি ইসলামে করেছো। কারণ, আমি (মেরাজের রাতে) জান্নাতে আমার (ঢোকার) আগে তোমার খড়্‌মের খটখট আওয়ায

শুনিছি। বিলাল বললেন, আমি আমার নিকট অতি আকাংখিত ইসলামে যে আমলটি করেছি তা এই যে, আমি রাতে ও দিনের যে কোন মুহুর্তে (অযু কোরে) পবিত্রতা অর্জন করেছি তখনই ঐ অযু দ্বারা দু রাকআত নামায পড়েছি। যে নামায পড়াটা আমার জন্য ফরয করা হয়নি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৬ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের একটি শব্দ 'সা-আহ বা যেকোন মুহুর্তে'-শব্দটি একথা প্রমান করে যে, (তাহিয়্যাতুল অযুর) এই নামায (সূর্য ওঠা, তা মাথার উপরে থাকা ও ডোবার মত) নিষিদ্ধ সময়েও পড়া চলবে। মুসনাতে আহমাদের বর্ণনায় বিলাল বলেন, (পেশাব, পায়খানা ও বাতকর্ম প্রভৃতির কারণে) আমার অযু ভাংলেই আমি তখনই অযু কোরতাম এবং দু রাকআত নামায পড়তাম। এই হাদীসটি প্রমান করে যে, যখনই অযু ভাংবে তখনই অযু করা যাবে এবং অযুর সালামী হিসেবে দু রাকআত নামায তখন পড়া যাবে (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা)।

### মোনাফেকদের পক্ষে ভারী এশা ও ফজরের নামায

আল্লাহর রসূল বলেন, মোনাফেকদের ওপর সবচেয়ে ভারী নামায এশা ও ফজরের নামায। তারা যদি জানতো যে, ঐ দুই নামাযের ফযীলত কত তাহলে তারা পাছা ঘেঁষড়েও এসে ঐ দুই নামাযে শরীক হোত (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ২৮ পৃষ্ঠা)।

### মেয়েরাও মসজিদে যেতে পারে

আল্লাহর নাবী বলেন, যখন তোমাদের কারো বিবি মসজিদে যাবার অনুমতি চাইবে তখন তোমরা তাকে বাধা দিওনা (বুখারী, মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় আছে তোমরা তোমাদের বিবিদেরকে মসজিদে যেতে মানা কোরো না। তবে ওদের ঘর ওদের জন্য বেশী ভাল (আবু দাউদ)। শুধু তাই নয়, বরং মেয়েদের ঘরের ভেতরে নামায উঠানের খোলা জায়গার চেয়ে বেশী ভাল (আবু দাউদ, মিশকাত, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

তবে হাঁ, মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার একটি শর্তও আছে। তা হল



এই, যে-মেয়ে মসজিদে যেতে চায় সে যেন খুশবু না মাখে (মুসলিম)। আর যদি কেউ মেখেই থাকে তাহলে সে যেন সহবাসের পর ফরয গোসলের ধোয়ার মত ওটাকে খুব রগড়ে রগড়ে ধুয়ে ফেলে এবং তারপরে মসজিদে যায় (আবু দাউদ)। কারণ, যে মেয়েছেলে খুশবু মেখে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায় সে বেশ্যা মেয়ে, সে ব্যাভিচারিনী (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। এই সমস্ত হাদীসগুলো মিশকাতের ৯৬ পৃষ্ঠায় আছে।

### কয়ব্যক্তি হলে জামাআত করতে হবে

আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, দুইজন লোক ও তার চেয়ে বেশী ব্যক্তি হলে জামাআত হবে (মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)। তিনি বলেন, একজন লোকের একা নামায আর একজনের সাথে (জামাআতে ২জনের নামায পড়া) একা নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং তিনজন লোকের জামাআত দুইজনের জামাআতের চেয়ে শ্রেয়।

এইরূপ মুসল্লী যত বেশী হবে আল্লাহর নিকট (সে জামাআত) তত বেশী প্রিয় (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

নবী (সঃ) বলেন, যে গ্রামে বা জঙ্গলে ৩জন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে জামাআতে নামায কায়েম হয়না, তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং তোমাদের উচিত জামাআতের সাথে থাকা। (আর একথাও মনে রেখো যে-বকরী পালছাড়া একা একা থাকে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমানিত হয় যে, একের বেশী মুসল্লী হলেই জামাআত কোরতে হবে এবং ৩জন লোক জামাআত না কোরে একা একা নামায পড়লে শয়তান তাদের মাথায় চেপে বসবে।

### জামাআতে ইমাম ও মোক্তাদী কিভাবে দাঁড়াবে

আবদুল্লা ইবনে আব্বাস বলেন, একদা রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার ঘরে ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে উঠে নামাযে দাঁড়ালেন।

অতঃপর আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়ালাম। তখন তিনি পিছন দিক দিয়ে আমার হাতটা ধরে আমাকে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন (বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদীস প্রমান করে যে, দুইজনের জামাআত হলে ইমাম বামদিকে এবং মোক্তাদী ডানদিকে দাঁড়াবে। আর মোক্তাদী যদি ভুল কোরে ইমামের বামদিকে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমাম তাকে পেছন দিক দিয়ে টেনে ডান দিকে দাঁড় করাতে পারবে।

সাহাবী জাবের (রযিঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে দাঁড়ালেন। অতঃপর আমি এসে তাঁর বামদিকে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডানদিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন অরপর জাব্বার ইবনে সাখর এসে রসূলুল্লাহর বামদিকে দাঁড়াল। এবার তিনি আমাদের দুজনের হাত ধরে ঠেলে দিলেন এবং নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন (মুসলিম)।

এই হাদীস বলে যে, দুজন জামাআত করা অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এসে ইমামের বামদিকে দাঁড়ালে পেছনে যদি জায়গা থাকে তাহলে ইমাম দুজনকে পেছনে ঠেলে দেবে। অথবা ইমাম সামনে এগিয়ে যাবে (তিরমিযি)। নতুবা তৃতীয় ব্যক্তি ইমামের ডান পাশের মোক্তাদীটিকে পেছনে টেনে নিয়ে দুজনেই ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।

যদি তিনজনের জামাআতে ২জন পুরুষ ও একজন নারী থাকে তাহলে সাহাবী আনাস বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী পুরুষ মোক্তাদী ইমামের ডানে এবং নারী মোক্তাদী ইমামের বামদিকে না দাঁড়িয়ে অদের দুজনের পেছনে একা দাঁড়াবে (মুসলিম)। এইরূপ ৪জনের জামাআত সম্পর্কে আনাস বলেন, একদা আমি ও (আমার ভাই) ইয়াতীম আমাদের ঘরে নবী (সঃ) এর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ি এবং (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমাদের (দুই ভায়ের) পেছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়েন (মুসলিম, মিশকাত ৯৯ পৃষ্ঠা)।

এই দুটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পুরুষের সাথে নারীর কাতার হবেনা এবং নারী একলা থাকলে সে পেছনে একটি কাতারে একাই

দাঁড়াবে। আর ছোট ছেলে একা থাকলে সে পুরুষদের কাতারেই দাঁড়াবে। যেমন ইয়াতীম একা না দাঁড়িয়ে আনাসের পাশে দাঁড়িয়েছিল (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

আবু মালেক আশআরী বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ান। তখন তিনি প্রথমে পুরুষদের কাতারবন্দী করান এবং তাদের পেছনে বাচ্চাদের কাতারবন্দী করান। তারপর নামায পড়ান (আবু দাউদ, মিশকাত, ৯৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমান করে যে, প্রথমে পুরুষদের কাতার হবে। তারপরে বাচ্চাদের কাতার এবং সবার পেছনে মেয়েদের কাতার হবে। ইমাম সুবকী বলেন, বাচ্চা যদি দুই বা তার বেশী হয় তাহলে তাদের কাতার আলাদা হবে। অন্যথায় একটা বাচ্চা হলে সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়াবে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুর আগে অসুখের কারণে বসে বসে নামায পড়িয়েছিলেন এবং সাহাবীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ইকতিদা করেছিলেন (বুখারি মিশকাত, ১০১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং যদি কোন ইমাম অসুখের কারণে বসে বসে নামায পড়ান তাহলে তাঁর মোক্তাদীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

আল্লাহর রসূল বলেন, কোন ইমাম যেন মোক্তাদীদের চেয়ে উঁচু জায়গায় (একা) না দাঁড়ায় (আবু দাউদ, মিশকাত, ৯৯ পৃষ্ঠা)। প্রয়োজন হলে আশে পাশে দু একজন মোক্তাদী নিয়ে নেবে। অতঃপর তার পেছনে কাতার দিলে তাতে আপত্তি নেই।

## এক কাতারে একজন দাঁড়ানো যাবে কি না?

সাহাবী ওয়া-বিসা ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা নামায পড়তে দেখে তাকে পুনরায় নামায পড়ার হুকুম করলেন (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী মিশকাত, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর ১১০৫ বুলুগুল মারাম, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪০৯, তাহাভী, ২২৯ পৃষ্ঠা, নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, কাতারের পেছনে একা মুসল্লীর নামায হয়না।

হয় তাকে কাতারের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে, নতুবা কাতার থেকে কাউকে টেনে নিতে হবে (তবারানী বুলুগল মারাম, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১০ পৃষ্ঠা)। আর যদি জায়গা না পাওয়া যায় তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে (ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)।

এই হুকুম মেয়েদের জন্য নয়। কোন কাতার থেকে কোন মুসল্লীকে যদি পেছনের কোন লোক টেনে নেয় তাহলে ঐ খালি জায়গার পাশের মুসল্লীরা খালি জায়গাটি পূরণ কোরে নেবে।

### দুই থামের মাঝে কাতার হবেনা

মোআবিয়াহ ইবনে কুররাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে আমাদেরকে দুই থামের মাঝখানে কাতার দিতে মানা করা হোত এবং আমাদেরকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হোত (ইবনে মাজা, ৭১ পৃষ্ঠা ও আবু দাউদ, তিরমিযী)।

সুতরাং থামওয়ালা লাইনটা বাদ দিয়ে তার আগে বা পেছনের লাইনে কাতার দিতে হবে। হানাফী ফিকহের মতে দুই থামের মাঝখানে কাতার চলবে (আওনুল মাবুদ, ১ম খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)।

### আযানের কতক্ষণ পর জামাআত হবে

একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবী বেলালকে বলেন, যখন তুমি আযান দেবে তখন ধীরে ধীরে দেবে এবং যখন একামত দেবে তখন তাড়াতাড়ি দেবে। আর আযান ও একামতের মাঝে অতটা সময় রাখবে যতটার মধ্যে একজন লোক তার খাওয়াদাওয়া শেষ করতে পারে এবং একজন পানকারী তার পান শেষ করতে পারে এবং একজন পেশাব-পায়খানাকারী তার কাজ শেষ করতে পারে (তিরমিযী, মিশকাত, ৬২ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আযান ও জামাআতের মাঝে আনুমানিক ১৫/২০ মিনিট ব্যবধান থাকা চাই। এই ব্যবধান চার অঙ্কে অর্থাৎ ফজর ও যোহর এবং আসর ও এশায় খাটতে পারে, কিন্তু মগরেবে নয়। কারণ, মগরেবের সময় খুব কম। তাই বলে মগরেবের সময় আযান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জামাআতে দাঁড়ানো উচিত নয়। যেমন

অনেকে করে থাকে। এই অঙ্কে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট ব্যবধান থাকা চাই। কারণ, আনাস ইবনে মালিক বলেন, মুআযযিন যখন আযান শেষ করতেন তখন নাবী (সঃ) বের হতেন। এইরূপে তাঁরা মগরেবের (জামাআত দাঁড়াবার) আগে দু রাকআত (সুন্নত) পড়তেন (বুখারী, ৮৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং মগরেবের আযান এবং জামাআত দাঁড়াবার মাঝে দু রাকআত সুন্নত নামায পড়ার মত সময়ের ব্যবধান থাকা চাই।

### শীত ও গ্রীষ্মে ফজরের অঙ্কে পার্থক্য

আনাস (রাযিঃ) বলেন, একদা একজন লোক নবী (সঃ) কে সকালের নামাযের অঙ্ক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। অতঃপর আমরা যখন পরদিন ভোরে উঠলাম তখন তিনি (সঃ) নামাযের হুকুম দিলেন যে সময় অন্ধকার ভেদ কোরে ফজর উদিত হল (অর্থাৎ অতিভোরে)। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর পরের দিন সকালে যখন একটু ফর্সা হল তখন তিনি নামাযের তকবীর দিতে বললেন। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, ঐ প্রশ্নকারী কই? এই দুটোর মাঝামাঝি হল অঙ্ক (নাসায়ী, ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)।

আবু মাসউদ আনসারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার গালাসে (কাকভোরে একটু অন্ধকারে) সকালের নামায পড়েন। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নামায গালাসে হোত এবং তিনি একবারও ইসফারে একটু ফর্সা হলে ইসফারে নামায পড়েননি (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ফজরের নামায গালাসে পড়া উচিত। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, শীতকালে ফজর নামায গালাসে বা খুব ভোরে হবে এবং গরমকালে এসফারে বা একটু ফর্সা হলে হবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা মুআয ইবনে জাবালকে ইয়ামনে পাঠবার সময় বলেন, হে মুআয! যখন শীতকাল হবে তখন গালাসে (খুব ভোরে) নামায পড়বে এবং লোকেদের সাধ্যমত লম্বা কেরাআত পড়বে যাতে তারা বিরক্ত না হয়। আবার যখন গরমকাল হবে তখন একটু ফর্সা হলে নামায পড়বে। কারণ, তখন রাত ছোট হয় আর লোকেরাও ঘুমিয়ে পড়ে।

অতএব তাদেরকে একটু ঢিল দাও, যাতে তারা জামাআত পেয়ে যায়। (শারহুস সুন্নাহ, কানযুল ওম্মা-ল, ৭ম খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)।

### ইসফারের ব্যাখ্যা

ইসফার শব্দের শাব্দিক অর্থ ফর্সা হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া প্রভৃতি। এই ফর্সা কতটা হলে ফজরের নামায পড়া হবে, তার ব্যাখ্যায় দেওবন্দের প্রাক্তন শায়খুল হাদীস আল্লামা আনঅর শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) বলেন, এমন সময় ফজরের নামায শেষ করা উচিত যে, কোন কারণে যদি নামাযটা আবার ঘুরিয়ে পড়তে হয় তাহলে সূর্য ওঠার আগে সুন্নত সহ ঐ নামাযটা যেন পুনরায় পড়ার অবকাশ থাকে। (ফাইযুল বারী ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)।

শাহ সাহেবের উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, ইসফার হল সূর্য ওঠার ৪০/৪৫ মিনিট আগে। অতএব যারা শুধু গরমকালে নয়, বরং বারমাসই ইসফারে ফজরের নামায পড়ে তাদের উচিত সূর্যোদয়ের ৪৫ মিনিট আগে জামাআত শুরু করা। যেসব ভায়েরা তাদের মুহাদ্দিসদের ফতওয়া না মেনে নিজেদের মনগড়া ফতওয়া অনুযায়ী সূর্য ওঠার পৌনে একঘণ্টা আগে ফজরের আযান দিয়ে সূর্য ওঠার ২০/২৫ মিনিট আগে ফজরের জামাআত শুরু করেন এবং কোন কারণে যদি তাদের ঐ নামাযটা পুনরায় পড়তে হয় তখন তারা তা আদায়ের সময় পাননা, বরং সূর্য ওঠার পর পড়ে-আল্লাহ তাদের সুমতি দিন-আমীন!

একটি হাদীসে ইসফারের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা সকালের নামায একটু ফর্সায় পড় যখন লোকেরা তীর মারলে তীর পড়ার জায়গাটা তারা দেখা পায় (আবু দাউদ তায়া-লিসী, তাবারানী, কানযুল ওম্মা-ল, ৭ম খণ্ড, ২৫৮ ও ২৬০ পৃষ্ঠা)।

### দ্বিতীয় জামাআতের প্রমান

সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, একদা এক ব্যক্তি এমন সময় মসজিদে এল যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) জামাআত শেষ করে দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ওগো! তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আঃ

কি, যেক্ষণে এর সাথে আবার জামাআত কোরে নামায পড়ে এক সদাকাহ্ দান করবে। তখন একজন লোক দাঁড়ালো এবং তার সাথে জামাআত কোরে আবার নামায পড়লো (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত, ১০২ পৃষ্ঠা, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, মুত্তাদরকে হা-কিম, নাসবুর যা-য়াহ, ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় আছে যে-লোকটি দাঁড়ালো এবং তার সাথে নামায পড়লো তিনি ছিলেন আবু বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু (সুনানে বাইহাকী ৭০ পৃষ্ঠা)।

একদা আনাস ইবনে মালেক এক মসজিদে এমন সময় আসেন যখন তাতে জামাআত হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি পুনরায় ইকামত দিলেন এবং জামাআত কোরে নামায পড়লেন (বুখারী ৮৯ পৃষ্ঠা)।

প্রথম হাদীসটি দ্বারা প্রমানিত হয় যে, যদি কেউ জামাআত না পায় এবং সে সময় যদি সে অন্য কোন মুসল্লী না পায় তাহলে সে প্রথম জামাআতের একজনকে মোক্তাদী কোরে দ্বিতীয় জামাআত কোরতে পারে। ফলে সে জামাআতের নেকী পাবে এবং প্রথম জামাআত পড়া লোকটি সদাকার নেকী পাবে।

দ্বিতীয় হাদীসটি দ্বারা প্রমানিত হয় যে, এক জামাআত শেষ হবার পর দ্বিতীয় জামাআত করার সময় আবার ইকামত দিতে হবে। অতএব যারা প্রথম জামাআত না পাবার পর একা একা এসে নামায পড়ে এবং ২য় বা ৩য় জামাআত করেনা, অথবা জামাআত করলেও পুনরায় ইকামত দেয়না তারা রসূলের হাদীসের খেলাফ কাজ করেন এবং নিজেদের মনগড়া ফতওয়া মোতাবেক চলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে সহী হাদীস মোতাবেক চলার তওফীক দিন-আমীন!

দারাকুতনী'র টীকা তা'লীকুল মুগনীতে আছে যে, কোন মসজিদে একবার জামাআত হবার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা তার চেয়েও বেশী জামাআত বিনা আপত্তিতে জায়েয। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেরী এবং তাঁদের পরবর্তীগণ এরূপ জামাআত করেছেন। যারা বলে প্রথম জামাআতের পর অন্যান্য জামাআত মকরুহ, এটা তাদের বেদলীল কথা (ফাতা-ওয়া

নাযীরিয়াহ, ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

ঘরে একলা নামায পড়ে মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলে আবার জামাআতের সাথে নামায পড়তে হবে (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, ১০৩ পৃষ্ঠা)।

### এক মসজিদে একাধিক জামাআত চলে কিনা

কোন মসজিদের একই মোসাল্লায় কিংবা বিভিন্ন জায়গায় প্রথম জামাআতের পর আরো জামাআত বিনা আপত্তিতে জায়েয। যার প্রমান পূর্বোক্ত তিরমিযী বর্ণিত দুই সাহাবী আবু সাযীদ খুদরীর হাদীস এবং বুখারী বর্ণিত আনাসের হাদীস।

হানাফী ফকীহরা বলেন যে, একাধিক জামাআত মকরুহ। কিংবা একই মোসাল্লায় তা মকরুহ, কিন্তু প্রথম জামাআতের মোসাল্লা ছাড়া অন্য মোসাল্লায় পড়লে তা মকরুহ নয়। (কাবীরী ৫৬৬-৫৬৭ পৃষ্ঠা)।

মুহাদিসে হিন্দ আল্লামা আবদুর রহমান মোবারকপুরী বলেন, হানাফীদের উক্ত ফতওয়ার প্রমানে কোন দলীল আমার নযরে পড়েনি। হানাফীরা এই হাদীসটিও পেশ করে যে, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আনসারদের দুই দলের মধ্যে সন্ধি করাবার জন্য একটি মসজিদে হাযির হন। সেখানে প্রথম জামাআত শেষ হোয়ে যাওয়ায় তিনি বাড়ী ফিরে আসেন এবং নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে জামাআত করেন।

এই হাদীসটির ব্যাপারে উক্ত মুহাদিসে হিন্দ বলেন, ঐ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও দলীলযোগ্য নয়। কারণ, ওর রাবীদের পাত্তা পাওয়া যায়না এবং কোন্ হাদীস গ্রন্থে ঐ হাদীসটি আছে তারও সন্ধান পাওয়া যায়না। হানাফী ফকীহরা এমনিই বিনা সনদে ও বিনা হাওয়ালায় ওটাকে উল্লেখ করেন (ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, ১ম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)। তবে হাঁ, প্রথম জামাআতের ফযীলত বেশী।

**জামাআত না পেলে একা নামায ঘরে পড়া উত্তম,**

**না মসজিদে?**

যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে জামাআত না পায় এবং একা নামায



পড়তে বাধ্য হয় তাহলে সে ঐ নামাযটা ঘরে না পড়ে অন্য মসজিদে জামাআত পায় কিনা তার চেষ্টা করবে। যদি অন্য কোন মসজিদেও জামাআত না পাওয়া সম্ভব হয় তাহলেও সে ঐ নামাযটা ঘরে না পড়ে মসজিদে গিয়ে পড়বে। কারণ, নাবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় মসজিদে যায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাম্মাতের মেহমানদারী তৈরী করেন যতবার সে সকাল ও সন্ধ্যায় যাতায়াত করে (বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাদীসটির বাহ্যিকভাবে মসজিদে আগমনকারীর জন্য ফযীলত প্রদান করে। তবে ঐ আসাটা যেন ইবাদত কিংবা নামাযের উদ্দেশ্যে হয় (ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)। তাই ভারতীয় মোহাদিসকুল শিরোমনি ইমাম নাযীর হোসায়ন দেহলভী (রহঃ) বলেন, ঘরের তুলনায় মসজিদে একা ফরয নামায পড়া উত্তম (ফাতা-ওয়া নাযীরিয়াহ ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)।

### পুরাতন মসজিদের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী ‘আল্আমরু বিলইত্তিবা-অ্ অন্নাহু আনিল ইবতিদা-অ্’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একই মহল্লায় মসজিদের সংখ্যা বেশী হওয়া বিদআত। কারণ, এর ফলে জামাআতের শৃংখলা নষ্ট হয়। ইবাদতের রওনক কমে যায়। পুরানো মসজিদের মাহাত্ম্য খর্ব হয় এবং নতুন মসজিদগুলাদের নাম ও লোক দেখানো ভাবের প্রচার হয়।

এই জন্য ঐ ব্যাপারটির ব্যাখ্যায় ‘আলআকনাঅ্’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মসজিদ যদি ছোট না হয় এবং তাতে লোক সমাবেশে অসুবিধা না হয় তাহলে ওর কাছেই কোন মসজিদ নির্মান হারাম। আলমুত্তাহা-গ্রন্থে আছে, এক মসজিদের নিকটে অন্য মসজিদ তৈরী কোরে ওকে ক্ষতিগ্রস্তের ধারণা থাকলে সেটা হারাম কাজ হবে (ইসলাহুল মাসা-জিদ, উর্দু তর্জমা ১২৬ পৃষ্ঠা)।

পুরাতন মসজিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্বের অতুলনীয় মনিযী ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ সালাফ স্ব-লেহীন এমন মসজিদে নামায পড়া আপত্তিকর মনে করতেন যাতে ‘যেরার’

মসজিদ হবার আশংকা থাকতো। এইজন্য তাঁরা পুরাতন মসজিদকে নতুনের তুলনায় উত্তম মনে করতেন। কারণ, পুরানো মসজিদ নতুনের তুলনায় ‘যেরার’ হবার আশংকা কম, কিন্তু নতুন মসজিদ যেরার হবার আশংকা আছে।

তাহাড়া কুরআনও সাক্ষ্য দেয় যে, পুরানো হওয়া উত্তম। যেমন ১৭ পারার সূরা হজ্জের ২৯ নম্বর আয়াতে কাবা শরীফের গুণ বর্ণনায় কাবাকে ‘আলবাইতুল আতীক’ বা পুরানো ঘর বলা হয়েছে:-

এই কারণে পূর্ববর্তী আলেমগণ মদীনার এবং অন্যান্য জায়গার লোকেদের মসজিদে নবতী ও কুবার মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে এবং মাযারে ইচ্ছাকৃতভাবে যাওয়াটা অপছন্দ করতেন। (ইবনে তাইমিয়ার তফসীর সূরায় ইখলাস, উর্দু তর্জমা, ২৬৮, ২৬৯ পৃষ্ঠা)।

এক তাবেয়ী সাবেত বুনাঈ বলেন, একদা আমি সাহাবী আনাস (রাযিঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি একটি মসজিদের কাছে এসে আযান শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি নতুন মসজিদ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি মসজিদটি অতিক্রম কোরে অন্য মসজিদের দিকে চলে গেলেন।

আওফ বলেন, খলীফা মুআবিয়ার প্রেরিত এক যাকাত আদায়কারী কর্মচারী এক জায়গায় নামলেন। সেখানে দুটি মসজিদ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস কোরলেন, কোনটি পুরানো? অতঃপর তাঁকে পুরানোটার খবর দেওয়া হল। ফলে তিনি সেখানে গেলেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড, ২৩১-২৩২ পৃষ্ঠা)।

### মেয়েছেলে ইমাম কিভাবে দাঁড়াবে

উম্মে অরকা বলেন, নাবী (সঃ) তাকে তার বাড়ীতে ইমামতী করার হুকুম দিয়েছিলেন (আবু দাউদ, বুলুগুন্ড মারাম, ৩০ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, মেয়েরাও জামাআত কোরতে পারে এবং তাদের ইমাম মেয়ে হতে পারে। তবে তাদের ইমাম পুরুষদের মত সামনে একা না দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে। কারণ, মা আয়েশা ও উম্মে সালমা মেয়েদের ফরয নামাযের ও তারাবীর নামাযের জামাআতে ইমামতী

করেছেন এবং তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন (দারাকুতনী, বায়হাকী, হা-কিম, আওনুল মাবুদ, ১ম খণ্ড, ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা)।

### মেয়েদের আযান ও ইকামত

মো'তমির ইবনে সুলাইমান তদীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েদের উপরে আযান ও ইকামতের হুকুম আছে কি? তিনি বললেন, না। তবে তারা যদি তা করে তাহলে সেটা যিক্র হবে।

তাউস থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রাযিঃ) আযান ও ইকামত দিতেন (মুত্তাদরকে হাকিম ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা ও নাসবুর রা-য়াহ, ২য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)।

হিশাম থেকে বর্ণিত আছে যে, হাফসা (রাযিঃ) যখন নামায পড়তেন তখন তকবীর দিতেন। অহাব ইবনে কাইসান বলেন, ইবনে ওমর (রাযিঃ)কে একদা জিজ্ঞেস করা হয় যে, মেয়েদের উপরে আযান আছে কি? তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর যিক্র কোরতে মানা কোরবো কি? সাহাবী জাবের (রাঃ) বলেন, মেয়েরা যদি চায় তাহলে ইকামত দেবে (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)।

তবে ঐ আযান এবং ইকামত যেন পরপুরুষকে না শোনানো হয়, বরং মেয়ে মহলে সীমাবদ্ধ থাকে। এক তাবেয়ী নারী তামীমাহ বিনতে সালমাহ বলেন, আয়েশা (রাযিঃ) একদা মগরেবের নামাযে মেয়েদের ইমামতী করেন। তখন তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়ান এবং চিলে কিরাআত পড়েন। (মুহাল্লা, ৪র্থ খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)।

### ইমাম কে হতে পারে

সাহাবী আবু মাসউদ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, কোন কওমের ইমাম সেই হবে যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুরআন পড়তে পারে। যদি কুরআন পড়ায় সবাই সমান হয় তাহলে হাদীসে যে বেশী জ্ঞানী সেই ইমাম হবে। যদি হাদীসের ইল্মেও সবাই সমান হয় তাহলে প্রথমে হিজরতকারী ইমাম হবে। যদি হিজরতের ব্যাপারেও সবাই সমান হয় তাহলে যে বয়সে বড় সেই ইমাম হবে। আর কোন ব্যক্তি যেন অন্য

বক্তির সর্দারী এলাকায় গিয়ে ইমামতী না করে এবং কেউ যেন অন্যের গদীতে গিয়ে তার বিনা হুকুমে বসে না পড়ে (মুসলিম)। নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাকে ইমাম বানাও। কারণ, তিনি তোমাদের এবং তোমাদের প্রভুর মাঝে প্রতিনিধিস্বরূপ (বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)। হাদীসটি যরীফ হলেও সহী হাদীসের সমর্থক।

**অন্ধ ইমাম :-** সাহাবী আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক অন্ধ ব্যক্তি ইবনে উম্মে মকতুমকে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন (আবু দাউদ, মিশকাত, ১০০ পৃষ্ঠা)।

**নাবালক ইমামঃ-** আমর ইবনে সালমা বলেন, আমার কওম আমাকে কুরআনের বেশী জ্ঞানী পাওয়ায় আমাকে নামাযের ইমাম করে দেয়। তখন আমি ৬ বা ৭ বৎসরের (নাবালক) ছেলে ছিলাম (বুখারী, মিশকাত, ১০০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, তিন রকম লোকের নামায তাদের মাথার এক বিষত ওপরে ওঠে না—অর্থাৎ কবুল হয় নাঃ- (১) যে ইমামের প্রতি অধিকাংশ মুসল্লী নারায (২) স্বামীকে নারায রেখে যে স্ত্রী রাত কাটায় (৩) যে দুই ভাইয়ের আপোষে ঝগড়া আছে (ইবনে মাজা, মিশকাত, ১০০ পৃষ্ঠা)।

ইমামের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণ ধর্মীয় কোন দোষ হওয়া চাই। তা দুনিয়ার কারণ হলে চলবে না (মিরআত ২য় খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)। নাবী (সঃ) বলেন, তিন রকম লোক কিয়ামতের দিন সুগন্ধী মিশকের স্তুপের কাছে থাকবে। তন্মধ্যে একরকম লোক সেই ইমাম, যার প্রতি মুসল্লীরা সন্তুষ্ট থাকে (তিরমিযী, মিশকাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, কিয়ামতের একটি আলামত মসজিদ ওলাদের ইমামতী করার লোক না পাওয়া। ফলে তারা ইমাম পাবে না, যেব্যক্তি **অন্দের** নামায পড়াবে (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১০০ পৃষ্ঠা)। এটা হয় দ্বীনী ইলম না শেখার কারণে হবে। কিংবা ইমামদের সত্যিকার মান ও মর্যাদা না দেওয়ার কারণে হবে।

## জারজ সন্তানের ইমামতী

আয়েশাকে (রাঃ) যখন জারজ সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হোত তখন তিনি বলতেন, তার মা-বাপের পাপের কারণে, তার ঘাড়ে কোন দোষ নেই। কারণ, কুরআনে আছে:- অলা-তায়িরু ওরা-যিরাতুন ভিযরা উখরা- একের বোঝা অপরে ওঠাবে না' (সূরা বানী ইসরাইল ১৫ আয়াত, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ২য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)।

ত-বিয়ী হাসান বাসরী বলেন, জারজ সন্তান একজন মুসলমান ব্যক্তির সমান। সে ইমামতী করতে পারে এবং তার সাক্ষীও বৈধ হবে যদি সে ন্যায়নিষ্ঠ হয়। ইমাম শা'বীও বলেন, জারজ সন্তানের সাক্ষী বৈধ এবং সে ইমামতী করতে পারে। ইমাম যুহরীরও মত তাই। (মুসান্নাফ আবদুর রায়যাক ২য় খণ্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, মুহাল্লা ৪র্থ খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)।

এই ব্যাপারে একথা জেনে রাখা ভাল যে, ব্যভিচার করার ফলে যে দোষটা হয় সেটা ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর দোষ। কিন্তু নিষ্পাপ জারজ সন্তানের তাতে কোন দোষ থাকে না। তাই মওলানা হাফেয আবদুল কাদের রূপড়ী (রহঃ) বলেন, জারজ সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার কানে আযান ও তকবীর দিতে হবে। সে মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে এবং মুসলমানদের গোরস্তানে তাকে মাটি দিতে হবে (তানযীমে আহ্লে হাদীস, লাহোর ২১ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ফাতা-ওরা ওলামায়ে হাদীস, ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা)।

## ফাসেক ও মোনাফেকের ইমামতী

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমার পরে অতি শীঘ্রই তোমাদের শাসক এমন হবে যে-নেককার হবে ও তার নেকী তার সাথে থাকবে এবং যে ফাজির বা দুরাচার হবে তার কদাচার তার সাথে থাকবে। অতএব তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার যে-নির্দেশটা ঐশী সত্যের মোতাবেক হবে সেটা তোমরা মেনে নেবে। আর তাদের পেছনে (জামাআতে) নামাযও পড়বে। তারা যদি ভাল কিছু করে তাহলে তা তোমাদের জন্য ভাল এবং তাদের জন্যেও তা ভাল হবে। আর তারা যদি খারাপ কিছু করে তাহলে তা তোমাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু তাদের জন্য সেটা খারাপ হবে

(দারাকুতনী, ১৮৪ পৃষ্ঠা, নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)।

এক গভর্ণর অলীদ ইবনে উকবাহ ইবনে আবু মুয়ীত মদ খেতেন।  
তবুও তাঁর পেছনে বিখ্যাত সাহাবী ইবনে মাসউদ প্রমুখ নামায পড়তেন।  
(শারহে ফিকহে আকবার ৯২ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী ইবনে ওমর (রাযিঃ) হাজ্জাজ ও নাজদার পেছনে নামায  
পড়তেন। ওঁদের একজন ছিলেন খারেজী এবং অন্যজন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ  
ফাসেক। তা-বিয়ী হাসান বাসরী বলেন, মোনাফেকের পেছনে মোমেনের  
নামায কোন ক্ষতি করেনা এবং মোমেনের পেছনে নামায ফাসেককে  
কোন ফায়দা দেয় না।

ইমাম ইবনে হায্ম বলেন, আমি কোন সাহাবী থেকে এ খবর পাইনি  
যে, তিনি মোখতার ও ওবায়দুল্লাহ এবং ইবনে যিয়াদ ও হাজ্জাজের  
পেছনে নামায পড়তে মানা করেছেন। কারণ, ওঁদের চেয়ে বড় ফাসেক  
আর কেউই নেই (মুহাল্লা, ৪র্থ খণ্ড, ২১৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠা)।

### অযুহীন ইমামের ইমামতী

বিখ্যাত তাবেয়ী ওরঅহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা  
ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। অথচ  
তিনি করয গোসল জনিত নাপাক ছিলেন। অতঃপর তিনি (পাক হোয়ে)  
এক এই নামাযটা ঘুরিয়ে পড়লেন। হাদীসটির রাবী বলেন, আমরা এ  
খবর পাইনি যে, তাঁর মোক্তাদীগণও ঐ নামায ঘুরিয়ে পড়েছেন কিনা?  
(মুত্তা ইমাম মালিক)।

তাবিয়ী সালেম বলেন, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর একদা  
আসরের নামায জামাআতে পড়ান। অথচ তিনি অযুহীন ছিলেন। তাই  
তিনি (পরে অযু করে) পুনরায় নামায পড়লেন, কিন্তু তাঁর সাথীগণ  
পুনরায় নামায পড়লেন না।

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ইবরাহীম নাখরী ও হাসান বাসরী এবং  
সারীদ ইবনে জোবায়র প্রমুখ তা-বিয়ীগণ বলেন, যদি কেউ পাক না  
হোয়ে ইমামতী করে ফেলে তাহলে সে নিজের নামাযটা ঘুরিয়ে পড়বে।  
কিন্তু তার মোক্তাদীরা ঐ নামায ঘুরিয়ে পড়বে না। কিন্তু হযরত আলীর

একটি বর্ণনায় আছে যে, মোক্তাদীরাও ঐ নামায় ঘুরিয়ে পড়বে।

এর জওয়াবে ইমাম ইবনে হাযম বলেন, আলী বর্ণিত ঐ হাদীসটির ৪জন রাবী কোন না কোন দোষে দুষ্ট। সুতরাং ঐ রিওয়ায়তটি অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া কোন সাহাবী থেকে খলীফা ওমর ও ইবনে ওমর বর্ণিত উক্ত বর্ণনা দুটির বিরোধিতাও সহী সনদে পাওয়া যায় না (মুহাল্লা, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ ও ২১৭ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হুকুমটা হল ভুল কোরে অনিচ্ছাকৃত অযুহীন অবস্থা কিংবা ফরয গোসল জনিত নাপাক অবস্থায় নামায় পড়ার ব্যাপার। তা ইচ্ছাকৃত অবস্থায় নয়।

### উলঙ্গ ব্যক্তির নামায় ও ইমামতী

হযরত আলীকে উলঙ্গ ব্যক্তির নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লোকটি যদি এমন জায়গায় থাকে যে, অন্যন্য লোকেরা তাকে দেখা পাবে তাহলে তিনি বসে বসে নামায় পড়বেন। আর তিনি যদি এমন জায়গায় থাকেন যে, লোকেরা তাকে দেখা পাবে না তাহলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায় পড়বেন (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২য় খণ্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)।

কাতাদাহ বলেন, ডুবন্ত লোকেরা যখন সাগর থেকে উলঙ্গ বের হবে তখন তাদের একজন ইমামতী করবে। কিন্তু সবাই বসে বসে নামায় পড়বে। আর ইমাম তাদেরই সাথে একই কাতারে বসে থাকবে এবং তারা সবাই ইশারায় নামায় পড়বে।

উক্ত কাতাদার ছাত্র মা'মার বলেন, তাদের মধ্যে কারো একজনের উপরে যদি কাপড় থাকে তাহলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামতী করবেন এবং একটি লাইনে একা দাঁড়াবেন। আর মুক্তাদীগণ তার পেছনে একটি লাইনে বসে বসে নামায় পড়বে (ঐ ৫৮৩ পৃষ্ঠা)।

### ইচ্ছাকৃত বিনা অযুতে নামায় পড়ার শাস্তি

কেউ যদি জেনেগুনে ইচ্ছাকৃত বিনা অযুতে নামায় পড়ে তাহলে তার শাস্তি অতি জঘন্য হবে। যেমন হাফেয ইবনুল কাইয়িম লিখেছেন: ইমাম

তাহাভী (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে মরফুভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একজন লোককে কবরে একশো চাবুক মারার সাজা হবে এবং তার কবরে আগুন ভরে দেওয়া হবে। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করবে যে, আমার এই সাজা হচ্ছে কেন ? বাহ্যতঃ আমার কোন গোনাহ এমন নেই তো! ফেরেশতা জওয়াবে বলবে, তুমি একটি নামায বিনা অযুতে পড়েছিলে এবং মযলুম ও অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশ দিয়ে গিয়েছিলে, অথচ তাকে কোন সাহায্য করনি (কিতাবুর রুহ ৭২ পৃষ্ঠা, নামায কে আহকা-ম অমাসা-য়েল, ১৪ পৃষ্ঠা)।

### আহলে হাদীসের ইমামতীতে হানাফীর নামায

হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়ার অনুবাদে আছে:- আহলে হানীসরা আহলে সুন্নত অল্জামাআত এবং হকের উপরে আছে। **ঐদের** পেছনে হানাফীদের নামায জায়েয। এ ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) **আছে** (হিদায়ার উর্দু অনুবাদ আইনুল হিদা-য়াহ ৫২৫ পৃষ্ঠা, নওলকিশোর স্তম্ভা)।

হানাফী মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ) বলেনঃ- গায়র মুকাল্লিদীন (চার ইমামের অন্ধ অনুসারী নন এমন আহলে হাদীসদের) **সাথে আহলে সুন্নাতে**র আকীদাগত ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তাই **ঐরা** আহলে সুন্নাত। আর **ঐদের** পেছনে ইকতিদা (নামায পড়া) সিদ্ধ **ফাতা-ওয়া রশীদিয়াহ**, ২য় খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ)।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেনঃ এটা প্রকাশিত হয়েছে যে, গায়র মুকাল্লিদ (আহলে-হাদীস) এর পেছনে-আকীদায় **ঐক্যমত** হলে, যদিও খুঁটিনাটি মসলাতে মতভেদ থাকে-ইকতিদা (নামাযে **অনুসরণ** করা) জায়েয (ফাতা-ওয়া ইমদা-দিয়াহ ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)।

**দেওবন্দের** হানাফী মুফতী মাওলানা আযীযুর রহমান উসমানী বলেন, (প্রচলিত ৪ মযহাবের অন্ধ অনুসারী নয় এমন) গায়র মুকাল্লিদের পেছনে মুকাল্লিদদের এবং মুকাল্লিদের পেছনে গা'ইর মুকাল্লিদের নামায সিদ্ধ (মুহা-জির পত্রিকা ২৯শে জুন ১৯২৮ সংখ্যা)।



## ইমামের দায়িত্ব

আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, আমি নামায শুরু করি এবং তা লম্বা করার ইচ্ছা করি। অতঃপর বাচ্চা ছেলেমেয়ের কান্নার আওয়ায শুনতে পাই। ফলে ঐ বাচ্চার কান্নার কারণে তার মায়ের বিচলিত হবার ভয়ে আমি নামায সংক্ষেপে করে দিই (বুখারী)। আবু মসউদ বলেন, একদা একব্যক্তি অভিযোগ করলো, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! অমুক ইমামের নামায খুব লম্বা হওয়ার কারণে আমি সকালের নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরীতে আসি।

রাবী বলেন, নসীহত করার ব্যাপারে ঐ দিনের চেয়ে বেশী আমি কোনদিন রসূলুল্লাহকে রাগতে দেখিনি। তারপর তিনি বললেন, (নামায লম্বা করার কারণে) তোমাদের মধ্যে কিছুলোক লোকেদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। শোন! তোমাদের মধ্যে যেকেউ নামায পড়বে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কারণ, নামাযীদের মধ্যে দুর্বল ও বুড়ো এবং কাজের লোকও থাকে (বুখারী, মুসলিম)।

সহীহায়নের অন্য রিওয়াযাতে আছে, যখন কেউ একা নামায পড়বে তখন সে যত পারে লম্বা করবে (মিশকাত, ১০১ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসগুলো প্রমান করে যে, জামাআতে নামায পড়বার সময় মোক্তাদীদের প্রতি ইমামের লক্ষ্য রাখা উচিত। নামায যেন এত লম্বা না হয় যার ফলে মোক্তাদীদের কষ্ট হয়। তদ্রূপ নামায যেন এত সংক্ষিপ্তও না হয় যার ফলে কিয়াম ও রুকু, কওমা ও সিজদা এবং অন্যান্য আরকান পরিপূর্ণরূপে আদায় না হয়। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নাবী (সঃ) এর জামাআত খুব সংক্ষিপ্ত হলেও আনুমানিক ২০ মিনিটের কমে হোত না। সুতরাং বর্তমান ব্যস্ততার যুগে জামাআত খুব সংক্ষেপে করলেও তা ১০ মিনিটের কমে হওয়া উচিত নয়।

তাই আল্লাহর রসূল বলেন, জামাআতে নামায পড়বার সময় ইমামরা যদি ঠিক পড়ায় তাহলে তোমরা (মোক্তাদীরা) তার নেকী পাবে। আর তারা যদি কোনরূপ ভুলচুক করে তাহলেও তোমরা নেকী পাবে, কিন্তু ভুলের খেসারত ঐ ইমামের ঘাড়ে পড়বে (বুখারী, মিশকাত, ১০১ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী আবু মসউদ আনসারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে দাঁড়াবার সময় আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন ও বলতেন সোজা হোয়ে দাঁড়াও এবং ভিন্ন ভিন্ন হয়ো না। ফলে তোমাদের হৃদয় ভিন্ন ভিন্ন হোয়ে যাবে। (আপোষের মধ্যে মিল থাকবে না (মুসলিম)। আনাস বলেন, আল্লাহর রসূল জনদিকে ফিরে বলতেনঃ তোমরা সোজা হোয়ে দাঁড়াও এবং কাতার সোজা করো। তারপর বামদিকে ফিরে বলতেন, তোমরা সোজা হোয়ে দাঁড়াও এবং কাতার সোজা করো' (আবু দাউদ)।

নু'মান ইবনে বাশীর বলেন, একদা আল্লাহর রসূল বেরিয়ে এসে কাতার জায়গায় দাঁড়ালেন। অতঃপর তকবীর দেওয়া হবে ঠিক এমনই সময়ে তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যার বুকটা কাতার থেকে একটু বেরিয়েছিল। ফলে তিনি বললেন, 'ওগো আল্লাহর বান্দারা! কাতার সোজা করো। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দেন' (মুসলিম)। নু'মানের অন্য বর্ণনায় আছে যে, যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই তখন আল্লাহর রসূল আমাদের কাতার সোজা করতেন, তারপর তকবীর দেওয়া হোত (আবু দাউদ, মিশকাত, ৯৮ পৃষ্ঠা)।

উল্লিখিত ৪টি হাদীস প্রমান করে যে, জামাআত শুরু করার সময় তকবীর দেওয়ার আগে অথবা তকবীর দেওয়ার সময়ে ইমামের দায়িত্ব মোক্তাদীদেরকে লাইন সোজা করতে বলা এবং দরকার হলে তাদের কাঁধে হাত দিয়েও লাইন সোজা কোরে দেওয়া ও তারপর জামাআত শুরু করা। এই হাদীসগুলো দ্বারা এটাও প্রমানিত হয় যে, প্রথমে মোক্তাদীরা দাঁড়িয়ে লাইন সোজা করবে, তারপরে তকবীর দেওয়া হবে।

বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) লিখেছেনঃ এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর যখন ইমামতি করতেন তখন কাতার সোজাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার সোজা হওয়ার সংবাদ না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তকবীর বলাতেন না। ওমর ইবনে আবদুল আযীযও এই নীতি পালন করতেন (গুনয়াতুত ত-লেবীন, বাংলা অনুবাদ, ২য় খণ্ড, শেষার্ধ্বে, ৩১ পৃষ্ঠা, আস্সলা-তু মা-ইয়ালযামু লাহা, ১০০ পৃষ্ঠা)। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) খলীফা উসমান (রাযিঃ) এর যুগেও কাতার সোজাকারী কয়েকজনের বিবরণ উল্লেখ করেছেন (বাইহাকী, ২য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা)।

ইমামের উচিত প্রথম রাকআত লম্বা ও শেষ রাকআত খাটো করা (বুখারী)। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়িয়ে (ফরয) নামায পড়ে সে যেন ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে (সুন্নত ও নফল) নামায না পড়ে, বরং একটু সরে দাঁড়াবে (সহীহ আবু দাউদ, হাদীস নং ৬২৯ মিশকাত, ৮৮ পৃষ্ঠা)।

সালাম ফেরার পর ইমাম সাহেব যেন কখনো ডাইনে ও কখনো বামে মুখ ফিরে বসেন। সর্বদা কেবল এক দিকে মুখ ফিরে বসলে শয়তান তাতে দখল দেয় (তিরমিযী)। কোন কম ইলমওলা ইমাম তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কোন ইমামকে যদি পেয়ে যায় তাহলে তার উচিত তাঁকে ইমামতী করতে দিয়ে নিজে মোক্তাদী হওয়া (বুখারী, ৯৪ পৃষ্ঠা)।

### কতিপয় ইমামের বিদআত

অনেক মসজিদে দেখা যায় যে, জামাআত শুরু হবার সময় তকবীর দেওয়া কালে ইমাম ও মোক্তাদীরা দাঁড়িয়ে লাইন সোজা না করে প্রথমে বসে থাকে। তারপর মুকাববির 'হাইয়া আলাস সলা-হু কিংবা কাদ কা-মাতিস সলা-হু' বলার সময় সবাই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে এবং তকবীর বলা শেষ না হতেই ইমাম সাহেব নামায শুরু করে দেন-এরূপ করা বিদআত ও মহানাবীর সুন্নতের খেলাফ কাজ। আল্লাহ বিদআতীদের হিদায়াত দিন-আমিন!

### মসজিদের বাইরে থেকে ইকতিদা হবে কিনা

এক তাবেরী স্ব-লিহ ইবনে ইবরাহীম একদা দেখেন যে, বিখ্যাত সাহাবী আনাস ইবনে মা-লিক (রঃ) হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমানের ঘরে অলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নামাযের সাথে (তাঁর ইমামতীতে) নামায পড়েন। অথচ তাঁদের উভয়ের মাঝে রাস্তা ছিল (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩য় খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা, বাইহাকী ৩য় খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)।

আবু মিজলায বলেন, ইমামের নামাযের সাথে মেয়েরা নামায পড়তে পারে। যদিও উভয়ের মাঝে রাস্তা কিংবা দেওয়াল থাকে। ইমামের তকবীর শুনতে পেলে কোন আপত্তি নেই (প্রথমোক্ত ৮২ পৃষ্ঠা)।

## ইমামতীর বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু তথ্য

কুরআন ও হাদীসের বিজ্ঞ আলেম হলেই যে, কোন ব্যক্তি যোগ্য ইমাম হবেন এমন কোন ব্যাপার নেই। কারণ, একজন ডাক্তারকে যেমন থিওরী পাশের পর প্রাকটিক্যাল ময়দানে কাজ করতে হয়। তেমনি একজন আলেমরও উচিত ইমামতীর ট্রেনিং নেওয়া। এইজন্যই সউদী আরব ও কোয়েত প্রভৃতি দেশে ইমামদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর তাদেরকে ইমামতী পদে নিয়োগ করা হয়।

১৯৭৫ ও ১৯৮৯ সালে কলকাতার মেটিয়ারক্জে আহলে হাদীস সম্মেলন হয়। তখন পশ্চিম বাংলার দুই বিখ্যাত বক্তা যারা বহু বছর ধরে বুখারী শরীফ পড়িয়েছেন—এমন আলেমকে হাওলদার পাড়া জামে মসজিদে একজনকে বৃহস্পতিবার মগরেব ও এশা এবং অন্যজনকে জুমআ পড়তে দেওয়া হল। কিন্তু মগরেব ও এশায় উক্ত ইমাম সূরা কা-ফিরুন ও ইখলাস এবং সূরা মুনাক্কিন ও জুমআ পড়েননি। আর জুমআর ইমাম মেঘারে সূরা কা-ফ এবং নামাযে সূরা আ'লা ও গা-শিয়াহ পড়েননি। ফলে আমাদের কতিপয় পাকা মুসল্লী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এত বড় আলেম বৃহস্পতিবার ও জুমআর সুন্নতী সূরা জানেন না? উত্তরে আমি বললাম, নিশ্চয়ই জানেন। তবে ওঁরা হয়তো ইমামতী করেন না। তাই বাস্তব জ্ঞানের অভাব থাকতে পারে।

এইরূপ ১৯৬৪ সালে কলকাতায় এবং দিল্লি, বোম্বাই ও বেনারস প্রভৃতি এলাকায় কতিপয় উর্দুভাষী বিখ্যাত আলেমকেও আমি দেখেছি যে, বাস্তব জ্ঞানের অভাবে খুঁটিনাটি ভুল তাঁদের দ্বারা হোয়ে পড়ছে। এই কারণেই মনে হয় এই উপমহাদেশে যিনি আহলে-হাদীস আন্দোলনের মহান নেতা, যিনি ৬২ বছর ধরে শতাধিক বার বুখারী পড়িয়ে এবং কুরআন ও হাদীস প্রচার কোরে ৮০ লাখ লোককে আহলে হাদীস করেছিলেন সেই মুহাদ্দিসে-হিন্দ ইমাম সাইয়েদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আল্লামা আব্দুল অহ্‌হাব মুলতানী সাদরীকে বহুবার বলেছিলেন, মওলানা আব্দুল্লাহ গয়নভী আমাকে নামায পড়া শিখিয়েছেন। আর আমি তাঁকে বুখারী পড়িয়েছি ও বুঝিয়েছি (হিদা-

য়াতুন নাবী ৭৯ পৃষ্ঠা)।

একটি হাদীসে সাহাবী আনাস বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর নামায পুরো কোরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। তাই তোমরা আমার চেয়ে আগে বেড়ো না রুকুতে, না সিজদাতে, না দাঁড়ানোতে আর না সালাম ফেরানোতে। কারণ, তোমাদেরকে আমি দেখে থাকি আমার সামনে থেকে এবং যে আমার পেছনে থাকে তাকে (মুসলিম, মিশকাত, ১০১ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় আছে, ইমামের আগে কেউ মাথা তুললে ঐ মুক্তাদীর মাথাকে আল্লাহ গাধার মাথা বানিয়ে দিতে পারেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০২ পৃষ্ঠা)। এই জন্যই সাহাবায়ে কিরাম রুকু থেকে সিজদায় যাবার জন্য তাঁদের পিঠটাকে ততক্ষণ নোয়াতেন না যতক্ষণ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজের কপালটা যমীনে না রাখতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০১ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত তিনটি হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম ও মুক্তাদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। আমাদের দেশে ইমাম ট্রেনিংয়ের জন্য সরকারী কিংবা বেসরকারী কোন ব্যবস্থায়ই নেই। তাই সউদী আরবে তাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইমামদের ইমামতী দেখে এবং আমার বিগত ২১ বছরের ইমামতীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু কথা আমাদের দেশের ইমামদের জন্য লিখলাম। এটাকে অনুসরণ করলে আশা করি অনেক ইমাম ও মুক্তাদী আল্লাহর উপরোক্ত শাস্তি থেকে ইন-শা-আল্লাহ মুক্তি পেতে পারেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেক আয়াতের শেষে অক্ফ করতেন এবং একটু টান দিয়ে পড়তেন (যা-দুল মাআ-দ ১ম খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)। তাই প্রত্যেক ইমামের উচিত সূরা ফাতেহা এক বা দু দমে নয়, বরং সাতটি আয়াত সাত (৭) দমে পড়া। তেমনি অন্যান্য আয়াতও পড়ার সময় প্রত্যেক আয়াতে দম ছাড়তে হবে।

কিরাআত পড়ার পর ইমাম যখন রুকুতে যাবেন তখন কিরাআত শেষ কোরে দাঁড়ানো অবস্থায় দু হাত তুলে একটু ঝুঁকে রুকু যাবার তাকবীর

দিন। তাহলে কোন মুক্তাদীই ইমামের আগে রুকু যেতে পারবে না। তেমনি রুকু শেষ কোরে মাথা তোলার সময়ই সামিআল্লা-হ লিমান হামিদাহ না বলে মাথাটা আগে তুলে রুকু ও দাঁড়ানোর মাঝ বরাবরে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলুন। তাহলে ইমামের আগে মুক্তাদী মাথা তোলার সুযোগ পাবেন না।

অতঃপর ইমাম সাহেব কওমার দুআ একটি নয়, বরং দুটি দুআ পড়ুন। তাহলে কোন মুক্তাদীই সিজদায় যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করতে পারবেন না। সেই সাথে নাবী (সঃ) এর সুন্নতও পালন হবে। কারণ, তিনি (সঃ) রুকু থেকে উঠে এতক্ষণ দাঁড়াতে যে, সাহাবায়ে কিরাম ভাবতেন, নাবী (সঃ) বোধ হয় (সিজদা দিতে) ভুলে গেছেন (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)।

কওমার পর সিজদায় যাবার সময় দাঁড়ানো অবস্থায় ইমাম সাহেব তাকবীর না দিয়ে রুকু থেকে সিজদা যাবার মাঝ বরাবরে সিজদার তাকবীর দিন তাহলে ইমামের আগে কেউই সিজদায় যেতে পারবে না। তেমনি সিজদা শেষ কোরে সিজদা অবস্থাতেই তাকবীর না দিয়ে সিজদা থেকে মাথা তুলে সিজদা এবং বসার মাঝ বরাবরে তাকবীর দিন। তাহলে ইমামের আগে কেউই মাথা তুলতে পারবে না।

অতঃপর ইমাম সাহেব জলসার দুআ একটি নয়, বরং দুটি দুআ পড়ুন। তাহলে দ্বিতীয় সিজদার জন্য কেউ তাড়াহুড়ো করতে পারবে না। সেই সাথে দুই সিজদার মাঝখানে নাবী (সঃ) এর দেবী করা সুন্নতটিও পালিত হবে। অতঃপর বসা ও সিজদারত অবস্থার মাঝ বরাবরে দ্বিতীয় সিজদায় যাবার তাকবীর দিন। তাহলে ইমামের আগে কেউই সিজদায় যেতে পারবে না।

এভাবে প্রথম রাকআতের দুটি সিজদা শেষ কোরে সিজদা অবস্থায় নয়, বরং সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর দিয়ে নামমাত্র বসে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ুন। তাহলে কোন মুক্তাদীই ইমামের আগে ২য় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে পারবে না।

প্রত্যেক ইমামেরই একথা মনে রাখা দরকার যে, দুই সিজদার মাঝে

রসূলুল্লাহ (সঃ) অনেকক্ষণ দেরী করতেন। যাতে সাহাবীগণ ভাবতেন যে, তিনি মনে হয় (২য় সিজদা দিতে) ভুলে গেছেন (মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু দুই সিজদার শেষে ১ম ও ৩য় রাকআতের পর ২য় ও ৪র্থ রাকআতের জন্য দাঁড়বার কালে বসা ও দাঁড়ানোর মাঝে তিনি অত দেরী মোটেই করতেন না, বরং নামমাত্র বসেই উঠে পড়তেন। এই বসাটা আলেমদের অনুমানে একবার তাসবীহ (সুবহা-নাল্লাহ) পড়ার মত সময় হবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা)।

উক্ত নিয়মে দ্বিতীয় রাকআতও পড়াতে হবে। তারপর আন্তা-হিয়াতু পড়ে বসা অবস্থায় নয়, বরং একটু ওঠা অবস্থায় তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে হবে। তাহলে ইমামের আগে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। উক্ত বর্ণনা মোতাবেক ৩য় ও ৪র্থ রাকআত পড়ে আন্তাহিয়াত ও দরুদ এবং দুআয়ে মাসূরা পড়ার শেষে লম্বা টান দিয়ে নয় এবং মাথাটাও হেলিয়ে দুলিয়ে নয়, বরং চট কোরে ডাইনে ও বামে সালাম ফিরতে হবে। যাতে সালামের লম্বা টান দেওয়া ও মাথা হেলানোর কারণে কোন ইমামের বামে সালাম ফেরার আগেই কোন মুক্তাদী বামে সালাম না ফিরতে পারে।

সাহাবী আবু হুরাইরাহ বলেন, ‘সালাম’ সংক্ষেপে বলা সুন্নত। একথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে মুবারক বলেন, খুব বেশী টান দিয়ে তা বলবে না (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)।

সালাম ফিরেই ইমামের উচিত চেষ্টায় আল্লা-হু আকবার, ও আন্তাগফিরুল্লাহ বলা এবং আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-ম অমিনকাস সালাম তাবা-রক্তা ইয়-যাল্জালা-লি অলইক্রা-ম দুআ তিনটি কিবলামুখী হয়ে পড়া এবং তারপর ডান বা বাম পাশ হয়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসা (মুসলিম, মিশকাত ৮৮ পৃষ্ঠা, মিরআ-ত ১ম খণ্ড, ৭১৭ পৃষ্ঠা)।

অতঃপর মুক্তাদীদের সঙ্গে নিয়ে চেষ্টায় দুআ না কোরে পর মুহুর্তেই উঠে পড়া। যেমন সাহাবী আনাস বলেন, আমি নাবী (সঃ) এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি সালাম ফিরেই পর মুহুর্তেই উঠে দাঁড়াতেন। তারপর

আমি আবু বাকরের পেছনে নামায পড়েছি তিনিও সালাম ফেরার পর লাফ দিয়ে উঠে পড়তেন। মনে হোত যে, তিনি যেন গরম পাথরের উপর থেকে উঠে পড়তেন (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)।

উমার রযিঃ বলেন, সালাম ফেরার পরও ইমামের (দীর্ঘক্ষণ) বসে থাকা বিদআত (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্ ১ম খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা)।

### মুক্তাদীর কর্তব্য

আল্লাহর রসূল বলেন, তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ কোরো না। বরং যখন তিনি আল্লাহ আকবার বলেন তখন তোমরাও আল্লাহ আকবার বল। যখন তিনি ‘অলায য-ল্লীন’ বলেন তখন তোমরা আ-মীন বল। যখন তিনি রুকু করেন তখন তোমরা রুকু করো। যখন তিনি ‘সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্’ বলেন তখন তোমরা ‘আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ’ বল (বুখারী, মুসলিম)। তিনি বলেন, যেব্যক্তি ইমামের আগে মাথা তোলে সে কি এই ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা করে দেবেন বোখারী ও মুসলিম)।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা ওঠায় ও নামায় তার কপালের চুলটা শয়তানের হাতে থাকে (মুত্তা ইমাম মালিক)।

তাই সাহাবী বারা ইবনে আ-যিব বলেন, আমরা নাবী (সঃ) এর পেছনে নামায পড়তাম। অতঃপর যখন তিনি ‘সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্’ বলতেন তখন আমাদের কেউ ততক্ষণ সিজদায় যেত না স্বতক্ষণ না নাবী (সঃ) তাঁর কপাল যমীনে ঠেকাতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠা)।

সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবয়ী মোক্তাদীদের সম্বন্ধে ইমাম বায়হাকী লিখেছেন যে, তাঁরা নামাযে নিজেদের দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখতেন এবং এদিকে ওদিকে ফেরাতেন না (বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, ২৮৩ ও ২৮৪ পৃষ্ঠা)।

### প্রথম কাতারের গুরুত্ব

আল্লাহর রসূল বলেন, পুরুষদের সবচেয়ে সেরা কাতার প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার শেষ কাতার (মুসলিম)। তিনি বলেন,



আল্লাহ ও ফেরেশ্তারা প্রথম কাতারের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবীরা বললেন, ২য় কাতারের ওপর, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তারা প্রথম কাতারের ওপর রহমত নাযেল করেন। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! ২য় কাতারের ওপর? তিনি আবার বললেন, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তারা প্রথম কাতারের ওপর করুণা অবতীর্ণ করেন। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! ২য় কাতারের ওপর? এবার তিনি বললেন, হাঁ, দ্বিতীয় কাতারেরও ওপর (আহমাদ)।

তিনি বলেন, সর্বদা একদল লোক প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ তাদের পেছন কোরতে কোরতে জাহান্নামে ফেলে দেবেন (আবু দাউদ, মিশকাত, ৯৮ ও ৯৯ পৃষ্ঠা)।

### কাতার সোজা করার গুরুত্ব

আল্লাহর রসূল বলেন, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। কারণ, কাতার সোজা করা নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করার একটি অঙ্গ (বুখারী, মুসলিম)। তিনি বলেন, তোমরা কাতার সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দেবেন (মুসলিম)। তিনি বলেন, তোমরা লাইনগুলো সোজা করো, কাঁধগুলো সমান কোরে রাখো এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হোয়ে যাও (অর্থাৎ কোন ভাই যদি হাত দিয়ে লাইন সোজা করতে চায় তাহলে তার কথা মেনে নাও)। আর শয়তানের জন্য খালি জায়গা ছেড়ে রেখো না। যেব্যক্তি লাইন মেলায় আল্লাহ তাকে রহমতের সাথে মেলাবেন এবং যে ব্যক্তি লাইন কেটে দেয় আল্লাহ তাকে তার রহমত থেকে কেটে দেবেন (আবু দাউদ, নাসায়ী)।

তিনি বলেন, তোমরা (ইন্টার জোড়া লাগার মত) লাইনগুলো মিলিয়ে দাও। যার হাতে আমার প্রান রয়েছে তাঁর কসম! আমি দেখছি যে, ছোট বকরীর বাচ্চার মত শয়তান কাতারের ফাঁকগুলোর মধ্যে ঢুকছে (আবু দাউদ)। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম নামাযে যার কাঁধ সবচেয়ে নরম। অর্থাৎ যার কাঁধ ধরে কেউ লাইন সোজা করে দিলে সে রেগে যায় না, বরং তা খুশিমনে মেনে নেয় (আবু দাউদ)।

একদা তিনি সাহাবীদেরকে বলেন, কিগো, তোমরা ঐরূপ কাতার

করতে পার না ফেরেশ্তারা যেরূপ কাতার তাদের প্রভুর সামনে দেয়? সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ফেরেশ্তারা তাদের প্রভুর সামনে কেভাবে লাইন দেয়? তিনি বললেন, তারা প্রথমে প্রথম লাইনগুলো পুরো করে। তারপর (ইঁটে জোড়া লাগার মত) লাইনে সেন্টে সেন্টে দাঁড়ায় (মুসলিম)। অতএব তোমরা প্রথমে প্রথম লাইন পুরো করো। তারপর তারপরের লাইন পুরো করবে। অতঃপর যদি কোন লাইন পুরো না হয় অহলে তা শেষের দিকে হোলে আপত্তি নেই (আবু দাউদ)।

তোমরা কাতার দেবার সময় ইমামকে ঠিক মাঝখানে রাখো এবং (তার পেছনের) খালি জায়গাগুলো থেকে লাইন পুরন করো (আবু দাউদ)। অর্থাৎ ইমামের ডাইনে ও বামে সমান রেখো। তবে হাঁ, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা কাতারগুলোর ডানদিককার মুসল্লীদের উপর রহমত নাযেল করেন (আবু দাউদ, মিশকাত, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)। সেজন্য ডানদিকে একটু বেশী থাকলে থাকতে পারে। কিন্তু বাম দিকে যেন বেশী না হয়।

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমানিত হয় যে, কাতার সোজা না কোরলে নামায পূর্ণ হয় না এবং নামাযীদের মনে মিল ও মোহব্বত সৃষ্টি হয় না। দুই নামাযীর মাঝখানে জায়গা ফাঁক থাকলে সেখানে শয়তান এসে দাঁড়ায় এবং নামাযীদের একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। যেসব মুসল্লীরা কাতার দেওয়ার সময় দেওয়ালের ইঁটের মত একে অপরের সাথে সেন্টে সেন্টে দাঁড়ায় না আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। সেজন্য রসূলুল্লাহর দশ বৎসরের খাস খাদেম সাহাবী আনাস (রযিঃ) বলেন, আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেকে তার সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ ও পার সাথে পা মিলিয়ে রাখতেন—(বুখারী ১০০ পৃষ্ঠা)।

নু'মান ইবনে বাশীর বলেন, আমি সাহাবীদেরকে দেখেছি যে, তারা নামাযে তাদের সাথীদের কাঁধের সাথে কাঁধ, তাদের হাঁটুর সাথে হাঁটু ও তাদের পায়ের গাঁটের সাথে গাঁট সেন্টিয়ে রাখতেন (আবু দাউদ)।

এই কাতার সোজা করা সম্পর্কে আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) লিখেছেন:- এক রিওয়াযাতে বর্ণিত আছে যে, (আল্লাহর রসূলের মুআযযিন) বিলাল (রযিঃ) যখন কাতার সোজা কোরতেন তখন মুসল্লীদের পায়ের গাঁটে চাবুক মেরে মেরে লাইন সোজা কোরতেন (গুনয়াতুত তা-লেবীন,

বাংলা অনুবাদ ২য় খণ্ড, শেষার্ধ্ব ৩১ পৃষ্ঠা)।

## জামাআতের কাতারে পায়ে পা মেলানোর

### হানাফী-ফতওয়া

মুসলমানদের একটি দল জামাআতে নামায পড়ার সময় এক মোক্তাদী অন্য মোক্তাদীর পায়ের সাথে পা মেলান না। কারণস্বরূপ তারা তাদের মনগড়া কেয়াসের ঘোড়া দৌড় করিয়ে বলেন যে, একজন ছোট ছেলে বা কমবয়স্ক লোক অন্য একজন বয়স্ক লোকের পায়ে পা মেলালে বেয়াদবী হয়। পক্ষান্তরে এই পৃষ্ঠার আগে বর্ণিত বুখারী ও আবু দাউদের রিওয়াযাত দুটি সাক্ষ্য দেয় যে, সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের পায়ে পা মিলিয়ে কাতার দিতেন, তাহলে তাঁরা কি বেয়াদব ছিলেন? নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ এই মনগড়া আদবগুলাদের সুমতি দিন-আমিন!

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত সহী হাদীসের ভিত্তিতে মালিকী ও শাফিয়ী এবং হাম্বলীরা ও কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী আহলে হাদীসরা একে অপরের পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ান এবং এই কাজকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নত হিসেবে মনেপ্রানে গ্রহন করেন।

হানাফী ফিকহ গ্রন্থেও আছে, ইমাম যেন লাইন সোজা করে এবং খালি জায়গা পূর্ণ কোরে গায়ে গায়ে সেঁটে দাঁড়াবার হুকুম করে এবং কাঁধে কাঁধ মেলাতে বলে (দুররে মুখতার, ১ম খণ্ড, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা কা-শা-নী হানাফী (মৃত, ৫৭৭হিঃ) বলেন, যখন তারা নামাযে দাঁড়াবে তখন যেন কাতার মিলিয়ে দেয় এবং কাঁধে কাঁধ মেলায় (বাদা-য়িঅ' ওয়া স্ননা-য়ি' ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, রসূলে আকরাম কী নামায, ৫১ পৃষ্ঠা)।

## মাসবুক বা জামাআতে পিছ পড়ে যাওয়া

### মোক্তাদীর নামায

জমাআতের কিছু অংশ ছেড়ে যাওয়ার পর যে মোক্তাদী জামাআতে শরীক হয় তাকে মাসবুক বা জামাআতে পিছ পড়ে যাওয়া মোক্তাদী বলে।

এই মাসবুক সম্পর্কে আল্লাহর নাবী (সঃ) বলেনঃ ‘তোমরা যখন ইকামত শুনতে পাবে তখন ধীরস্থির ও শান্তভাবে নামাযের দিকে ধাবিত হবে এবং দৌড়াদৌড়ি কোরবে না। অতঃপর (ইমামের সাথে) যতটা নামায পাবে ততটা পড়ে নেবে এবং যতটা ছাড় যাবে ততটা (জামাআতের শেষে) পুরা কোরে নেবে (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩০ পৃষ্ঠা)।

মাসবুকের যে অংশটা ছেড়ে যায় সেটা সে কিভাবে পড়বে এ সম্পর্কে বাইহাকীর রিওয়াযাতকৃত হযরত আলী বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল বলেনঃ- ‘তুমি যে অংশটা ইমামের সাথে পেলে সেটা তোমার নামাযের প্রথম অংশ। অতএব প্রথম অংশের ধারা অব্যাহত রেখে বাকি অংশটা পুরো কোরতে হবে। যেমন কেউ যদি যোহর, আসর ও এশার নামায মাত্র ১ রাকআত জামাআতে পায় তাহলে সে ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে দরুদ ও দুআয়ে মাসূরা না পড়ে শুধু আত্মাহিয়াতো পড়ে বসে থাকবে (আওনুল মা’বুদ)।

তারপর ইমাম সালাম ফিরলে সে এক রাকআত নামায সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা সহ পড়ার পর বসে শুধু আত্মাহিয়াত পড়বে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কেবল সূরা ফাতেহা দিয়ে দুই রাকআত নামায পড়বে। অতঃপর সে তাশাহুদে বসে আত্মাহিয়াত, দরুদ ও দুআয়ে মা-সূরা পড়ে সালাম ফিরবে (মিরআত, ১ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ মগরেবের জামাআতে এক রাকআত নামায পেলে ইমামের সালাম ফেরার পর মাসবুক উঠে দাঁড়িয়ে এক রাকআত নামায সূরা ফাতেহা ও অন্য ক্বিরাআত সহ পড়ার পর বসে আত্মাহিয়াত পড়বে। তারপর উঠে আর এক রাকআত শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে শেষ করার পর আত্মাহিয়াত দরুদ ও দুআয়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরবে।

ইমাম জোরে কেরাআত পড়লে মাসবুক নামাযী বাকী নামাযে জোরে কেরাআত পড়তে পারে (মুঅত্তা)। তবে অন্য মাসবুক নামাযীর অসুবিধা হলে সে কেরাআতটা আস্তে পড়বে।

আল্লাহর রসূল বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে আসবে তখন সে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেও তাই করবে (তিরমিযী, মিশকাত, ১০২ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ ইমাম যদি কিয়ামের অবস্থায় থাকেন তাহলে মোক্তাদী তাহরীমা বেঁধে কিয়ামেই शामिल হবে। যদি ইমাম রুকু বা সেজদায় থাকেন তাহলে মোক্তাদী তাহরীমা না বেঁধেই রুকু বা সেজদায় শরীক হবে। অনেক মুসল্লী ইমামকে সেজদার অবস্থায় পেয়ে জামাআতে শরীক না হোয়ে ইমামের দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে, এটা হাদীসের খেলাফ মনগড়া কাজ। আল্লাহ তাদের সুমতি দিন-আমিন!

যদি কোন মাসবুক নামাযী ইমাম সাহেবকে একদিকে সালাম ফেরা অবস্থায় পায় তাহলে সে ঐ জামাআতে আর শরীক হবে না। কারণ, ইমামের একদিকে সালাম ফেরার সাথে সাথেই জামাআত কেটে যায়। অনেক মাসবুক মুসল্লী ইমামের দুদিকে সালাম ফেরার পর তবে উঠে বাকি নামায পড়ে। এটাও তাদের ভুল। কারণ, ইমামের একদিকে সালাম ফেরার সাথে যেহেতু জামাআত কেটে যায় সেজন্য ইমামের একদিকে সালাম ফেরার সাথেই মাসবুক মুসল্লীকে উঠে পড়তে হবে। জামাআত শেষ হবার পর মসবুকরা যখন তাদের বাকি নামায একা একা পড়বে তখন তাদেরকে একে অপরের সাথে পা মেলাতে হবে না।

### ইমামের সালাম ফেরার পর চিল্পে দুআ পড়া সম্পর্কে

ইমামের সালাম ফেরার পর প্রায় আহলে হাদীস মসজিদে মুসল্লীরা চিল্পে চিল্পে কিংবা গুণ গুণ আওয়ায কোরে দুআ পড়তে থাকেন। ঐ জামাআতের সাথে কোন মসবুক নামাযীকে যদি তারা নামায পড়তে দেখেন তাহলে তারা যেন চিল্পে চিল্পে কিংবা গুণ গুণ আওয়ায কোরে দুআসমূহ না পড়েন, যাতে মসবুকদের নামাযে বাধা সৃষ্টি হয়।

একটি হাদীসে আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন অপরের উপরে চিল্পে কেরাআত না পড়ে (মুঅত্তা মালিক, মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী কানযুল ওমমা-ল, ৩৭২ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমান করে যে, মসবুকগণ নিজেরাও যেন বাকী রাকআতগুলোতে চিল্পে চিল্পে কেরাআত না পড়ে এবং সালাম ফেরা মুসল্লীগণ নামাযের পর দুআগুলো জোরে জোরে না পড়ে।

## রুকু পেলের রাকআত হবে কি না

আল্লাহর রসূল বলেন, যখন তোমরা নামাযে আসবে এবং আমাদেরকে সেজদা করা অবস্থায় পাবে তখন তোমরাও সেজদা করো এবং ওটাকে কিছু গন্য কর না। আর যদি কেউ রুকু পায় তাহলে সে ঐ রাকআতটি পেয়ে গেল (আবু দাউদ, মিশকাত, ১০২ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী আবু হুরাইরার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তার পিঠ সোজা করার আগে একটি রাকআত পেল সে রাকআতটি পেয়ে গেল (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)।

আবু হুরাইরাহ বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের শেষ রাকআতে রুকু পেল সে যেন ওর সাথে অন্য রাকআতটি মিলিয়ে নেয় (দারাকুতনী, ১৬৭ পৃষ্ঠা)।

যায়দ ইবনে অহাব বলেন, একদা আমি এবং ইবনে মাসউদ মসজিদে ঢুকলাম। অতঃপর আমরা ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলাম। তাই আমরাও রুকু করলাম। তারপর হেঁটে কাতারে সমান হয়ে গেলাম। অতঃপর ইমাম যখন নামায শেষ করলেন, তখন আমি দাঁড়লাম। যাতে ঐ রাকআতটি পুরো করি। তখন আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বললেন, তুমি নামায পুরো করেছো (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ও তাহা-ভী)।

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ইমাম শওকানী বলেন, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলো সে ঐ রাকআতটি পেয়ে গেল। এ দিকেই গিয়েছেন জমহুর বা অধিকাংশ ওলামা (নাইলুল আওতা-র ৩য় খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)।

মাওলানা আব্দুস সাত্তার (রহঃ) বলেন, বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা শাইখ ইবনে হাজার আঙ্কালানী সূরা ফা-তিহা পড়া ওয়া-জিব হবার মত পোষণকারী হওয়া সত্ত্বেও পরিষ্কার ভাষায় ফাতহুল বারীর ২য় খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ মাসবুক যা পিছপড়ে যাওয়া নামাযী রুকু পেলো রাকআতটি সে পুরো পাবে (ফাতা-ওয়া সান্তা-রিয়্যাহ ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা)।

মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নবভীও সূরা ফা-তিহা পড়া

ওয়াজিব হবার দাবী করা সত্ত্বেও বলেন, একজন মাসবুক যখন ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার থেকে সূরা ফাতিহা পড়াটা মাফ হোয়ে যাবে (নবভী শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, আনসারী ছাপা)।

এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাই একদল আলেম বলেন, পূর্বোক্ত আবু দাউদ ও দারাকুত্নীর হাদীসগুলো যযীফ। ওর একজন রাবী ইয়াহইয়া ইবনে আবী সুলাইমানকে ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস। অর্থাৎ ওঁর বর্ণিত হাদীস অস্বীকৃত। তাই ঐ হাদীস দলীলের অযোগ্য (মিরআতুল মাফা-তীহ ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

তাছাড়া এর রাবী হলেন সাহাবী আবু হোরায়রা। তিনি এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করলেও তিনি নিজেই এক ফতওয়ায় বলছেন, রুকুর আগে কিয়ামের অবস্থায় ইমামকে না পেলে রাকআতটি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না (বুখারী জুযু'ল কিরাআত, ৩৫ পৃষ্ঠা)। অন্য ফতওয়ায় তিনি বলছেন, যখন তুমি রুকু পাবে তখন সেটাকে রাকআতের মধ্যে গন্য করো না (ঐ, ৬৪ পৃষ্ঠা, মিরআত, ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

সেজন্য একদল আলেমের মতে রুকু পেলে রাকআতটি হবে না। বরং তা ঘুরিয়ে পড়তে হবে। এই দলে আছেন ইবনে খুযাইমা ও তাকিউদ্দীন সুবকী প্রমুখ (শারহে যুরকানী ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সাইয়েদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর অভিমতও তাই (ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১ম খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)। নওয়াব সিদ্দীক হাসানও তাই বলেন (আল-মাকা-লাতুল ফাসীহাহ ফিল্ অসিয়াহ্ অন্নাসীহাহ্ ৭৮ পৃষ্ঠা)। আল্লামা উবাইদুল্লাহ রহমানী সাহেবের বক্তব্য ঐরূপ (মিরআ-ত ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরাহ বলতেন, যে ব্যক্তি রাকআত (অর্থাৎ রুকু) পেল সে নিশ্চয়ই সিজদা (অর্থাৎ রাকআতটি পেল। আর যার থেকে সূরা ফা-তিহা পড়া ছাড় গেল তার থেকে বহু ভাল ছাড় গেল (মুঅত্তা ইমাম মা-লিক, মিশকাত, ১০২ পৃষ্ঠা)।

এই ফতওয়াটি সামনে রেখে উক্ত দুই দলের মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা যেতে পারে যে, যে, ব্যক্তি সম্পূর্ণ রুকু পেলেন তিনি রাকআতটি ঘুরিয়ে

না পড়লে গোনাহগার হবেন না। কিন্তু তার বহু ভাল ছাড় যাবার কারণে তিনি নেকী কম পেতে পারেন।

আর যিনি ঐ রাকআতটা ঘুরিয়ে পড়বেন তিনি বহু ভাল থেকে বঞ্চিত হবেন না। এবার যার বা ইচ্ছা তিনি তাই করুন। তবে ঐ রাকআতটি ঘুরিয়ে পড়াতে লাভ বেশী।

জামাআতের পরেই ইমাম ও মোক্তাদী মিলে হাত তুলে

দুআ করা সুন্নত, না বিদআত?

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উপমহাদেশে হানাফী ও আহলে হাদীস প্রায়ই মসজিদে জামাআতে নামায পড়ানোর পর সালাম ফিরেই হানাফী ইমামগণ কেবলার দিকে মুখ কোরে এবং আহলে হাদীস ইমামগণ ডাইনে বামে কিংবা মোক্তাদীদের দিকে মুখ কোরে হাত তুলে দুআ করেন এবং মোক্তাদীগণও হাত তুলে আমিন আমিন বলতে থাকেন। পাঁচঅঙ্ক জামাআতের পর এইরূপ জামাআত সহকারে দুআ করার কোন প্রমাণ দুনিয়ার কোন সহী ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই কুরআন ও হাদীসের মহাবিদ্বানগণ বলেন, ঐভাবে দুআ করা বিদআত।

মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যাঁর হাদীস জ্ঞান সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে যে, যে-হাদীস তিনি জানেন না সেটা হাদীসই নয় সেই অতুলনীয় প্রতিভা-ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) জামাআতের পর জামাআত সহকারে দুআ করা সম্পর্কে বলেন, নবী (সঃ) এবং তাঁর মোক্তাদীগণ পাঁচঅঙ্ক নামাযের পর দুআ করতেন না। যেমন কিছু লোক ফজর ও আসর বাদ কোরে থাকে! চার মযহাবের কোন ইমাম থেকেও এর প্রমাণ নেই। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে ঐরূপ দুআ নাকি মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজ। একথা ঠিক নয়। কারণ, তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এর বিপরীত কথা রয়েছে। এইরূপ ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলিমগণও ঐভাবে দুআ করাকে অপছন্দ করতেন।

কিন্তু ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবু হানীফার সাথীগণ ফজর ও আসরের বাদ দুআ করা মুস্তাহাব মনে করেন। এইরূপ ইমাম শাফেয়ী



ও অন্যান্যদের সাধীগণের একদল পাঁচঅঙ্ক নামাযের পর দুআ করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। অবশ্য কেউ যদি এইরূপ দুআ ত্যাগ করে তাহলে তাঁরা সবাই সর্বসম্মতভাবে কোন আপত্তি করেন না। যেব্যক্তি আপত্তি করে সে সমস্ত আলেমের ঐক্যমতে ভুল করে (ফাতা-ওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২২ খণ্ড, ৫১২ পৃষ্ঠা)।

নামাযের পর ইমাম ও মোক্তাদী মিলে একসাথে দুআ করা বিদআত। কারণ, নবী (সঃ) এর যুগে এর চলন ছিল না। বরং তখন কেবল নামাযের মধ্যেই দুআ ছিল। কারণ, একজন মুসল্লী নামায পড়া অবস্থায় তার প্রভুর সাথে কানে কানে কথা বলে। অতএব নামাযের মধ্যে কানাকানি করার পর আবার মুনা-জাত বা কানাকানি করা অসঙ্গত। নামাযের পর তো কিছু বিশেষ যিকুর সুন্নত। যা নবী (সঃ) থেকে প্রমানিত। তা হল তাহলীল, তাহমীদ ও তাক্বীর। যেমন নবী (সঃ) নামাযের পর বলতেনঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহল মুলকু অলাহল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর০ আল্লা-হুয়া লা-মা-নিআ' লিমা-আ'তাইতা অলা মু'তিয়া লিমা-মানাত্'তা অলা-ইয়ান্ফায়ু যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদু০

সহী হাদীসে প্রমানিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের পরে (৩৩) বার সুবহা-নাল্লা-হ (৩৩) বার আল্লা-হু আকবার এবং (৩৩) বার আল্ হামদু লিল্লা-হ বলে।-এই হল নিরানব্বই এবং সে একশো পুরো করে এই বলে-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহল মুলকু অলাহল হামদু অহুয়া আলা-কুল্লি শাই-য়িন কাদীর-তার গোনাসমূহ ঝরে যায়। এইরূপ আরো দুআ নবী (সঃ) নামাযের পরে পড়তেন (ফাতা-ওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২২ খণ্ড, ৫২০ পৃষ্ঠা)।

সারকথা ইমামের সালাম ফেরার পর উপরোক্ত কতিপয় দুআ মাসূরা পড়া সুন্নত এবং তা না পড়ে কিংবা তা পড়ার পরও প্রতি অঙ্কে জাম্মাত সহকারে দুআ করা বিদআত। তবে কখনো কখনো বিশেষ কোন কারণে যদি নামাযের পর ইমাম ও মোক্তাদী মিলে দুআ করেন তাহলে তাতে আপত্তি নেই (ঐ ফাতা-ওয়া, ২২ খণ্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা)।

হানাফী আ-লিম আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, সালামের পর মসজিদের ইমামদের দুআ করা এবং মুক্তাদীদের আমীন আমীন বলা, যা আরবে ও আজমে প্রচলিত তা আল্লাহর নবীর অভ্যাস ছিল না (শারহে সিফারুস সাআ-দাহ, ১১২ পৃষ্ঠা, যাহরাতু রিয়্যা-যিল আবরার ১২৯ পৃষ্ঠা)।

অতএব যারা কোরআন ও সহী হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী সেই আহলে হাদীসদের উচিত পাঁচঅঙ্ক জামাআতের পর জামাআত সহকারে দুআ না করা। আর যারা উক্তরূপী দুআয় অভ্যস্ত তারা একেবারে না পারলে ধীরেধীরে এক অঙ্কে, দু অঙ্কে জামাআত সহকারে দুআ ত্যাগ করার অভ্যাস করুন এবং পরিশেষে পাঁচঅঙ্কেই ছেড়ে দিন।

ইমাম সাহেবের চিল্পে দুআ পড়া এবং মোক্তাদীদের চাঁচিয়ে চাঁচিয়ে আমীন বলার ফলে জামাআতে এক দু রাকআত ছেড়ে যাওয়া মসবুক নামাযীদের বাকি নামায পড়তেও বাধা সৃষ্টি হয়। সেজন্য ঐ জামাআত সহকারে দুআকারী ইমাম ও মোক্তাদীগণ গোনাহগার হতে পারেন। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ হাদীস মোতাবেক চলার এবং বাপদাদা ও পূর্বসূরীদের চাল ত্যাগ করার সুমতি দিন-আমিন!

### একই নামায দু বার পড়া

সাহাবী জাবের (রাযিঃ) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) আল্লাহর নাবীর সাথে (এশার) নামায পড়তেন। তারপর তিনি নিজের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের (এশার) নামায পড়াতেন। এটা (অর্থাৎ দ্বিতীয় নামাযটা) তার নফল নামায হোত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৩ পৃষ্ঠা)।

এই রিওয়ায়তটি প্রমান করে যে, এক ব্যক্তি একই নামায এক জায়গায় মোক্তাদী হোয়ে জামাআতে পড়ে অন্য জায়গায় ইমাম হোয়ে জামাআত পড়তে পারে। মুআযের প্রথম নামাযটি ফরয এবং দ্বিতীয়টি নফল হওয়ায় এটাও প্রমানিত হয় যে, ফরয নামাযীরা নফল নামাযীর ইমামতীতে নামায পড়তে পারে।

ইয়াযীদ ইবনে আস্‌ওয়াদ বলেন, একদা হজ্জের সময় আমি নাবী

(সঃ) এর সাথে মসজিদে খায়ফে ফজরের নামায পড়লাম। যখন তিনি নামায শেষ কোরে সালাম ফিরলেন তখন দুজন লোককে সবার পেছনে পেলেন, যারা তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তাই তিনি তাদেরকে ডাকতে বললেন, তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে বাধা দিল কে? তারা বলল, আয় আল্লাহর রসূল! আমরা বাড়ীতে নামায পড়েছিলাম। তিনি বললেন, এরূপ কোরোনা। বরং বাড়ীতে নামায পড়ার পর যখন তোমরা কোন জামাআতের মসজিদে আসবে তখন তাদের সাথে আবার নামায পড়বে। তাহলে এই (২য়) নামাযটা তোমাদের জন্য নফল হোয়ে যাবে (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, ১০৩ পৃষ্ঠা হাদীস নং ১১৫২)।

এই হাদীস ও আরো কতিপয় হাদীস প্রমান করে যে, যদি কেউ বাড়ীতে ফরয নামায পড়ার পর কোন মসজিদে এসে জামাআত পায় তাহলে তাকে জামাআতে शामिल হতে হবে। মসজিদের নামাযটি যদিও তার নফল নামায, তথাপি সে জামাআতের সওয়াব পাবে। তার বাড়ীর নামাযটি ফরযে গন্য হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, যদি কেউ একটি মসজিদে জামাআতে নামায পড়ার পয় কোন দরকারে অন্য মসজিদে গিয়ে জামাআত পায় তাহলে সে কি করবে? এ ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত আছে। ১টি মতে একদল বলেন, ইবনে ওমর বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা একই দিনে একই নামায দুবার পড় না (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, ১০৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি ২য় মসজিদে গিয়ে আর নামায পড়বে না। কারণ, সে তো জামাআতে নামায পড়ে জামাআতের সওয়াব পেয়ে গেছে। এর বিপরীত, যে ব্যক্তি ঘরে একলা নামায পড়ার ফলে জামাআতের সওয়াব পায়নি সে মসজিদে হাযির হোয়ে জামাআতে শরীক হলে জামাআতের সওয়াব পাবে। সেজন্য তাকে জামাআত পড়তে হবে।

অন্যদল বলেন, ২য় জামাআতেও তাকে शामिल হতে হবে। কারণ, ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ বর্ণিত এই হাদীস এবং আরো কতিপয় হাদীস

প্রমান করে যে, মসজিদের জামাআতে শরীক হওয়া উচিত। আমার মতেও শরীক হওয়াটা অতি উত্তম। কারণ, ইমাম মালেক ও নাসায়ী রিওয়াযাতকৃত হাদীসের রাবী বুসর ইবনে মিহজান এবং আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ ইবনে আমের ঘরে নামায পড়ার পর জামাআতে শরীক না হওয়ার কারণে আল্লাহর রসূলের সন্দেহ হয় যে, তারা মুসলমান কিনা (মিশকাত, ১০৩ পৃষ্ঠা)।

সেইরূপ কোন ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়া সত্ত্বেও অন্য মসজিদের জামাআতে শরীক না হোয়ে বসে থাকলে ঐসব মুসল্লীদের মনে অনেক কুখারনা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তাদের কুখারনা দূরীকরণার্থে ২য় মসজিদের জামাআতেও শরীক হওয়া উচিত। তাছাড়া ২য় জামাআত পড়তে মানা তো নেই, বরং পড়লে নেকী ছাড়া গোনাহ নেই।

### আসরের জামাআতের সাথে যোহরের নামায হবে না

কোন কোন আলেম এই ফতওয়া দেন যে, যদি কোন ব্যক্তির কোন কারণে যোহরের নামায কাযা হোয়ে যায় এবং তিনি আসরের সময় মসজিদে নামায পড়তে এসে দেখেন যে, আসরের জামাআত শুরু হচ্ছে তখন তিনি যোহরের নিয়াত কোরে আসরের ঐ জামাআতে শরীক হতে পারবেন এবং তারপর তিনি একা আসরের নামায পড়ে নেবেন।

এর প্রমানে সম্ভবতঃ তারা তিরমিযীর রিওয়াযাতকৃত আবু দারদার এই ফতওয়াটি পেশ করেন যে, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকলো লোকেরা তখন আসরের নামায পড়ছিল। সে ভাবলো যে, তারা মনে হয় যোহর পড়ছে। তাই সে তাদের জামাআতে শরীক হল। অতঃপর আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আসরের জামাআতের সাথে ভুল কোরে যোহরের নামায পড়লে তা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হবে।

এই ফতওয়াটি সম্পর্কে তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মুহাদ্দিস মুবারকপুরী বলেন, এই ফতওয়ার রিওয়াযাত কে বর্ণনা করেছেন, তা আমি অবগত নই এবং এই নামাযটি যে জায়েয সে সম্পর্কে আমি কোন মরফু হাদীসও পাইনি! অতঃপর তিনি বলেছেন, আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসটি প্রমান করে যে, ঐ নামায জায়েয হয়নি (তুহফাতুল

আহুওয়াযী, ১ম খণ্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

আবু হুরাইরার হাদীসে বলা হয়েছে যে, যখন কোন নামাযের তকবীর দেওয়া হয় তখন যার জন্য তকবীর দেওয়া হয় সে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায হবে না (মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং-১০৫৮, (আহমাদ ও তাবারানী)। এখানে তকবীর যেহেতু আসরের নামাযের জন্য দেওয়া হয়েছে সেজন্য আসরের তকবীরের অধীনে যোহরের নামায কি করে হতে পারে? অতএব আসরের জামাআতের সাথে যোহরের নামায যা এক ফরয-নামাযীর সাথে অন্য ফরয নামায হবে না। যারা এরূপ ফতওয়া দেন তা তাদের ব্যক্তিগত ফতওয়া, যা সহী হাদীস সম্মত নয়।

### জামাআত চলাকালিন ফজরের সুন্নত হবে না

হানাফী ফিক্হ বলে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে ইমামের কাছে পৌঁছুলো। অথচ সে ফজরের দু রাকআত সুন্নত পড়েনি। এমতাবস্থায় সে যদি আশংকা করে এক রাকআত ছাড় যাবার এবং দ্বিতীয় রাকআত পাবার তাহলে সে যেন মসজিদের দরজায় দু রাকআত সুন্নত পড়ে। তারপরে সে জামাআতে शामिल হবে (হিদায়াহ ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)।

এই মসলার প্রমাণে তাঁরা বাইহাকী বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেনঃ- বখন কোন নামাযের ইকামত দেওয়া হোয়ে যায় তখন ঐ (ইকামত দেওয়া) ফরয নামায ছাড়া আর কোন নামায হবে না-কেবল ফজরের দু রাকআত সুন্নত ছাড়া।

উক্ত হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম বাইহাকী বলেন, এই হাদীসের শেষ শব্দাবলী-“কেবল ফজরের দু রাকআত ছাড়া”-টুকরাটি ভিত্তিহীন। কারণ, এই হাদীসটির সূত্রের দুজন রাবী-হাজ্জাজ ইবনে নুসাইর এবং আব্বাদ ইবনে কাসীর যরীফ (ইমাম শওকা-নীর আলফাওয়া-য়িদুল মাজমুআহ ফিল আহা-দীসিল মউযুআহ ২৪ পৃষ্ঠা, লাহোর ছাপা)।

হানাফী মুহাদিস আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাতীও তাই বলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাহাতী শরীফ থেকে হানাফীদের প্রমাণে কিছু বিদ্বানের ব্যক্তিগত আমল পেশ কোরে বলেন, এসবই (মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং-১০৫৮ বর্ণিত) সহীহ হাদীসের বিপরীত। (আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ

আ'লা মুঅত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ৮৮ পৃষ্ঠার ৫নং টীকা)।

হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন, উক্ত হাজ্জাজ যরীফ এবং আব্বাদ মাতরুক যা পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম আহমাদ বলেন, আব্বাদ জাল হাদীস তৈরীকারী (তাকরীবুত তাহযীব ৮১ ও ১৮৮ পৃষ্ঠা)। সুতরাং উক্ত হাদীসের শেষ টুকরাটি জাল শব্দ। তাই হাদীসটি দলীলের অযোগ্য।

মুঅত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুহাল্লাতে আছে, যখন কোন নামাযের ইকামত দেওয়া হবে তখন ঐ ফরয ছাড়া আর কোন নামাযই হবে না। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! ফজরের দু রাকআত সুন্নতও না। তিনি বললেন, না, ফজরের দু রাকআত সুন্নতও না (ইবনে আদীর আলকা-মিল, ই'লা-মু আহলিল আসরি-ফী আহকা-মি রাকআ'তাইল ফাজরি ৩৬ পৃষ্ঠা)।

একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন। তখন নামাযের ইকামত দেওয়া হোয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি কিছু লোককে দেখলেন তারা ফজরের দু রাকআত সুন্নত পড়ছে। তখন তিনি বললেন, দুটো নামায একসাথে? এমতাবস্থায় তিনি মানা করলেন ঐ দু রাকআত পড়তে যখন ইকামত দেওয়া হোয়ে যাবে (মুসনাদে বাযযা-র, পূর্বোক্ত ই'লা-ম ৩৩ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস বলেন, একদা আমি নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআয্যিন ইকামত শুরু কোরে দিল। তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে টেনে ধরে বললেন, তুমি কি সকালের নামায চার রাকআত পড়ছো? (আবু দাউদ তায়ালিসী, তুহফাতুল আহ'অযী ১ম খণ্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)।

আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস বলেন, একজন লোক এল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযে ছিলেন। অতঃপর লোকটি লোকেদের পেছনে দু রাকআত নামায পড়ে নাবী (সঃ) এর সাথে शामिल হল। তারপর রসূলুল্লাহ যখন তাঁর নামায শেষ করলেন তখন বললেন, হে অমুক! তুমি কোন নামাযটা ঠিক করলে? যেটা আমাদের সাথে পড়লে, না যেটা তুমি একা পড়লে? (তাহাভী, আতাত'লীকুল মুমাজ্জাদ ৮৮ পৃষ্ঠার ৫নং টীকা)।

সারকথা ফজরের জামাআত চলাকালিন ফজরের সুন্নত হবে না। বরং সুন্নত না পড়ে জামাআতে शामिल হতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাই বলেন (মাবসূত ১ম খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)। অতএব জামাআতের পরই সুন্নত পড়তে হবে (আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর নামাযের গুরুত্ব

কুরআনের সূরা জুমআতে আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ যখন জুমআর নামাযের জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকরের জন্য দৌড়ে এসো এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটা (অর্থাৎ জুমআর নামাযে শরীক হওয়াটা) তোমাদের জন্য খুবই লাভজনক, যদি তোমরা (এর রহস্য) জানতে। এই আয়াত দ্বারা জুমআর নামায ফরয বলে প্রমানিত হয়।

তাই সাহাবী জাবের বলেন, একদা আল্লাহর রসূল এক খোতবায় আমাদের সামনে বললেন, ওগো লোকেরা! তোমরা সবাই জেনে নাও যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমআকে ফরয করেছেন আমার এই দাঁড়বার জায়গাতে, এই মাসের আজকের দিনে (শুধু এই বছরের জন্য নয়, বরং) এই বছর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। অতএব আমার জীবদ্দশায় কিংবা আমার পরেও যে ব্যক্তি একে ছেড়ে দেবে তার নেতা ন্যায়পরায়ণ হোক বা অত্যাচারী, সে যদি এটাকে হান্কা ভেবে কিংবা এর গুরুত্বকে অস্বীকার কোরে ত্যাগ করে তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকামকে ছিন্নভিন্ন করে দিন, তার মনে শান্তি না দিন এবং তার কাজগুলোতে বরকত দান না করুন। ভাল করে শুনে নাও! জুমআ ত্যাগকারী ব্যক্তির নামায ও যাকাত কবুল হয় না। তার হজ্জ ও রোযাও মঞ্জুর হয় না। আরো শোন! আল্লাহ তার কোন নেকীও কবুল করেন না যতক্ষণ না সে তওবা করে। অতঃপর যেব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবাও কবুল করেন (ইবনে মাজাহ ৭৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে তার উপরে জুমআ ফরয। তবে ৫ জন ছাড়া। তারা হল:- (১) রোগী (২) মোসাক্ফের (৩) মেয়েছেলে (৪) ছোট ছেলে (৫) ক্রীতদাস।

অতএব যে ব্যক্তি খেলাধুলায় ও ব্যবসায় মেতে থেকে জুমআর প্রতি উদাসীন থাকে আল্লাহ্‌ও তার পরওয়া করেন না। কারণ, আল্লাহ্‌ কারো মুখাপেক্ষী নন। (তবুও) তিনি প্রশংসার যোগ্য (দারাকুতনী (মিশকাত, ১২১ পৃষ্ঠা)। হাদীসটি যযীফ। কিন্তু এর সমর্থনে সহীহ হাদীস আছে।

নাবী (সঃ) বলেন, যেব্যক্তি অলসতা কোরে তিন জুমআ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌ তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইবনে মাজাহ)। নাবী (সঃ) বলেন, যারা জুমআ পড়তে আসে না আমার ইচ্ছা হয় একজন লোককে নামায পড়াতে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই (মুসলিম)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে জুমআ ত্যাগ করে তার নাম এমন এক কেতাবে মোনাফেক লেখা হয় যে বইয়ের লেখা মুছে দেওয়া যায় না অথবা তা বদলও করা যায় না (মুসনাদে শাফেয়ী, মিশকাত, ১২১ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্‌র রসূল বলেন, যদি কেউ কখনো বিনা ওযরে জুমআ না পড়তে পারে তাহলে সে যেন এক দীনার (আনুমানিক সাড়ে ৪গ্রাম ওজন সোনার মুদ্রা যা তার দাম) সদকা করে দেয়। আর অপারক হলে অন্ততঃ আধ দীনারও যেন সে সদকা করে (আহমাদ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, ১২১ পৃষ্ঠা)।

### সাহাবায়ে কেরামের নিকট জুমআর গুরুত্ব

বিখ্যাত সাহাবী হযরত সাআদ ৭/৮ সাত-আট মাইল দূর থেকে জুমআয় শরীক হতেন এবং কখনো আসতে পারতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে রওয়া-হা দু (২) মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে জুমআ পড়তে আসতেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর অহ্ত নামক জায়গা থেকে তিন (৩) মাইল পথ অতিক্রম কোরে তায়েফে জুমআ পড়তে হাযির হতেন (ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড, ১০২-১০৪ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী আবু হোরাযরা যুল হোলায়ফা থেকে (ছয় (৬) মাইল পথ অতিক্রম কোরে) মদীনায় জুমআ পড়তে আসতেন এবং কিছু সাহাবী আওয়া-লী থেকে (দু (২) মাইল) হেঁটে মদীনায় এসে জুমআ পড়তেন (বুখারী ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)।



হিজরতের সময় জুমআ ফরয হয়। নবী (সঃ) এর হিজরতের কয়েকদিন আগে সাহাবী আস্‌আদ ইবনে যুরারাহ জুমআর নামায পড়িয়েছিলেন। অতঃপর নবী (সঃ) বনু সা-লেমের মসজিদে সর্বপ্রথম জুমআ পড়ান (আবু দাউদ)।

### জুমআ নাম কেন

হাফেয আব্দোবনো হোমায়দ এবং হাফেয আবদুর রাযযাক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সঃ) এর মদীনায় হিজরত করার এবং জুমআর নামাযের হুকুম আসার আগে একবার মদীনাবাসীগণ সমবেত হলে আনসারগণ বলেন, ইহুদীরা প্রতি সপ্তাহে একদিন একত্রিত হয় এবং খৃষ্টানরাও একদিন সমবেত হয়। সুতরাং আমাদেরও উচিত কোন একদিন জমা হোয়ে আল্লাহর যিক্র ও শুকর আদায় করা। অতঃপর এর জন্য আনসাররা ‘আরুবার’ দিনটিকে ধার্য করে এবং আসআদ ইবনে যোরারার বাড়ীতে জমায়েত হয়। তিনি সবাইকে নিয়ে দু রাকআত নামায পড়ান এবং কিছু ওয়ায ও নসীহত করেন। ফলে লোকেদের জমায়েত হবার কারণে ঐ দিনটির নাম ‘জুমআর দিন’ অর্থাৎ জমায়েত হবার দিন নামে অভিহিত হয় (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩য় খণ্ড, ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা)।

হা-ফেয ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন, এই হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু এর রাবীগণ সবাই বিশ্বস্ত (ফতহুল বারী, ২র খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর দিনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর নাবী বলেন, জুমআর দিন সমস্ত দিনের সর্দার ও আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় দিন। আল্লাহর নিকট এর মাহাত্ম্য ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফেতরের চেয়েও বেশী। এর মধ্যে ৫টি বৈশিষ্ট্য আছে:- (১) এইদিনে আল্লাহ তাআলা আদমকে পয়দা করেন (২) এইদিনে তিনি তাঁকে যমীনে নামিয়ে দেন (৩) এইদিনে তিনি তাঁকে মৃত্যু দান করেন (৪) এইদিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সে সময়ে কোন বান্দা যদি আল্লাহর কাছে কোন হালাল জিনিষ চায় তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান

করেন (৫) আর এই দিনেই কিয়ামত হবে। (এই কিয়ামত হবার কারণে) আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতা, আসমান, যমীন, বাতাস, পাহাড় পর্বতসমুদ্র প্রভৃতি জুমআর দিনে তয় খেয়ে থাকে (ইবনে মাজাহ, আহমাদ মিশকাত, ১২০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, ঐ মূল্যবান সময়টি খুবই অল্প (বুখারী, মুসলিম)। আবু মুসা বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, ঐ সময়টি হল ইমামের মেস্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্তের মধ্যেই (মুসলিম)। আল্লাহর রসূল বলেন, জুমআর দিন বা জুমআর রাতে যে মুসলমান ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তাকে কবরের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে নেন (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত, ১১৯ ও ১২১ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, আমরা শেষ যুগের লোক, অথচ কিয়ামতের দিনে সবার চেয়ে আগে থাকবো। কারণ, আমাদের আগে ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ তাআলা জুমআর দিন ফরয করেছিলেন। কিন্তু তারা মতভেদ কোরে শনিবার ও রবিবার দিনটি গ্রহন করায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জুমআর দিনটি দান করেন। ফলে তারা আমাদের পেছনে পড়ে যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা, যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর মাহাত্ম্য ও নামাযীদের দায়িত্ব

আল্লাহর রসূল বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে (সহবাসের কারণে নিজের বিবিকে) গোসল করায় ও নিজে গোসল করে এবং সকাল সকাল মসজিদে পায়ে হেঁটে আসে, কোন কিছু চড়ে নয়। অতঃপর ইমামের কাছে সে বসে ও তার খোতবা শোনে এবং কোন বাজে কথা না বলে তাহলে সে প্রত্যেক পদক্ষেপের বদলে এক বছরের রোযা ও এবাদতের সওয়াব পায় (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ মিশকাত, ১২২ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, জুমআর দিনে ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যায় এবং মসজিদে প্রথম আগমনকারীদের নাম পর পর লিখতে থাকে। অতঃপর ১নং যে ব্যক্তি মসজিদে আসে সে ঐ ব্যক্তির মত যে

ব্যক্তি আল্লাহর রাহে উট সদাকাহ দেয়। তারপর ২নং ব্যক্তি গরু, ৩নং ব্যক্তি দুগ্ধা, ৪নং ব্যক্তি মুরগী এবং ৫নং ব্যক্তি যেন আল্লাহর রাহে ডিম সদাকাহ করে। অতঃপর ইমাম যখন কাতার থেকে বেরিয়ে (মেম্বারে উঠে) যান তখন তারা তাদের খাতাপত্রগুলো গুটিয়ে ফেলে এবং খুতবা শুনতে লাগে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১২২ পৃষ্ঠা)।

ইবনে খুযাইমার বর্ণনায় আছে, অতঃপর ফেরেশতারা একে অপরকে বলতে থাকে, অমুককে কে রুকে রাখলো? তখন ফেরেশতা বলে, আল্লাহ গো! যদি সে পথভোলা হয় তাহলে তাকে পথ দেখিয়ে দাও। আর যদি সে রোগী হয় তাহলে তার রোগ ভাল কোরে দাও এবং যদি সে অভাবী হয় তাহলে তাকে অভাবমুক্ত করো (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, বাইহাকী, কানযুল ওম্মাল ৭ম খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমাদের কেউ নিশ্চয়ই তার ভাইকে জুমআর দিনে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে বসবে না। বরং সে বলবে ফারাগত হোয়ে বসো, কিংবা একটু জায়গা কোরে দাও (মুসলিম)। নাফের বর্ণনায় আছে, নাফে'কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই নিষেধ শুধু জুমআর দিনের জন্য কি? তিনি বললেন, জুমআ ও অন্যান্য সব দিনেরই জন্যে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠা)।

তিনি (তিনি সঃ) বলেন, তোমরা খুতবায় (জলদি) হাযির হও এবং ইমামের কাছাকাছি রও। কারণ, যে ব্যক্তি সর্বদা পেছনে থাকতে চায় সে যদি জান্নাতে যায় তাহলে সে সবার শেষে জান্নাতে যাবে (আবু দাউদ)। আল্লাহর রসূল জুমআর দিন সম্পর্কে বলেন, 'ওগো মুসলমানের দল! এটা এমন দিন, যাকে আল্লাহ ঈদ বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা (ঐ দিনে) গোসল করো এবং যার কাছে খুশবু থাকে সে যেন খুশবু মাখে আর মেসওয়াক কোরতেও যেন ভুলো না।' (মুঅত্তা মালিক, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১২৩ পৃষ্ঠা)।

কেউ যদি খুশবু না পায় তাহলে সে যেন পানি দিয়েই গোসল কোরে তার শরীরের দুর্গন্ধ দূর করে। আল্লাহর রসূল বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দৈনিক কাজকামের দুটি কাপড় ছাড়াও জুমআর দিনের জন্যও দুটি বিশেষ কাপড় তৈরী করে তাতে আপত্তি নেই' (ইবনে মাজাহ,

মিশকাত ১২২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং জুমআর জন্য খাস কাপড় রাখা উচিত।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নাবী (সঃ) এর জন্য একটি জুব্বা খাস ছিল, যা তিনি দুই ঈদে এবং জুমআর দিনে পরতেন (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)।

জুমআর দিনে গোসল করা, পাকসাফ হওয়া, নাভীর নীচের লোম কাটা, ধোওয়া কাপড় পরা ও খুশবু মাখা সুন্নত (বাইহাকী ৩য় খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা)।

আবদুর রহমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যেব্যক্তি জুমআর দিনে নখ কাটে আল্লাহ তাআলা তার নখের অসুখ দূর করে দেন এবং তাতে আরোগ্য ঢুকিয়ে দেন। তাই আতা বলেন, আমি ইবনে হানফিয়াহকে প্রত্যেক জুমআর দিনে নখ কাটতে দেখেছি। ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, জুমআর দিনে প্রত্যেক ব্যক্তির নখ কাটা উচিত (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা জুমআর দিনে আমার উপর খুব বেশী কোরে দরুদ পড়। কারণ, এটা হাজিরার দিন। এদিনে ফেরেশ্তারা হাযির হয়। আর যখনই কেউ আমার ওপরে দরুদ পাঠ করে তখন তার পড়া শেষ হবার সাথেই তা আমার নিকটে পেশ করা হয়। রাবী বলছেন, আমি বললাম, আপনার মরণের পরেও কি? তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা নবীদের লাশগুলোকে যমীনের জন্য খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন’ (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর-১৩৬৬)।

সাহল ইবনে সা'দ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে জুমআর পরে খাওয়া দাওয়া করতাম এবং শয়ন করতাম (মুসলিম, বলুগুল মারাম, ৩২ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর সময় ও আযান

সাহাবী আনাস বলেন, নাবী (সঃ) সূর্য (মাথার ওপর থেকে) ঢলে যাবার পর জুমআ পড়তেন (বুখারী, মিশকাত, ১২৩ পৃষ্ঠা)।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং খলীফা আবু

বাকর ও ওমরের যুগে জুমআর দিনে ইমাম যখন মেস্বারে বসতেন তখন একটিই আযান ছিল। অতঃপর খলিফা উসমানের খেলাফতী যুগে যখন মদীনার লোকসংখ্যা বেড়ে যায় তখন তিনি (মদীনা থেকে আধ মাইল দূরে) যাওরা বাজারে ৩য় আযানটি বাড়িয়ে দেন (বুখারী, মিশকাত, ১২৩ পৃষ্ঠা, কিতা-বুল উম্ম, ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা)।

এই তৃতীয় আযানটিকে বর্তমানে প্রথম আযান বলা হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও দুই এবং কোথাও এক আযান চলে আসছে। ৩য় খলীফা উসমানের আগে খুতবার আযানটি রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ১ম খলীফা আবু বাকর ও ২য় খলীফা উমার-দের সামনাসামনি ৪/৫গজ দূরে নয়, বরং মসজিদের দরজার উপর দেওয়া হোত (আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)। তাই এই একটি আযান দেওয়া উত্তম এবং প্রয়োজনবোধে ২য় আযান দেওয়া জায়েয।

উসমানী আযান সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম ও প্রতিভাশালী মুহাদ্দিস এবং মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মোবারকপুরী বলেনঃ- উসমান (রযিঃ) যেমন মদীনাতে আর একটি আযান বাড়াবার প্রয়োজন মনে করায় একটি আযান বাড়িয়েছিলেন তেমনি আজকের যুগেও যদি কোন শহরে উসমানী আযানের প্রয়োজন বোধ হয় তাহলে তারা তা দিতে পারে, তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে হাঁ, ঐ আযানটি (অর্থাৎ প্রথম আযানটি) উসমানী যুগের মত ইমাম বের হবার আগে মসজিদের বাইরে কোন ঘরের ছাদে অথবা মিনারের মত কোন উঁচু জায়গাতে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। খুতবার আযানটি মেস্বারের কাছাকাছি ইমামের কাছে দাঁড়িয়ে (একামত দেওয়ার মত কোরে) দেওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। (মিরআতুল মাফাতীহ, ২য় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)। যেমন কোন মযহাবী ভায়েরা দিয়ে থাকেন।

উক্ত শর্ত মেনে কোন আহলে হাদীস মসজিদে যদি জুমআর আযান দুটো দেওয়া হয় তাহলে কারো মাথা গরম করা উচিত নয়। যেমন দুই বাংলায় কখনো কখনো কোথাও কোথাও তা হোয়ে থাকে।

**হানাফী মতে জুমআর খুতবার আযান কোথায় হবে?**

মাওলানা আহমাদ রিয়া খান রেলীর অনুসারী রেলী হানাফীদের মতে জুমআর দ্বিতীয় আযান তথা খুতবার আযানটি ইমামের সামনে হবে। কিন্তু মসজিদের ভেতরে মিস্বারের কাছে নয়। কারণ, মসজিদের ভেতরে আযান দেওয়াকে ফুকাহায়ে কিরাম মকরুহ বা আপত্তিকর বলেছেন। (কা-নুনে শরীআত ১১৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু দেওবন্দী হানাফীরা বলেন, এই আযান খতীবের সামনে প্রথম কাতরে কিংবা নামাযীদের কম ও বেশী সংখ্যা অনুসারে যেখানে হলে সবাই আওয়ায শুনতে পাবেন সেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে মসজিদের ভেতরেই দিতে হবে। এটাই চলে আসা রীতি (ফাতা-ওরা মাহমুদিয়াহ্ ২য় খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, মুকাম্মাল ও মুদাল্লাল মাসা-য়েলে নামাযে জুমআহ ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে বিখ্যাত দেওবন্দী হানাফী শায়খুল হাদীস আল্লামা আন'অর শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, চার মযহাবের মতে এই আযানটা মসজিদের ভেতরে হবার ব্যাপারে কোন দলীলই আমি পেলাম না, কেবল তাছাড়া, যা হিদাযার লেখক বলেছেন। তা হল এই যে, পরম্পরাভাবে ঐ রীতি চলে আসছে। তারপর তাঁর পরবর্তীগণ ঐ কথাটাই বর্ণনা কোরে আসছেন। এদ্বারা আমি বুঝেছি যে, হিদায়াওয়ালা ব্যক্তিগত ঐ উক্তিটি ছাড়া তাদের কাছে আর কোন দলীলই নেই। তাই তাঁরা 'তাওয়া-রুস' বা পরম্পরাগত রীতি গ্রহণ নিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন (ফাইয়ুল বারী ২য় খণ্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)।

আর এক হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাভী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসের শব্দ 'বাইনা য়াদাইহি' এর অর্থ ইমামের সামনে মসজিদের ভেতরে কিংবা ওর বাইরে দুটোই হয়। দ্বিতীয়টাই (অর্থাৎ মসজিদের বাইরেটাই) সুন্নত সম্মত। যেমন সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত সা-যিব ইবনে ইয়াযীদ এর এক বর্ণনায়-আলা-বা-বিল মাসজিদ-মাসজিদের দরজার উপরে শব্দ আছে (উমদাতুর রিআ-য়াহ্ হা-শিয়া শারহে অকা-য়াহ্ ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)।

### খুতবার সময় খতীবের কর্তব্য

আল্লাহর রসূল জুমআর দিন মেস্বারে চড়ে লোকেদের দিকে মুখ কোরে

সালাম করতেন (ইবনে মাজাহ, তাবারানী)। তারপরে তিনি বসতেন (আবু দাউদ), এবং আযানের পর উঠে লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে (আবু দাউদ)। যুদ্ধক্ষেত্রে তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর মত তিনি দাঁড়াতে (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজা, ৭৯ পৃষ্ঠা)। তারপর আল্লাহর তারীফ করতেন, তারপর সূরা কা-ফ পড়তেন। এরপর তিনি কিছু নসীহত করতেন ও তারপরে বসতেন। অতঃপর পুনরায় উঠতেন ও (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন (মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর ৪৪২)।

খোতবা দেওয়ার সময় তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে উঠত। তাঁর স্বর উচ্চ হোত ও তাঁর রাগভাব খুব বেড়ে যেত। মনে হোত তিনি যেন কোন সৈন্যবাহিনীকে সকাল ও সন্ধ্যায় হামলার ভয় দেখাচ্ছেন। (কিন্তু এত উত্তেজিত হলেও তিনি কখনো হাত-পা ছুড়তেন না এবং লম্বা লম্বা করতেন না। খুব বেশী হলে তিনি কেবল শাহাদত বা তজ্জনী আঙুল দিয়ে এশারা করতেন (মুসলিম, মিশকাত ১২৩ পৃষ্ঠা)।

নাবী সাহেবের খুতবা মাঝামাঝি হোত এবং নামাযও মাঝামাঝি হোত (ঐ)। অর্থাৎ খুব লম্বা হোতনা এবং অতি ছোটও হোতনা। তবে লোকেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো তাঁর খুতবা লম্বাও হোত। আর শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী খুতবাটা সচরাচর অন্য খুতবার চেয়ে লম্বা হোত (যা-দুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)।

আমর ইবনে হুরাইস বলেন, নাবী (সঃ) জুমআর দিনে যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর মাথায় কাল পাগড়ী থাকতো, যার দুটো কিনারা তাঁর দুই কাঁধে ঝুলতো (মুসলিম, মিশকাত, ১২৩, ১২৪ পৃষ্ঠা)।

একটি যরীফ হাদীসে আছে যে, পাগড়ী পরা অবস্থায় নামায পড়া বিনা পাগড়ীতে পড়ার তুলনায় ৭০ গুণ সওয়াব বেশী (মিরকাত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)। মুদখাল গ্রন্থপ্রণেতার কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, নাবী (সঃ) এর পাগড়ী (৭) সাত গজহাত ছিল (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)।

ইবনে ওমর বলেন, নাবী (সঃ) দুই খুতবার মাঝখানে বসার সময় কোন কথা বলতেন না (আবু দাউদ, মিশকাত, ১২৪ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী বলেন, আমার ওস্তাদ আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী তিরমিযীর ভাষ্যে বলেছেন যে, দুই খুতবার মাঝখানে কতক্ষণ বসা হবে সে সম্পর্কে আমি কোন হাদীস দেখিনি। তবে ইবনুততীন ইবনুল কাসেমের নাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ঐ বসাটা দুই সেজদার মাঝখানের বসার সময়ের মত হবে এবং রাফেয়ী বলেন, সূরা ইখলাস পড়ার সময় মত বসতে হবে।

এরপর আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, ঐ বসাতে বসে বসে কোন খাস দোআ বা খাস যিক্র অথবা কোন কিরাআত কিংবা কোন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সূরা পড়ার প্রমাণ কোন হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। আর এ ব্যাপারে মিশকাতের হানাফী ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী আল্লামা তীবীর ভাষ্যের নাম দিয়ে ইবনে হিব্বানের রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ‘ঐ বসাতে আল্লাহর রসূল কুরআন পড়তেন। তবে উত্তম হল সূরা ইখলাস পড়া’। এ কথার কোন প্রমাণ আমি পাইনি (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা মোহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) বলেন, প্রথম খুতবার শেষে বসবার সময় একধাপ নেমে বসা ও দ্বিতীয় খুতবা দেবার জন্য দাঁড়াবার সময় আবার এক ধাপ ওঠা বিদআত (রদে মোহতার, ৮৬০ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর নাবী বলেন, কোন কোন বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে নিশ্চয়ই জাদু রয়েছে (সুতরাং ঐসব যাদুকরী বক্তাদের মন্ত্রমুগ্ধ বক্তৃতার ফলে যাতে শ্রোতাদের কাজের ক্ষতি না হয়) সেজন্য (ঐরূপ) ব্যক্তির খোতবা ছোট হওয়া ও নামায লম্বা হওয়া তার বিচক্ষণতা ও অন্তর্বুদ্ধির পরিচয় (মুসলিম, মিশকাত, ১২৩ পৃষ্ঠা)।

খোতবা দেওয়া অবস্থায় কখনো নাবী (সঃ) কোন কারণে মেম্বার থেকে নেমে আসতেন, আবার কখনো চড়তেন। তিনি কখনো কাউকে ডাকতেন এবং বলতেন, ওহে অমুক এসো, ওহে অমুক নামায পড়ো। কখনো অবস্থা বুঝে তিনি লোকদেরকে কোন কাজের হুকুমও দিতেন। তাঁর মেম্বারের সিঁড়ি ৩টি ছিল (যাদুল মাআ’দ ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)।



## সুম্নতী খুতবার শব্দাবলী

আল্লাহর রসূল যখনই জুমআ ও ঈদ বা যেকোন সময় খুতবা দিতেন তখন নীচের শব্দগুলো প্রথমে বলতেন। তারপরে পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু বক্তব্য পেশ করতেন। ঐ শব্দগুলো মুসলিম, দারিমী তিরমিযী, নাসায়ী ও বাইহাকীর আল্‌আস্মা অস্‌সিফা-ত প্রভৃতিতে কিছু কমবেশী কোরে বর্ণিত হয়েছে। খুতবার ঐ শব্দগুলো শুনে সাহাবী যিমাৎ ইবনে সা'লাবাহ মুগ্ধ হোয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। সব রিওয়াযাতগুলোকে এক জায়গায় করলে শব্দগুলো এইরূপ হয়।

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ☆

উচ্চারণ:- আল্‌হামদু লিল্লা-হি নাহ্‌মাদূহ্ অনাস্‌তায়ী'নুহ্ অনাস্‌তাগফিরূহ্ অনু'মিনু বিহী অনাতাঅক্কালু আলাইহিঃ অনাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা অমিন সাইয়িআ-তি আ'মা-লিনাঃ মাঁই ইয়াহ্‌দিহিল্লাহ্ ফলা-মুযিল্লালাহ্ঃ অমাঁই মুযলিল্‌হ্ ফলা হা-দিয়া লাহুঃ অনাশহাদু আল্‌ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহূ লা শারীকা লাহুঃ অনাশহাদু আম্মা মুহাম্মাদান আব্দুহু অরসূলহুঃ

আম্মা-বাদঃ ফইম্মা খাইরাল হাদীসি কিতা-বুল্লাহঃ অখাইরাল হাদয়ি

হাদ্যু মুহাম্মাদিন সল্লাল্লা-হু তাআ'লা আলায়হি অ-আ-লিহী অসাল্লাম০  
 অশাররাল উমূরি মুহাদাসা-তুহা০ অকুল্লা মুহাদাসাতিম বিদ্আহ০ অকুল্লা  
 বিদ্আতিন যলা-লাহ০ অকুল্লা যলা-লাতিন ফিন না-র০

তরজমাঃ- সবরকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। তাই আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। তাঁরই কাছে মদত চাচ্ছি। এবং তাঁর কাছে গোনার মাফ চাচ্ছি। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি এবং তাঁরই উপরে ভরসা করি। আর আমাদের মনের সবরকম দুষ্টিমি ও আমাদের কাজের সবরকম নোংরামি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। কারণ, যাকে আল্লাহ সুপথ দেখান তাকে কেউই পথ ভোলাতে পারেনা। এবং যাকে তিনি পথ ভুলিয়ে দেন তাকে কেউই সুপথ দেখাতে পারেনা। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (উক্ত গুণসম্পন্ন) আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কেউ শরীকও নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর দাস এবং তাঁর প্রেরিত দূত বা রসূল।

অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই, সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ (সঃ) এর রীতিনীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ (শারীআত বহির্ভূত) নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। এরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই (মনগড়া) বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রান্তি ও সুপথ থেকে বিচ্যুতি। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই পরিনতি হবে জাহান্নামের আগুনে অবস্থিতি।

নোটঃ- এই খুতবার শব্দ 'অকুল্লা যলা-লাতিন ফিন নার' বাক্যটি নাসায়ী এবং সহীহ ইবনে খুযাইমাতে আছে।

### সুম্নতী খুতবার অন্যান্য বিবরণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখনই খুতবা দিতেন তখনই (আলহামদু লিল্লাহ প্রভৃতি) আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশক শব্দ দিয়ে শুরু করতেন এবং সেইসাথে কালেমায়ে শাহাদতও পড়তেন। তিনি (সঃ) বলেন, যে খোতবাতে শাহাদত থাকে না তা খোঁড়া হাতের মত। তিনি খুতবা দেবার সময় আজকালের বক্তাদের মত কোন বিশেষ লেবাস অথবা আলখিল্লা পরতেন না (যা-দুল

মাআ-দ ৪৮ পৃষ্ঠা)।

অনেক ফকীহ বলেন, তিনি (সঃ) নাকি ইস্তিস্কার (পানি চাওয়ার) খুতবা আসতগফিরুল্লাহ দিয়ে এবং ঈদের খুতবা আল্লাহ আকবার বলে শুরু করতেন। এর প্রতিবাদে হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, ফকীহদের ঐ দাবীর প্রমাণে তাদের কাছে কোন হাদীস নেই। পক্ষান্তরে হাদীস ওদের উল্টো বলে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) সব খোতবাই আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু হোত এবং তাঁর খুতবাহ শেষ হোত ইস্তিগফার যা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দিয়ে (ঐ ৪৭ পৃষ্ঠা)।

বায়হাকীর দালায়িলুন নবুওঁতে একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, আমি তোমার উন্মত্তের জন্য কোন খোতবাই জায়েয করিনি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি আমার বান্দা এবং আমার প্রেরিত দূত তথা রসূল (ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)।

হামদ ও সানার পর তিনি (সঃ) কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে লোকদেরকে নসীহত করতেন (আবু দাউদ, মুসলিম, বুলুগুল মারা-ম, ৩৩ পৃষ্ঠা)।

এই সময় তিনি কি কি আয়াত পড়তেন তার কিছু কিছু প্রমাণ বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন উম্মে হিশাম বলেন, আমি রসূলুল্লাহরই (সঃ) পবিত্র মুখ থেকে (শুনে শুনে) সূরায়ে কা-ফ মুখস্থ করেছি। যা তিনি প্রতি জুমআয় মেম্বারের উপরে পড়তেন (মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩২ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, জুমআর খোতবাতে সূরা 'কা-ফ' পড়া সুনতে রসূল। (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)। ইমাম দারিমী বলেন, প্রথম খোতবায় গোটা সূরা কা-ফ পড়া মুস্তাহাব (রওয়াতুত-ত-লেবীন, ২য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)।

তাবারানী আওসাতে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মেম্বারের উপরে সূরায়ে কুল ইয়া আইয়্যোহাল কা-ফেরুন এবং কুল হুঅল্লা-হ আহাদ পড়তেন। এই হাদীসটির একজন রাবী অজ্ঞাত, বাকীরা বিশ্বস্ত। তাবারানীতে জাবেরের রিওয়ায়াতে আছে, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা যুমারের শেষ পড়ে খুতবা দেন। তখন তাঁর মেম্বারটি দুবার নড়ে ওঠে। এর রাবীদের মধ্যে দুজন

যয়ীফ আছে (ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নবভী বলেন, তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, খুতবার সময় লাঠিটা যেন বাম হাতে ধরা হয়। দুই খুতবার মাঝখানে বসাটা সূরা ইখলাস পড়ার মত বসা মুস্তাহাব (রওয়াতুত ত-লেবীন ২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)। তাহযীবে বলা হয়েছে যে, খুতবার শেষ বাক্য-‘আস্তাগফিরুল্লা-হা লী অলাকুম’ হওয়া যাঞ্জনীয় (ঐ, ৩৩ পৃষ্ঠা)।

### দ্বিতীয় খুতবার আরাবী শব্দাবলী

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَكَأَنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَسَائِرِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْتَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ أَيْدِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاتِّبَاعِ سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ أَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاجْعَلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَادْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَغْرُ وَاجِلٌ وَآتَمُّ وَاهَمُّ وَأكْبَرُ

তরজমা:- ‘আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি। নিশ্চয় আল্লাহ নাবীর উপরে শান্তি বর্ষণ করেন, এবং তাঁর ফিরিশতাগণ শান্তি

বর্ষনের দুআ করেন। (তাই) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপরে দরুদ ও সালাম পাঠ করো।

আয় আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর করুণা বর্ষণ করো। যেমন তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর করুণা বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মহান। আয় আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর বরকত (সমৃদ্ধি) নাযিল করো। যেমন তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মহান।

আর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন সমস্ত নাবী ও রসূলদের উপর এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের উপর আর খুলাফায়ে রাশিদীন ও মুহাজিরদের উপর এবং আনসার ও তা-বিয়ীদের উপর। তাঁদের সবার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি ঝরে পড়ুক।

আল্লাহ গো! আমাকে ও আমার মা-বাপকে এবং সমস্ত ঈমানদার পুরুষ ও নারীকে আর মুসলিম নর ও নারীকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি শ্রবনকারী, দুআসমূহ কবুলকারী। হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের সহযোগিতা করো এবং রসূলদের নেতার সুন্নতসমূহ অনুসরণ করার শক্তি দাও। আয় আল্লাহ! যারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর দ্বীনের সাহায্য করে তুমি তাদের সাহায্য করো এবং আমাদেরকে তাঁদের মধ্যে शामिल করো। আর যারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু-হ আল্লাইহি অসাল্লাম এর দ্বীনের সঙ্গ ত্যাগ করে তুমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করো আর আমাদেরকে তাদের মধ্যে शामिल করো না।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তোমাদের উপরে দয়া করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার ও সদ্ব্যবহার করার এবং আত্মীয়দেরকে দান করার নির্দেশ দেন। আর অশ্লীল আপত্তিকর বিষয় এবং অত্যাচার করা থেকে মানা করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহন করতে পার। তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে মনে রাখবেন। আর তোমরা তাঁকে ডাকো তাহলে তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। আর আল্লাহ তাআলার স্মরণই

সবচেয়ে উচ্চ ও সবচেয়ে সম্মানীয় এবং সবচেয়ে মহান আর পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে মহৎ কাজ।

## জুমআর খুতবাহ পরিস্থিতি অনুযায়ী হওয়া উচিত

হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম প্রতি সময়ে শ্রোতাদের চাহিদা অনুসারে খুতবাহ দিতেন (যা-দুল মাআ-দ ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)।

যেমন শাবান মাসের শেষ দিনে তিনি রমায়ানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং সাহারী ও ইফতারের ফযীলত এবং তারাবীহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন (বাইহাকীর শুআবুল ইমান, মিশকাত, ১৭৩ পৃষ্ঠা)।

রমায়ানের ১ম জুমআয় রোযার মসলা, ২য় জুমআয় আল কুরআনের মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন সূরার ফযীলত, ৩য় জুমআয় যাকাত ও লাইলাতুল কাদরের আলোচনা এবং শেষ জুমআয় ফিত্রা ও ঈদুল ফিতরের মসলাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা উচিত।

যুলকা'দার শেষ জুমআয় যুলহিজ্জার ১ম দশকের কর্তব্য এবং যুলহিজ্জার ১ম ও ২য় জুমআয় কুরবানীর মসলাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা উচিত।

মুহাররম চাঁদের ১ম ও ২য় জুমআয় আশুরার ফযীলত এবং শোক ও মাতমের দোষত্রুটি সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করা উচিত।

সফর মাসের শেষ জুমআয় আখেরী চাহার শাম্বার বিদআত এবং রবীউল আউঅলের ৪টি জুমআতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর নাবী হবার আগের নয়, বরং নাবী হবার পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হওয়া উচিত।

রজবের শেষ জুমআতে শবে মিরাজের বিভিন্ন বিদআত এবং মিরাজের প্রকৃত তথ্য পেশ করা উচিত। তেমনি শা'বানের ১ম ও ২য় জুমআতে শাবান মাসে নবীজীর নফল রোযা রাখার বিবরণ এবং শবেবরাতের হালওয়া রুটি ও চেরাগ বাতির শিরকরূপী বিভিন্ন বিদআত সম্পর্কে জনগনকে ওয়াকিবহাল করা উচিত। বছরের অন্যান্য জুমআগুলোতে দেশের ও বিশ্বের পরিস্থিতি অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মুসলমানদের

করলীয় কি তা বলা উচিত। সেইসঙ্গে বিভিন্ন মসলাও শোনানো উচিত। কুরআনের ধারাবাহিক তফসীর এবং নবীদের ঘটনাবলীও বর্ণনা করা যেতে পারে।

## জুমআর আগে সুন্নত ও নফল

ওমর (রাযিঃ) বলেন, যোহরের ৪ রাকআত ফরয নামাযের জায়গায় জুমআর নামায ২ রাকআত করতঃ বাকি দুই রাকআতের পরিবর্তে খুতবার ব্যবস্থা করা হয়েছে (মোহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং প্রত্যেক মুসল্লীর কর্তব্য খুতবার আযানের আগে এসে সম্পূর্ণ খুতবা শোনা।

খোতবা শুরু হবার আগে কোন সুন্নত আছে কিনা? এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, নাবী (সঃ) জুমআর আগে আযানের পরে কোন নামাযই পড়তেন না। এ ব্যাপারে তাঁর থেকে কেউ কোন হাদীস পেশ করেননি। কারণ, নাবী (সঃ) এর যুগে তিনি মেম্বারে বসবার আগে কোন আযানই দেওয়া হোত না। নাবী (সঃ) এর মেম্বারে বসার পর বিলাল আযান দিতেন। তারপর নাবী (সঃ) দুটি খুতবা দিতেন। তারপর বিলাল ইকামত দিতেন। অতঃপর তিনি (সঃ) লোকদের নিয়ে নামায পড়তেন। সুতরাং এটা সম্ভব ছিল না যে, আযানের পর তিনি কিংবা অন্য সেইসব মুসলমান নামায পড়তে পারেন যারা তাঁর সাথে নামায পড়তেন।

তাঁর থেকে কেউ এই বর্ণনা দিতে পারেনি যে, তিনি জুমআর দিনে ঘর থেকে বের হবার আগে নিজ ঘরে নামায পড়েছেন। জুমআর আগে কোন সময় নির্দিষ্ট কোরেও তিনি (সঃ) কোন নির্দিষ্ট নামাযের কথা বলেননি।

তবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ বার (১২) রাকআত, কেউ (১০) দশ, কেউ (৮) আট, কেউ তার চেয়ে কম রাকআত নামায পড়তেন। এইজন্য অধিকাংশ ইমামের মতে জুমআর আগে কোন নির্দিষ্ট সুন্নত নেই (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২১৫, ২১৬ পৃষ্ঠা)।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, জুমআর আগে চার রাকআত সুন্নত পড়বে। এটা সুন্নতে মুআক্কাদাহ (বেহেশতী যেওর ১১ খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী বলেন, জুমআর আগে কোন খাস সুন্নতে মুআক্কাদাহ নেই, যেমন জুমআর পরে তা আছে। সেজন্য কোন মুসল্লী যখন জুমআর দিনে মসজিদে ঢুকবে সে যত ইচ্ছা নফল পড়তে পারে। ইবনে মাজাতে ইবনে আব্বাসের একটি রিওয়াযাতে আছে যে, আল্লাহর নাবী জুমআর আগে এক সালামে চার রাকআত পড়তেন এই রিওয়াযাতের সনদে ৪ জন রাবী দোষযুক্ত আছেন। সুতরাং হাদীসটি ঠিক নয়। আওনুল মাবুদে এই রূপ আছে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)।

তছাড়া হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী ও আল্লামা যায়লায়ী হানাফীও বলেন, জুমআর আগে সুন্নত সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসগুলোই যরীফ। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাদীস ইবনে যুবারর বর্ণিত ইবনে হিব্বানের রিওয়াযাতকৃত হাদীস, যদ্বারা জুমআর আগে মাত্র দু রাকআত সুন্নত প্রমানিত হয় (ঐ, ২৯২ পৃষ্ঠা)। যোহরের সুন্নতের উপর কিয়াস করে জুমআর আগে মাত্র ৪ রাকআত সুন্নত পড়ার প্রমানে কোন হাদীস নেই।

### জুমআর খুতবাহ চলাকালিন নামায

সাহাবী জা-বির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, একদা জুমআর দিনে সুলাইক গাত্ফা-নী এলেন। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বসে পড়ায় তিনি তাকে বললেন, হে সুলাইক! তুমি দাঁড়াও, অতঃপর দু রাকআত নামায পড়ো এবং তা সংক্ষেপে পড়ো। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের যে কেউ জুমআর দিনে আসবে। এমতাবস্থায় খতীব খুতবা দিচ্ছেন। তাহলে সে যেন দু রাকআত পড়ে এবং সংক্ষেপে পড়ে (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটি কিছু কম শব্দে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও আছে (বুখারী ১২৭ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৬৭ পৃষ্ঠা, নাসায়ী, ১ম খণ্ড, ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা, ইবনে মা-জাহ ৭৯ পৃষ্ঠা)।

এক বর্ণনায় আছে, এইরূপ নির্দেশ তিনি (সঃ) তাঁকে তিন বার দেন তিন জুমআতে (মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে হিব্বান, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা)।



আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁকে বলেন, এর মত আর কোনো না (ইবনে হিব্বান, নাসবুর রা-য়াহ, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)।

একদা বিখ্যাত সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী জুমআর দিনে এলেন। এমতাবস্থায় মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। অতঃপর (মারওয়ানের) চৌকিদার এল তাঁকে বসিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তিনি অমান্য করে নামায শেষ করলেন। তারপর যখন তিনি সালাম ফিরলেন তখন অন্যান্যরা তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। ওরা তো আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করেছিল। তাই তিনি বললেন, আমি তো কিছুতেই ঐ দু রাকআত ছাড়তাম না। কারণ, ওটাকে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম থেকে দেখেছি। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন যে, এক ব্যক্তি জুমআর দিনে এলোমেলো অবস্থায় এল। এমতাবস্থায় নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে হুকুম দিলেন। ফলে তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন। অথচ নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম খুতবা দিতেই থাকলেন (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী আলা ইবনে খা-লিদ কুরাশী বলেন, একদা আমি বিখ্যাত তাবেরী হাসান বাসরীকে দেখলাম। তিনি জুমআর দিনে মসজিদে ঢুকলেন। তখন ইমাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তথাপি তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন, তারপর বসে গেলেন (ঐ-পৃষ্ঠা-ঐ)।

ইবনে আবী উমার বলেন, (বিখ্যাত তাব-তাবিযী) ইবনে উয়াইনাহ দু রাকআত পড়তেন যখন তিনি (মসজিদে) আসতেন। এমতাবস্থায় ইমাম খুতবারত থাকতেন। আর তিনি অন্যকেও ওর হুকুম দিতেন (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)।

সাম্মাক ইবনে সালমাহ বলেন, একদা এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন সেই নামায সম্পর্কে যখন ইমাম খুতবাহ রত থাকে। উত্তরে তিনি বললেন, লোকেরা যদি এটা পড়ে তাহলে ভাল কাজ হবে (মুহাল্লা ইবনে হাযম ৫ম খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এটাকে গ্রহন করেছেন ইমাম শা-ফিযী ও

ইমাম আহমাদ প্রমুখ। কিন্তু সুফয়্যান সাওরী ও কুফাওয়ালাদের মতে, খুতবা চলাকালিন কেউ এলে বসে পড়বে। সে নামায পড়বে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটা অধিক সঠিক। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফার মতে নামায না পড়ে বসে পড়তে হবে। দলীল হিসেবে ইবনে উমারের বর্ণনা পেশ করা হয় যে, তিনি একবার নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শোনে, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে ঢুকবে। তখন ইমাম মেসারের উপরে থাকলে কোন নামায ও কথাবার্তা বলা চলবে না যতক্ষণ না ইমাম খুতবা শেষ করেন (তাবারানী কাবীর)।

কিন্তু এই হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। কারণ, আল্লামা হাইসামী বলেন, এর একজন রা-বী ইবনে নাহীক পরিত্যক্ত রাবী। যাঁকে একদল বিদ্বান যরীফ বলেছেন (মাজমাউয যাওরা-য়িদ ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, ফাতহুল মুলহিম শারহে মুসলিম ২য় খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আবু যুরআহ ও ইবনে আবী হাতিম বলেন, এরূপ যরীফ হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধী (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)।

হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যায়লায়ী বলেন, উক্ত হাদীসটি মরফু নয়। ইমাম বাইহাকী বলেন, এটি রসূলুল্লাহর উক্তি হওয়াটা অতি সন্দেহমূলক। এটা তো (তাবিয়ী) ইমাম যুহরীর উক্তি (নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনুল হুমামও বলেন, এই হাদীসটি রসূলুল্লাহর নয়। বরং এটা ইমাম যুহরীর উক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ, যাকে ইমাম মা-লিক মুত্তায়ায় বর্ণনা করেছেন (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী বলেন, কোন একজন সাহাবী থেকেও একথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত নেই যে, খুতবা চলাকালিন নতুন আগত ব্যক্তির দু রাকআত পড়া মানা। আমার শাইখ আবুল ফাযল (রহঃ) তিরমিযীর ভাষ্যে বলেন, যারা সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খুতবা চলাকালিন নামায ও কথা বলা মানা সেটা তাদের জন্য, যারা মসজিদের ভেতরে থাকবে। যারা নতুন আসবে তাদের জন্য তাহিয়্যাতুল

মসজিদ পড়তে মানা নেই (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা)।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, খুতবা চলাকালিন এলে দু রাকআত নামায সংক্ষেপে পড়ে নেবে, যাতে সাধ্যমত হাদীসের উপরে আমল হয় এবং খুতবার আদবও পালিত হয়। এই মসআলাতে তুমি তোমার দেশবাসীর কথায় থোকা খেয়ো না। কারণ, (খুতবা চলাকালিন দু রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ার) হাদীসটি বিশুদ্ধ। যার অনুসরণ অপরিহার্য। (হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২য় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা)।

### খুতবার সময় মুসল্লীদের কর্তব্য

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, জুমআর দিনে ইমামের খুতবা দেবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে সে সেই গাধার মত যে গাধা কেতাবের মোট বয়ে বেড়ায়। যে ব্যক্তি তার পাশের ব্যক্তিকে বলে, ‘ এই চুপ কর’-তারও জুমআ হয় না (আহমাদ)। আর যে ব্যক্তি কাঁকর সরায় সে বেহুদা কাজ করে (মুসলিম)। নাবী (সঃ) জুমআর দিনে খুতবার সময় দুই হাঁটু তুলে তাতে দুই হাত বেড় দিয়ে বসতে মানা করেছেন। (কারণ এভাবে বসলে ঘুম আসতে পারে)। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কারো জুমআর দিনে ঝিমুনি আসে তাহলে সে যেন তার জায়গা থেকে একটু সরে বসে (তিরমিযী, আবু দাউদ)। ইবনে মসউদ বলেন, আল্লাহর নাবী যখন মেস্বারে বসে যেতেন তখন আমরা তাঁর দিকে মুখ কোরে বসতাম (তিরমিযী, মিশকাত, ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা)।

উট যেমন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে সেইরূপ মুসল্লীদেরকে মসজিদে একটি জায়গা খাস কোরে বেছে নিতে আল্লাহর রসূল মানা করেছেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত, ৮৪ পৃষ্ঠা)। আল্লাহর রসূল বলেন, যে ব্যক্তি (দেবী কোরে এসে খুতবার সময় এসে) মুসল্লীদের কাঁধ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যায় সে জাহান্নামের দিকে পুল তৈরী করে নেয় (তিরমিযী, মিশকাত, ১২২ পৃষ্ঠা)।

তাই জুমআর মুসল্লী যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসে পড়বে লোকের কাঁধ ডিঙিয়ে সে আগে বাড়বে না। যদি আগে বসতে চায় তাহলে

তার উচিত সকাল সকাল আসা। তেমনি যে আগে আসবে তার উচিত সামনের লাইনে খালী জায়গা রেখে পেছনের লাইনে না বসা।

### জুমআর জামাআ'ত ও কিরাআত, তারপরে সুন্নত

জুমআর খুতবা শেষ করার পর আল্লাহর রসূল ২ রাকআত নামায পড়াতেন। তিনি এই নামায ও ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা সাব্বিহিসমা রবিবকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা হাল আতাকা হাদীসুল গা-শিয়াহ পড়তেন। আর কোন দিন যদি ঈদ ও জুমআ একই দিনে পড়তো তাহলেও তিনি ঐ দুই নামাযে উক্ত সূরা দুটিই পড়তেন (মুসলিম)। আবু হুরায়রা বলেন, আমি জুমআর দিনে আল্লাহর রসূলকে প্রথম রাকআতে সূরা জুমআহ ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকুন পড়তে শুনেছি (মুসলিম, মিশকাত, ৮০ পৃষ্ঠা)।

### জামাআত পুরো না পেলে

আল্লাহর রসূল বলেন, যে মুসল্লী (অনিবার্য কারণবশতঃ দেরী হওয়ার ফলে জুমআর) নামাযে ইমামের সাথে এক রাকআতও পায় সে জুমআ পেয়ে যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১২৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ভারতের বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, আমার মত এই যে, যদি কোন ব্যক্তি শেষ রাকআতের তাশাহুদও পায় তাহলে সে ইমামের সালাম ফেরার পর বাকিটা অর্থাৎ দু রাকআত নামায পড়ে নেবে। সে যোহরের চার রাকআত পড়বে না। কারণ, মাসবুকের নামাযের ব্যাপারে নাবী (সঃ) বলেছেন যে, ইমামের সাথে যতটা পাও ততটা পড়ে নাও এবং বাকিটা ইমামের সালাম ফেরার পর পূরণ করে নাও। ইমাম ইবনে হায্মও তাই বলেন (মোহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, মিরআত ২য় খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা)।

হানাফীরাও এই মতের সমর্থক। কিন্তু শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীরা বলেন যে, যদি কেউ শেষ রাকআতের সেজদা বা তাশাহুদ পায় তাহলে সে জুমআ পায় না। তাকে যোহরের চার রাকআত পড়তে হবে। একথার প্রমানে আমি কোন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস পাইনি। তবে শাফেয়ী ও অন্যান্যরা তাদের মতের প্রমানে দারাকুতনী রিওয়াযাতকৃত আবু হুরাইরার

হাদীসটি পেশ করে, যদ্বারা বোঝা যায় যে, যদি কেউ শেষ রাকআতের সেজদা বা তাশাহুদ পায় তাহলে সে জুমআ পায় না। তাকে যোহরের চার রাকআত পড়তে হবে একথার প্রমানে আমি কোন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস পাইনি। তবে শাফেয়ী ও অন্যান্যরা তাদের মতের প্রমানে দারাকুতনী রিওয়ায়াতকৃত আবু হুরাইরার হাদীসটি পেশ করে, যদ্বারা বোঝা যায় যে, কেউ যদি শেষ রাকআতের রুকুও না পায় বরং সেজদা বা তাশাহুদ পায় তাহলে তাকে যোহরের চার রাকআত পড়তে হবে। তার জওয়াব হল এই যে, ঐ হাদীসটি যয়ীফ বা দুর্বল। আর যয়ীফ হাদীস দলীলের যোগ্য হতে পারে না (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা)।

দারাকুতনীর রেওয়ায়াত সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী তালখীসুল হাবীরের ১২৭ পৃষ্ঠায় বলেন, এই হাদীসটির অনেকগুলো সনদ আছে, কিন্তু সব কটি সনদই আপত্তিকর। ইবনে আবী হাতেম ইলাল গ্রন্থে তাঁর পিতা থেকে বলেন যে, এই হাদীসটির কোন ভিত্তিই নেই (ঐ, ৩১৭ পৃষ্ঠা)।

মওলানা আলী আহমাদ বেনারসী তদীয় গ্রন্থ কিতাবুস সলাতের ৭৮ পৃষ্ঠায় দারাকুতনীর এই যয়ীফ হাদীসটি মিশকাতে বরাত দিয়ে দলীল স্বরূপ পেশ করেছেন। সুতরাং কেউ যেন তদ্বারা বিভ্রান্ত না হন।

### জুমআর পরে সুন্নত

ইবনে ওমর বলেন, আল্লাহর নাবী জুমআর পর বাড়ী ফিরে গিয়ে মাত্র ২ রাকআত নামায পড়তেন (বুখারী, মুসলিম)। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেন, তোমাদের যে কেউ জুমআর পরে নামায পড়বে সে যেন চার রাকআত পড়ে (মুসলিম, মিশকাত, ১০৪ পৃষ্ঠা)।

বাংলাদেশের মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সাহেব লিখেছেন হয় রাকআতও পড়া চলে (সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা)। এই ৬ রাকআত সম্পর্কে তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, কোন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস দ্বারা ৬ রাকআতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, আমার মতে ৪ রাকআতটাই অতি উত্তম। কারণ, নাবী (সঃ) আমাদেরকে এটার হুকুম

দিয়েছেন (মিরআত, ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর পর অযীফা

যে ব্যক্তি জুমআর পরে সূরায়ে ফা-তিহা এবং কুল হু অল্লা-হু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন না-স্ পড়বে সে ঐ জুমআ এবং ওর পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময়ে হেফাযতে থাকবে (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, কানযুল ওম্মা-ল, ৭ম খণ্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর দিনে ঈদ ও বৃষ্টি হলে

একদা জুমআর দিনে ঈদ পড়ায় আল্লাহর রসূল বললেন, আজকের দিনে তোমাদের দুটি ঈদ একত্রিত হয়েছে। অতএব যার ইচ্ছা সে জুমআ না পড়ে যোহর পড়তে পারে। তবে আমি কিন্তু দুটোকেই জমা করি অর্থাৎ (আমি ঈদও পড়ি এবং জুমআও পড়ি)। আবু দাউদ, ১৬৯ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, জুমআর দিনে জুমআ ও ঈদ দুইই পড়া নবীজীর আদর্শ।

আবুল মালীহ তাঁর বাপ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা হনাইনের যুদ্ধের সময় এবং আর একবার হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় জুমআর দিনে খুব বৃষ্টি হওয়ায় নাবী (সঃ) সবাইকে তাদের তাঁবুতে নামায পড়ার হুকুম দেন (আবু দাউদ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দুটি প্রমান করে যে, জুমআর দিনে খুব বৃষ্টি হলে জুমআ পড়া ফরয নয়। অতএব যদি কেউ জুমআ পড়তে পারে তো খুব ভাল। অন্যথায় ঘরে যোহর পড়লে জুমআ ত্যাগ করার গোনাহ হবে না।

### গ্রামে জুমআ পড়তে হবে কিনা?

সাহাবী ইবনে আব্বাস বলেন, মদীনার মসজিদে নববীতে জুমআ হবার পর ইসলামে সর্বপ্রথম যে জুমআ হয় তা বাহরাইনের একটি গ্রাম ‘জুআসা’ নামক গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় (বুখারী, ১২২ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ)।

কাব ইবনে মালেক বলেন, আল্লাহ আসআদ ইবনে যুরারার ওপর রহম করুন। কারণ, তিনি (রসূলুল্লাহর হিজরতের আগে মদীনার এক মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম) নাকীউল খাযেমাতে সর্বপ্রথম আমাদের জুমআ

পড়ার ব্যবস্থা করেন (আবু দাউদ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা শারফুল হক বিহারী বলেন, এই হাদীস দুটি এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, গ্রামে জুমআ জায়েয। কারণ, সাহাবীরা নিশ্চয়ই নাবী (সঃ) এর হুকুমে অহী নাযেল বন্ধ না হওয়ার যুগে গ্রামে জুমআ পড়েছিলেন। যদি এই কাজটা নাজায়েয হোত তাহলে এ সম্পর্কে অহী নিশ্চয়ই নাযেল হোত।

ইবনে আবী শায়বার একটি রিওয়াযাতে আছে যে, একদা খলীফা ওমর খলীফা থাকা কালে বাহরাইন বাসীদের নিকট এই ফরমান পাঠান যে, তোমরা (শহর বা গ্রাম) যেখানেই থাকো না কেন জুমআ কায়েম করো। বাইহাকীতেও একটি হাদীস রয়েছে যে, অলীদ ইবনে মুসলিম বলেন, একদা আমি লাইস ইবনে সা'দ সাহাবীকে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, প্রত্যেক শহর ও গ্রামে জামাআত আছে এবং তাদের সবাইকে জুমআ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কারণ, মিশরের শহর ও গ্রামবাসীরা দুই খলীফা ওমর ও উসমানের খেলাফৎ কালে তাঁদের হুকুমে জুমআ পড়তো। সেসময় সেখানে বহু সাহাবীও মওজুদ ছিলেন (যাঁরা জুমআ পড়তেন এবং কোন আপত্তিও করতেন না)।

মুসান্নাফ আব্দুর রায়যাকে সহীহ সনদে ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী পানির ধারে ধারে বসবসকারীদের জুমআ পড়তে দেখতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করতেন না।

এসব বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গ্রামে জুমআর ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিলনা। যদি থাকতো তাহলে মরফু হাদীসের প্রতি রজু করা অপরিহার্য হতো (আওনুল মা'বুদ, প্রথম খন্ড, ৪১৩-৪১৪ পৃষ্ঠা)।

যারা বলেন, গ্রামে জুমআ জায়েয নয় তাদের প্রমাণ হল হযরত আলী বর্ণিত একটি হাদীস। যাতে আছে যে, বড় শহর ছাড়া গ্রামে জুমআ এবং দুই ঈদের নামায ও তাশরীক নেই। এই হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী হানাকী বলেন যে, হাদীসটি মরফু নয়, বরং মওকুফ। (নাসবুর রা-য়াহ, ২য় খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং এটা দলীলের যোগ্য হতে পারে না। কারণ, এর মেকাবিলায় ওমর ও উসমান এবং ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রাহ বর্ণিত এমন সব হাদীস রয়েছে যেগুলো কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের মোতাবেক হওয়ায় ঐ হাদীসের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য। ফলে ওটা পরিত্যাজ্য। তাই তালীকুল মুগনীতে বলা হয়েছে যে, শংরে যেমন জুমআ ফরয তেমনি গ্রামেও জুমআ ফরয (আওনুল মা'বুদ ১ম খন্ড ৪১৫ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক গ্রামে জুমআ অ-জেব ও অপরিহার্য, যদিও ঐ গ্রামে ৪ জনের বেশি লোক না থাকে (দারাকুতনী, বায়হাকী, কানযুল ওমমা-ল, ৭ম খন্ড, ৫১২ পৃষ্ঠা)।

যারা বাইহাকীর ও দারাকুতনীর রিওয়ায়াত অনুসারে বলেন যে, ৪০ জনের কমে জুমআ হয়না — ঐ হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ। কারণ ইমাম বাইহাকী নিজেই বলেন, হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। সুতরাং ৪০ এর কমেও জুমআ হবে। ইমাম আবু হানীফার ওস্তাদ ইবরাহীম নাখরী বলেন, যেখানে কমপক্ষে ২ জন লোক থাকবে সেখানে জুমআ জায়েয (সূরী মাই যুরা, ২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)।

জুমআর শর্ত সম্পর্কে ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, ফিক্‌হওলারা জুমআর নামাযের জন্য যেসব শর্ত লাগান — যেমন ৪০ জন লোক হওয়া, বড় শহর হওয়া, বাদশাহ কিংবা তার নায়েবের উপস্থিত থাকা ইত্যাদি — এসব কথাগুলো বেদলীল ও ভিত্তিহীন শর্ত। এসবের প্রমাণে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো রায় ও কিয়াসের (মনগড়া) কথা (বাযলুল মান্ফআহ, ৩৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা যায়লায়ী হানাফী বর্ণনা করেন যে, আল্লামা আবদুল হক তদীয় গ্রন্থ 'আহকা-মে' বলেন, জুমআর ব্যাপারে লোকের সংখ্যা সংক্রান্ত কোন হাদীসই ঠিক নয় (নাসবুর রা-য়াহ, ২য় খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ুতীও বলেন, জুমআর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকসংক্রান্ত কোন হাদীসই সঠিক নয়। ইমাম তাবারী, দাউদ যাহেরী, নাখরী ও ইবনে হাযমের মতও তাই (ফিক্‌হস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)।



## গ্রামে জুমআহ পড়ার হানাফী ফতওয়া

বড় গ্রামে জুমআ সিদ্ধ এবং ছোট গ্রামে সিদ্ধ নয়। (ফাতা-ওয়া দা-রুল উলুম ৫ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা, রদুল মুহতার ১ম খণ্ড ৭৫৪ পৃষ্ঠার বরাতে)। যে গ্রামের লোকসংখ্যা ছোট ও বড়, নারী ও পুরুষ, হিন্দু ও মুসলিম মিলিয়ে তিন হাজার, তা বড় গ্রাম। ফকীহগণ বড়গ্রামে জুমআ ফরয লিখেছেন (প্রথমোক্ত ১৬৯ পৃষ্ঠা, শেষোক্ত ৭৪৮ পৃষ্ঠা, বা-বুল জুমআহ)।

দেওবন্দী মুখপত্র আলকা-সিমে লেখা হয়েছে : রব্বাহ একটি ছোট গ্রাম ছিল। যা মদীনা মুনাওঁরার তিন মাইল দূরে ছিল। পুরষের বসবাস সেখানে প্রায় বারজন ছিল। সেখানে কোন বাড়ীই ইঁট ও মাটির ছিল না। একটি বুপড়ি ছিল। রব্বাহর শাসক খলীফা উসমানের এক হাবশী গোলাম মাজা-শি' ছিলেন। দুনিয়াদারী কাজকামের মত জুমআও তাঁর দায়িত্বে ছিল। উক্ত রব্বাহতে জুমআর নামায হোত। স্বয়ং আবু যর (রাযিঃ) ওখানে নামায পড়তেন (শারহে মুনয়্যাতুল মুসল্লী ৫১২ পৃষ্ঠার বরাতে আলকাসিম পত্রিকা মুহাররম সফর ১৩৩৭ হিজরী সংখ্যার ২৭ পৃষ্ঠা)।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম (রহঃ) বলেন, কেউ যদি গ্রামে জুমআ কায়েম করে তাহলে তার সাথে হাতাহাতি করো না। কারণ, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্তটা খেয়ালী ধারণাপ্রসূত (ফুয়ুযে কা-সিমিয়াহ ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)।

অতএব হানাফী ফতওয়ায় ছোট গ্রামেও জুমআ কায়েম করা উচিত।

## জুমআর খুতবায় মাতৃভাষায় ওয়ায

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল জুমআর খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করতেন, কুরআন পড়তেন এবং কিছু ওয়ায-নসীহতও করতেন। নাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : ‘আমি যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি তখন তাঁকে তাঁর স্বজাতির মাতৃভাষাতেই পাঠিয়েছি’ (সূরা ইবরাহীম ৪র্থ আয়াত)।

রসূলুল্লাহর মাতৃভাষা যেহেতু আরাবী ছিল এবং সাহাবীদেরও মাতৃভাষা আরাবী ছিল, তাই তিনি আরাবীতেই তাঁদেরকে নসীহত করতেন। এখন

নাবীজীর নায়েব হোয়ে যাঁরা জুমআর খুতবা দেবেন তাদেরকেও উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস অনুসারে তাঁদের শ্রোতাদের মাতৃভাষায় খুতবা দেওয়াটা শরীয়াত সম্মত এবং যুক্তিসংগত। তা না হলে খতীব সাহেব যদি আরাবীতে ভোতা পাখীর মত খুতবা পড়েন এবং তাঁর শ্রোতারা যদি আরাবী না জানেন তাহলে তারা খতীবের কোন নসীহত বুঝতে না পারার ফলে মাহির মত বসে না শুনে গাল হাঁ কোরে ঘুমাতে যাধ্য হবেন। যেমন বিভিন্ন মসজিদে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণেই ইমাম শাফেয়ী বলেন, প্রত্যেক খতীবকে জুমআর সময় তাঁর মাতৃভাষায় ওয়ায করা অঙ্গের তথা অবশ্য কর্তব্য (তানকীহুর রুওয়া-ত, ১ম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা তাহতা-ভী হানাফী বলেন, আরাবী ভাষা জানলেও জুমআর খুতবা ফারসী ভাষায়ও চলবে (হা-শিয়া তাহতাভী আলা-মারা-কিল ফা লা-হ ২৭৭পৃষ্ঠা)। তাই ভারতের হানাফীদের মধ্যে লেখনী চালনার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় আলেম আল্লামা আবদুল হাই লখনবী বলেন, শ্রোতাদেরকে তাদের মাতৃ ভাষায় খুতবা বুঝিয়ে দেওয়া জায়েয (মজমুআহ ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)।

হানাফী ফিক্হ-গ্রন্থ নিহায়া, মুজতাবা, ফাতা-ওয়া সিরাজিয়াহ, মূহীত প্রভৃতিতে আছে যে, ইমাম আবু হানীফার মতে ফারসী ভাষাতে জুমআর খুতবা দেওয়া জায়েয। শামীতে আছে, আরাবীতে খুতবা দেওয়া শর্ত নয়। হিদায়ায় আছে, প্রত্যেক ভাষায় খুতবার নসীহত চলতে পারে (কিতাবুল জুমআ, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফার মতে নামাযের কিরাআত ফারসী ভাষাতেও চলবে। যদিও ঐ ব্যক্তি ভাল আরাবী জানে (হিদা-য়াহ ১ম খণ্ড)। তাহলে জুমআর খুতবা আরাবী ছাড়া অন্য ভাষায় চলবে না কেন ?

### ভিড়ের মধ্যে জুমআর নামায

ওমর ফারুক (রাযিঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অতি ভিড়ের কারণে ইমামের সাথে জুমআর নামাযে সেজদা দিতে না পারে তাহলে সে তার ভায়ের পিঠের উপরে সেজদা দেবে (আবু দাউদ তায়ালিসী, সুনান সাযীদ

ইবনে মানসূর, আল আসয়িলাহ অল আজ্জিভাতুল ফিক্‌হিয়াহ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)। কিংবা তার পায়ের উপরে সে সিজদা দেবে। অধিকাংশ আলেমের মত তাই (রওয়াতুত ত-লিবীন, ২য় খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)।

আর যদি সে কোন উপায়ে রুকু ও সেজদা না দিতে পারে তাহলে সে ইশারায় রুকু ও সেজদা দিলে যথেষ্ট হবে। যদি ইশারায়ও তা সম্ভব না হয় তাহলে সে দাঁড়িয়ে থাকবে ঐভাবে। অতঃপর ভিড় কমলে সে দু রাকআত নামায পড়বে। বানু উমাইয়ারা খন জুমআর নামায সূর্যাস্তের নিকট পর্যন্ত দেৱী করতেন তখন সালাফগণ (পূর্ববর্তী আলেমগণ) মাসজিদের মধ্যে নামায পড়ে নিতেন (মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)।

### জুমআতে মেয়েদের শরীক হবার প্রমাণ

আবদুল্লাহ ইবনে মা'দানের দাদী বর্ণনা করে যে, আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন, তোমরা যখন জুমআর দিনে ইমামের সাথে নামায পড়বে তখন তাঁর নামায মোতাবেক (দু রাকআত) পড়বে এবং যখন তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়বে তখন চার রাকআত পড়বে। হাসান বাসরী বলেন, মেয়েরা নাবী (সঃ) এর সাথে জুমআয় শরীক হতেন এবং তাদেরকে বলা হোত যে, তোমরা বিনা আবরণে বের হয়ো না। আর তোমাদের তরফ থেকে কোনরূপ খুশবু যেন না পাওয়া যায়। উক্ত হাসান থেকেই বর্ণিত মুহাজেরদের মহিলাগণ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে জুমআর নামায পড়তেন (মুসাল্লাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

### ইহতিয়াতী বা আ-খিরী যোহর বিদ্আত

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম থেকে জুম পড়ার পরও যোহরের নিয়াতে চার রাকআত নামায পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেমন আল্লামা হালাবী হানাফী বলেন : যোহরের নিয়াতে ইহতিয়াতী যোহর পড়ার কোন প্রমাণ ফিক্‌হের বর্ণনাসমূহে পাওয়া যায় না (হানাফী ফিক্‌হ-গ্রন্থ হালাবী কাবীর ৫১২ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদী (রহঃ) লিখেছেন : বাহরুর রা-য়িক ২৯১ পৃষ্ঠায় আছে, আমাদের যুগের মূর্খদের মধ্যে ইহতিয়াতী যোহর

প্রচলিত আছে। তাদের মূর্খতাই জুমআর পরে যোহরের নিয়াতে চার রাকআত নামায সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই চার রাকআত পড়ার কোন বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অথবা তাঁর দুই ছাত্র (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুমালাহ) থেকে পাওয়া যায় না (যাহরাতু রিয়াযিল আবরা-র ২৩০ পৃষ্ঠা)।

হানাফী ফিক্‌হের অন্য এক বিখ্যাত গ্রন্থে আছে : ইহুতিয়াতী বা আখিরী যোহর পড়া উচিত নয় (দুররে মোখতার, ১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

মওলানা সাইয়েদ আলীমুল্লাহ চিশতী হানাফী বলেন, ইহুতিয়াতী যোহর পড়নেওয়ালা হয় মোতায়েলী নতুবা রাফেযী (ইফতা-উশ্ শামআহ ২২৬ পৃষ্ঠা, কিতা-বুল জুমআহ, ৬৬ পৃষ্ঠা)।

### জুমআ 'তুল বিদা' বিদআত

হানাফী মযহাবের অনুসারী অধিকাংশ লোককে দেখা যায় যে, তাঁরা রমায়ান মাসের শেষ জুমআকে 'জুমআতুল বিদা' নামে আখ্যায়িত করেন এবং নিজের এলাকার জুমআ মাসজিদে জুমআ না পড়ে শহরের কোন নামকরা জামে মাসজিদে জুমআতুল বিদা পড়ার জন্য সফর করেন এবং তাতে নেকী বেশী পাবেন বলে ধারণা পোষণ করেন।

এই ধারণার প্রতিবাদে বিখ্যাত দেওবন্দী আলিম আল্লামা মুহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন : কেউ যদি অমুক জায়গার মাসজিদে রমায়ানের শেষ জুমআ পড়লে সওয়াব বেশী হবে ভেবে সফর করে তাহলে তা তিনটি মাসজিদে:- (১) জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস, (২) মক্কার মাসজিদুল হারাম এবং (৩) মদীনার মাসজিদে নববী, ছাড়া এরূপ করা জায়েয নয়। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বিশেষ কোরে জুমআতুল বিদা পড়ার জন্য দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় যাওয়া। এতে বহু ফসাদ (ধর্মের বিকৃতি) রয়েছে। ১ম) জুমআতুল বিদাকে এত গুরুত্ব দেওয়া যা অন্যান্য জুমআতে না মনে করা হয়। এটা একটি মনগড়া ধারণা এবং বিদআত। ২য়) এই কাজের জন্য সফর করা অপচয়। ৩য় — এটা হাদীসের খেলাফ কাজ। ৪র্থ) এই সফর দ্বারা কখনো রোযারও ক্ষতি হতে পারে (জাওয়া-হিরুল ফিক্‌হ ৪র্থ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)।

## মসজিদে মিম্বার তৈরীকরণ

হিজরতের পর মদীনা শরীফে জুমআ ফরয হয়। ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন জুমআর খুতবা দিতেন তখন কোন এক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে খুতবা দিতেন (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)। অতঃপর তিনি (সঃ) সাহল নান্নী এক আনসারীকে হুকুম দিয়ে তাঁর ছুতারমিস্ত্রি গোলাম দ্বারা কাঠের একটি মিম্বার তৈরী করান। তারপর থেকে ঐ মিম্বারে চড়ে তিনি খুতবা দিতে থাকেন (বুখারী, ১২৫ পৃষ্ঠা)।

নবীজীর ঐ মিম্বারে তিনটি সিঁড়ি ছিল এবং ঐ মিম্বার কাঠেরই ছিল। অতঃপর আমির মুআবিয়ার খিলাফতী যুগে মদীনার গভর্নর মারওয়ান ঐ মিম্বারের নীচের দিকে আরো ৬টি ধাপ বাড়িয়ে দিয়ে এক নতুন বিষয়ের জন্ম দেন (মিরআ-তুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)।

তারপর ঐ কাঠের মিম্বারটি নষ্ট হতে থাকে এবং বিভিন্ন বাদশাহ তা তৈরি করে দিতে থাকেন। পরিশেষে তুরস্কের সুলতান মুরাদ খান ৯৯৮ হিজরতে কাঠের নয়, বরং সাদা মর্বেল পাথরের একটি পাকা মিম্বার তৈরি করে দেন (রা-হাতুল কুলুব ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত কাঠের মিম্বার এবং তিন ধাপওলা মিম্বার সুন্নতসম্মত। কোন মসজিদ নতুন তৈরি হলে তাতে কাঠের মিম্বার রাখাই উত্তম। কোথাও যদি পাকা মিম্বার তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে তাকে ভেঙে কাঠের মিম্বার তৈরি করতে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা হারাম কাজ। ইমাম যেখানে নামায পড়ে সেই জায়গার ডানদিকে মিম্বার রাখা সম্মত। যদি মিম্বার না থাকে তাহলে একটু উঁচু জায়গায় খুতবা দেওয়া উচিত (রওযাতুত ত-লেবীন ২য় খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বারের তৃতীয় ধাপে, খলিফা আবু বাকর দ্বিতীয় ধাপে ও খলীফা ওমর প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে জুমআর খুতবা দিতেন। কিন্তু খলিফা উসমান তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন (বালা-গুলা মুবীন ১৩১ পৃষ্ঠা)। তাই ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপের যে কোন ধাপে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া চলবে।

## মাসজিদে মিহরাব কি বিদ্‌আত ?

বাংলাদেশের মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সাহেব কোন হাদীসের হাওয়ালা না দিয়ে কতিপয় তফসীর ও কতিপয় ওলামার মতামতের উপর ভিত্তি কোরে লিখেছেন : মাসজিদে মিহরাব না দেওয়া সুন্নতের অনুকূল (সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)।

কতিপয় প্রকৃত তত্ত্ব অনভিজ্ঞ আহলে হাদীস ও হানাফী ওলামা বলেন যো, মাসজিদে মিহরাব তৈরি করা বিদ্‌আত। তাদের ঐ মতামত কiyাসী এযং হাদীসের বিপরীত। কারণ, আলকুরআনের সূরা আ-লি ইমরানের ৩৭ ও ৩৯ আয়াতে এবং সূরা মারয়্যামের ১১ আয়াত ও সূরা স্ব-দের ২১ আয়াতে মিহরাব শব্দের উল্লেখ আছে।

কুরআন ছাড়া হাদীসেও মিহরাবের উল্লেখ আছে : যেমন সাহাবী আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম তাঁর মিহরাবে দাঁড়ায় এবং নামাযের কাতারগুলোও সারিবদ্ধ হয়ে যায় তখন আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকে। অতঃপর ওর প্রথমটা ইমামের অংশ হয়। তারপর তাঁর ডানে যাঁরা তাঁদের। তারপর তাঁর বাঁমে যাঁরা তাঁদের। তারপর ঐ রহমত গোটা জামাআতে ছড়িয়ে পড়ে (মুস্নাদে আহমাদ)।

অন্য বর্ণনায় সাহাবী ওয়া-য়িল ইবনে হুজর বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ-হ- সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট হাযির হলাম। তিনি মাসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মিহরাবে ঢুকলেন। তারপর তকবীর দিয়ে দুই হাত তুললেন। তারপর ডান হাতটা বাম হাতের উপর নিজ বুকে রাখলেন (বাইহাকী ২য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)।

বাইহাকীতে বর্ণিত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : ‘তোমরা এইসব মায্বাহ অর্থাৎ মিহরাব থেকে বিরত থাকো।’

শেষোক্ত হাদীসে বর্ণিত মিহরাব শব্দটি ইসলামী মাসজিদের মিহরাব নয়, বরং তা হল খৃষ্টানদের গির্জার মিহরাব। যার অপর নাম মায্বাহ। যেমন মুসন্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে মূসা জুহানীর বর্ণনায় আছে :

‘আমার উম্মত ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা তাদের মাসজিদে খৃষ্টানদের মাযবাহের মত মাযবাহ তৈরী না করবে।’

খৃষ্টানদের ঐ মাযবাহ কি? তার ব্যাখ্যায় আরবী অভিধানবিদ এক খৃষ্টান পাদ্রী লুইস য়াসূয়ী বলেন : গির্জার মাযবাহ হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে পবিত্র ঐশী পাদ্রীগণ দাঁড়ান এবং মানতের পশুগুলো যবহ করেন ( আলমুনজিদ ২৩১ পৃষ্ঠা )। অতএব খৃষ্টানদের মিহরাব দ্বারা কেউ যেন ধোকা না খায়। তাই মুসলমানদের মাসজিদে মিহরাব মোটেই বিদ্‌আত নয়।

আবু দাউদের ভাষ্যকর আল্লামা শারফুল হক বিহারী বলেন : কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী (সঃ) এর যুগে মিহরাব ছিল। যেমন সুনানে কুবরা বাইহাকীতে অয়েল ইবনে হজর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে হাযির হলাম তখন তিনি উঠে মাসজিদের দিকে গেলেন এবং মিহরাবে ঢুকলেন তারপর দুই হাত উঠিয়ে তকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। ইমাম তাবারানীর মোজাম্মে সাগীরেও এইরূপ রিওয়াযাত আছে।

হানাফীদের নেতৃস্থানীয় শায়খ আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, ‘রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগ থেকে মাসজিদসমূহে মিহরাব বানানো হয়েছে।’ মিহরাবে নামায পড়া মকরুহ নয়। যারা এ কথা বলে যে, মিহরাবে নামায পড়া আপত্তিকর তারা এর প্রমাণে দলীল পেশ করুন। অন্যথায় কারো কিয়াসী কিয়াসী মনগড়া কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা যাবে না (আওনুল মাবুদ ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)।

### সফর বা ক্বাস্বরের নামায

ক্বাস্বরের অর্থ কম করা। কোন সৎ উদ্দেশ্যে সফরে বের হলে সফরকালীন অবস্থায় কতিপয় নামায কম করে পড়া যায় বলে তাকে ক্বাস্বরের নামায বলা হয়। মা আয়িশা বলেন প্রথমে নামায ২ রাকআত ফরয করা হয়েছিল। তারপর আল্লাহর রসূল যখন হিজরত করেন তখন তা ৪ রাকআত ফরয করা হয় এবং সফরের নামায আগের মত ২ রাকআতই বহাল রাখা হয় (বুখারী, মুসলিম মিশকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)।

মুসনাদে আহমাদে এ কথাগুলো বাড়তি আছে যে, কিন্তু মগরেব নয়। কারণ, এটা দিনের বিতর এবং ফজরও নয়। কারণ, এতে কিরাআত লম্বা হয় (বুলুগুল মারাম, ৩০ পৃষ্ঠা)।

ইবনে ওমর বলেন, আল্লাহর রসূল সফরের নামায ২ রাকআত নির্ধারিত করেছেন। এই দু রাকআতেই (৪ রাকআতের) পুরো সওয়াব আছে, কম নয়। আর সফরে বিতরের নামায পড়া নবীজীর সুন্নত (ইবনে মাজা, মিশকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে সফরে যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায ৪ রাকআতের জায়গায় ২ রাকআত পড়তে হবে এবং মগরেব ৩ রাকআত থাকবে আর ফজর ২ রাকআত পড়তে হবে।

### কতদূর গেলে কাসর চলে

সাহাবী আনাস থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল একদা (মক্কা সফরকালে) মদীনায় যোহরের নামায ৪ রাকআত পড়েন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

যুলহলাইফা একটি জায়গার নাম, বা মদীনা থেকে মক্কা আসার পথে তিন মাইল দূরে পড়ে এবং বর্তমানে তা আলী কুয়ার নিকট অবস্থিত (মিরআত ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)।

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, দূরবর্তী সফরকালে ঘর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে গেলে কাসর চলবে। সাহাবী আনাস বলেন, আল্লাহর রসূল যখন তিন মাইল বা তিন ফারসাখ (নয় মাইল) সফর করতেন তখন ২ রাকআত নামায পড়তেন (মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩১ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটিও প্রমাণ করে যে, মাত্র তিন মাইল সফর করার পর কাসর চলবে। তবে এই হাদীসটির বর্ণনায় বর্ণনাকারীর যেহেতু সন্দেহ রয়েছে যে, নাবীজীর সফরের ঐ দূরত্বটা তিন মাইল, না তিন ফারসাখ (নয় মাইল)। সে জন্য সন্দেহ দূরীকরণের জন্য খুব বেশী হলে নয় মাইল সফর করার পর কাসর চলবে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রহমানী (রহঃ) বলেন, আনাস বর্ণিত এই হাদীসটির ভিত্তিতে আমাদের যুগে অধিকাংশ আহলে হাদীস



আলেমদের মতে নয় (৯) মাইল সফর করার পর কাসর করা চলবে। কিন্তু আমাদের কাছে তিন ইমাম অর্থাৎ ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের মতটাই প্রধানযোগ্য। তা হল ৪ বুরুদ যা ৪৮ মাইল পথ। ইমাম বুখারী ও শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর মতও তাই। এই মতের সমর্থনে ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীস আছে। (মিরআত ,২য় খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা)।

### কাস্বর কদিন পর্যন্ত চলতে পারে

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী (সঃ) সফর করেন। অতঃপর তিনি সেখানে উনিশ (১৯) দিন অবস্থান করেন এবং দু রাকআত কোরে কাস্বর পড়তে থাকেন। ইবনে আব্বাস আবার বলেছেন যে, আমরাও মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থানকালে উনিশ দিন পর্যন্ত ২ রাকআত কোরে কাসর পড়তাম। অতঃপর যখন আমরা তার চেয়ে বেশীদিন থাকতাম তখন চার রাকআত পড়তাম (বুখারী, মিশকাত ১১৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে অধিকাংশ ওলামার ফতওয়া এই যে, যদি কোন মোসাফের কোন জায়গায় ১৯ দিন অবস্থান করে তাহলে সে একাদিক্রমে ১৯ দিন কাস্বর করতে পারবে। কিন্তু তার বেশী থাকলে ১৯ দিন পর আর কাসর করা চলবে না, বরং তাকে পুরো নামাযাই পড়তে হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন মোসাফের কোন জায়গায় নির্দিষ্টভাবে কিছুদিন থাকবার মনস্হ না করে বরং আজ কাজ মিটলে আজ যাব, কাল কাজ শেষ হলে কাল যাব ইত্যাদি কোয়ে দ্বিধাগ্রস্হভাবে কয়েকমাস কেটে যায় তাহলে সে কয়েক মাসও কাসর করতে পারবে। যেমন ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ(সঃ) খায়বারে চল্লিশ (৪০) দিন অবস্থানকালে কাসর করতে থাকেন (মুসান্নাফ আঃ রাযযাক , কানযুল ওম্মাল, ৮ম খণ্ড , ১৫৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবদুর রাযযাক তদ্বীয় মুসান্নাফে বর্ণনা করছেন যে, একদা ইবনে ওমর (রাযিঃ) আজরবাইজানে বরফে আটকে পড়ায় সেখানে তিনি ছয় মাস কাসর পড়তে থাকেন এবং অন্যান্য বহু সাহাবীও তাঁর সাথে কাসর করেন। এইরূপ সাহাবী আনাস (রাযিঃ) আবদুল মালেক ইবনে

মারওরানের সিরিয়াতে দু মাস থাকেন এবং নামায দু রাকআত কোরে পড়তে থাকেন ( মিরআত ,২য় খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা) ।

ইবনে আব্বাস বর্ণিত উক্ত হাদীসটি এ কথা প্রমাণ করে না যে, যদি কোন মোসাফের কোন জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে ১৯ দিন থাকে তাহলে সে ১৯ দিনই কাসর করবে। কারণ, নাবী (সঃ) মক্কাতে ঐ দিনগুলো (ইচ্ছাকৃত ভাবে নয় বরং ) দ্বিধাগ্রস্তভাবে কাটিয়েছিলেন। আর কারো যদি এরূপ অবস্থা হয় তাহলে সে সর্বদা কাসর করতে পারে।

সেজন্য ইমাম তিরমিযী বলেন ,আহলে এলম বা বিদ্বানরা এ বিষয়ে একমত যে, যদি কোন মোসাফের কোন জায়গায় থাকবার দৃঢ় সংকল্প না করে বরং দ্বিধাগ্রস্তভাবে থাকে তাহলে সে কয়েক বছর ধরে কাসর করতে পারে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা) ।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন. আসল কথা এই যে, কোন মোসাফের যদি কোন জায়গায় ৪ দিন থাকার নিয়্যাত করে তাহলে সে ঐ ৪ দিন কাসর করতে পারবে। আর যদি সে ৪ দিনের বেশী থাকবার ইচ্ছাপোষণ করে তাহলে তাকে পুরো পড়তে হবে। অন্যথায় সে যদি দ্বিধাগ্রস্তভাবে কয়েক বছর থাকে তাহলে সে কয়েক বছরই কাসর করতে পারবে (ঐ, ২৬০ পৃষ্ঠা) ।

### দ্বিধাগ্রস্ত মুসাফির কয়দিন কাসর করতে পারে

নাসর ইবনে ইমরান সাহাবী ইবনে আব্বাসকে (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করেন যে, আমি খোরাসানের লড়াইয়ে খুব দীর্ঘ সফর করি। অতএব আপনার রায় কি? তিনি বলেন, তুমি দু রাকআত নামায পড় যদিও তুমি সেখানে দশ (১০) বছর অবস্থান কর। অন্য সংস্করণে বিশ (২০) বছরের কথা আছে। তাবিয়ী হাসান বলেন, আনাস ইবনে মালেক একদা সাবুর (অথবা নিশাপুরে) এক বছর কিংবা দু বছর ছিলেন তখন তিনি দু রাকআত কোরে নামায পড়তে থাকেন। যাকারিয়া ইবনে আমের বলেন , মার্ত শহরে যুদ্ধের সময়ে আলকামাহ দু বছর অবস্থান করেন এবং কাসর পড়তে থাকেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৫৩ ও ৪৫৪ পৃষ্ঠা) ।

হাফস ইবনে ওবায়দুল্লাহ বলেন, সাহাবী আনাস ইবনে মালেক একবার দু বছর সিরিয়ায় অবস্থানকালে কাস্‌র পড়তে থাকেন। তাবিযী হাসান বলেন, একদা আমরা আবদুর রহমান ইবনে সামুরার সাথে কাবুলে দু বছর অবস্থান করি। তখন তিনি কাস্‌র পড়তেন। ইবরাহীম নাখযী বলেন, তাঁরা রায় শহরে এক বছরের কিছু বেশী এবং সাদিস্থান শহরে দু বছর ছিলেন তখন নামায কাস্‌র পড়তে থাকেন (ফিক্‌হুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ যদি কেউ কোন জায়গায় আটক পড়েন এবং তিনি সেখানে থাকবার সংকল্প না করে তাহলে তিনি চিরকাল কাস্‌র করতে পারবেন (আল আসয়ীলাহ, ১ম খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে ইমাম নবভী বলেন, ‘আলবায়ান’ গ্রন্থপ্রণেতা ‘আলফুরূ’ গ্রন্থকারের বরাত দিয়ে লিখেছেন, কোন ব্যক্তির যদি দেশ না থাকে এবং তার অভ্যাস যদি চিরকালই সফর করা হয় তাহলে তিনি কাস্‌র করবেন। তবে পুরো পড়াটাই উত্তম। যদি কোন কাকের কিংবা নাবালক ছেলে সফরে বেরিয়ে কাস্‌র করার দূরত্ব পর্যন্ত যাওয়ার পর মুসলমান হয় এবং নাবালকটি যদি পথিমধ্যে সাবালকত্বে পৌঁছে যায় তাহলে তারা দুজনেই কাস্‌র পড়বে (রওযাতুত-তলিবীন ১ম খণ্ড, ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

### মুসাফির ইমাম কিংবা মুক্তাদি হলে

ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, আমি নাবী (সঃ) এর সাথে মক্কা বিজয়ের সময় ছিলাম। সে সময় তিনি মক্কাতে ১৮ রাত অবস্থান করেন এবং দু রাকআত কোরে নামায পড়তে থাকেন, আর একথা বলতে থাকেনঃ ‘ওগো শহরবাসীরা তোমরা ৪ রাকআত পড়। কারণ, আমরা মুসাফির’ (আবু দাউদ, মিশকাত, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস বলে যে, মুসাফির যদি ইমাম হয় তাহলে তার উচিৎ মুকীম বা স্থানীয় মুসল্লীদেরকে একথা বলা : ওগো, তোমরা পুরো নামায পড়ে নিও। কারণ, আমি বা (তার সাথে আর কেউ থাকলে বলবে) আমরা মুসাফির, তাই আমরা কাস্‌র পড়বো। এক প্রশ্নের উত্তরে ইবনে আব্বাস বলেন, মুসাফির একা নামায পড়লে ২ রাকআত

পড়বে এবং স্থানীয় ইমামের পিছনে মুক্তাদী হোয়ে পড়লে ৪ রাকআত পড়বে — এটাই হল সুন্নত ( মুসনাদে আহমাদ, মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ এবং তবেয়ীদের এক দল আর তিন ইমাম— ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফি'রী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্মাল এবং জমহুর উন্মত ও অধিকাংশ ওলামার অভিমত তাই। ( আলফাতহর রববানী ৫ম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ইমাম মা-লিক, হাসান বাসরী, যুহরী প্রমুখের মতে মুসাফির যদি মুকিম ইমামের সাথে এক রাকআত পুরো কিংবা ওর চেয়ে বেশী অংশ পায় তাহলে তাকে পুরো পড়তে হবে। আর যদি সে এক রাকআতের কম পায় তাহলে তাকে কাসর করতে হবে ( মুহাল্লা ইবনে হায্ম ৫ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)।

তাউস ও ইমাম শাবীর মতে, মুসাফির যদি ইমামের সাথে পুরো দু-রাকআত পায় তাহলে সে কাসর করবে। অন্যথায় সে পুরো পড়বে (ঐ-পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে হায্ম ও দাউদ যা-হিরীর মতে, মুসাফির মুক্তাদীকে সর্বাবস্থায় কাসর করতে হবে। তাই মুকিম ইমাম ২য় রাকআতে তাশাহুদ পড়ে ওয় রাকআতে দাঁড়ালে মুসাফির মুক্তাদী তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরে দেবে ( ঐ-৩১ পৃষ্ঠা)।

উক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে প্রথম অভিমতটি দলীলের দিক দিয়ে সঠিক। যেমন ইবনে উমর যখন মুকিম ইমামের সাথে নামায পড়তেন তখন চার রাকআত পড়তেন আর যখন তিনি একা পড়তেন তখন দু-রাকআত পড়তেন ( মুসলিম , ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)।

**সফরে দু অঙ্কের নামায এক অঙ্কে জমা করা চলে**

ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর রসূল সফরকালে যোহর ও আসর এক সাথে এবং মগরেব ও এশা একসাথে জমা কোরে পড়তেন (বুখারী মিশকাত, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

এই জমাটা তিনি কিভাবে করতেন সেটা সাহাবী মুআয ইবনে জাবালের

মখে শুনুন । তিনি বলেন , তবুক যুদ্ধের সময় আল্লাহর নাবী সফর শুরু করবার আগে সূর্য যখন ঢলে যেত তখন তিনি (যোহরের অজ্জেক্ই ) যোহর ও আসর জমা করতেন এবং সূর্য ঢলবার আগে যদি তিনি রওয়ানা হতেন তাহলে যোহরকে দেরী করতেন এবং আসরের সময় সওয়ারী থেকে নেমে যোহর ও আসর জমা করতেন । আর মগরেবেও তিনি এইরূপ করতেন । অর্থাৎ রওয়ানা হওয়ার আগে যদি সূর্য ডুবে যেত তাহলে ( মগরেবের সময়ে ) তিনি মগরেব ও এশা জমা করতেন এবং সূর্য ডোববার আগে যদি রওয়ানা হতেন তাহলে মগরেবকে দেরী করতেন এবং এশার সময় নেমে মগরেব ও এশা জমা করতেন ( আবু দাউদ, তিরমিযী, ১১৮ পৃষ্ঠা) ।

হানাফীরা বলেন, নামায জমা করতে হলে প্রথম অজ্জেকে দেরী কোরে শেষ অজ্জে নিয়ে গিয়ে এবং দ্বিতীয় অজ্জেকে একটু আগে টেনে এনে দুই অজ্জের মাঝখানে জমা করতে হবে । অর্থাৎ যোহরের আউঅল অজ্জে আসর জমা হবেনা এবং আসরের আউঅল অজ্জে যোহর জমা হবে না । বরং যোহরের শেষ অজ্জে যোহর এবং আসরকে জমা করতে হবে । আল্লামা রহমানী বলেন, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীর রিওয়ায়াতকৃত আনাস, ইবনে ওমর ও জাবের বর্ণিত সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসগুলো হানাফীদের উক্ত মতটিকে বাতিল বলে প্রমাণ করে এবং এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, দুঅজ্জের মধ্যে যে কোন এক অজ্জে দুঅজ্জের নামায জমা হতে পারে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা) । ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদের মতও তাই (আওনুল মাবুদ, ১ম খণ্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা) ।

### ঘরে থাকা অবস্থায়ও নামায জমা হতে পারে

বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল বিনা সফরে ও বিনা ভয়ে, অন্য বর্ণনায় আছে, বিনা বৃষ্টিতে মদীনায় যোহর ও আসরের নামায একসাথে এবং মগরিব ও এশার নামায জমা করেছেন । ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, রসূলুল্লাহর এরূপ করার ইচ্ছা কি ছিল ? তিনি বলেন, যাতে তাঁর উম্মত কষ্টে না পড়ে (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা; নাসায়ী, ১ম খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা, আবুদাউদ, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা;

মুসান্নাফ আব্দুর রায়যাক, ২য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে অনেক মুহাদ্দিস এবং ইবনে সীরীন বলেন, খুব প্রয়োজন থাকলে কখনো ঘরেও দু অঙ্কের নামায জমা করা যেতে পারে। তবে এরূপ অভ্যাসে পরিণত করলে চলবে না (আওনুল মাবুদ, ১ম খণ্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)।

### কোন কোন অবস্থায় নামায জমা করা যায়

আট (৮) রকম অবস্থায় দু অঙ্কের নামায এক অঙ্কে জমা করা যায়।  
অ হল:- (১) মুসাফির, (২) এমন রোগী যার প্রত্যেক অঙ্কে নামায পড়তে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হয়, (৩) স্তন্যদানকারিণী নারী যার প্রতি অঙ্কে কাপড় ধোয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার, (৪) প্রদর রোগী ও পেশাব-টপা রোগী, (৫) প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু বা তায়াম্মুমের দ্বারা পাক হতে অপারগ, (৬) যে সব ওষধের কারণে জামাআত এবং জুমআ ত্যাগ করা জায়েয, (৭) নামাযের অন্ত না জানতে অপারগ, (৮) যে নিজের প্রাণ কিংবা মাল অথবা সম্মান বাঁচাতে অক্ষম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, বাবুর্চি ও রুটি তৈরীকারী প্রমুখ যার মাল নষ্টের ভয় আছে সে জমা করতে পারে (আল আসয়িলাহ, ১ম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা ও ফিক্‌হ্‌স সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা)।

একদা এক রাখাল ব্যক্তি তা-বেয়ী-নেতা সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি উট চরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর সন্ধ্যাবেলায় মগরেবের নামায পড়ে শুয়ে পড়ি ফলে এশার নামায পড়া হয়না। তাহলে কি হবে? তিনি বলেন, এশা না পড়ে শুইয়ো না। তবে যদি তুমি ঘুমিয়ে পড়ার ভয় কর তাহলে মগরেব ও এশা জমা কোরে নিও (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)।

### সফরে কাম্বর পড়তেই হবে কিনা

সফরে নামায কাম্বর পড়তে হবে, না পুরো পড়তে হবে? এ ব্যাপারে দুটি মত আছে। আল্লাহর রসূল বলেন, সফরে কাম্বর নামাযটা আল্লাহর একটি দান যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর এই

দানটাকে কবুল করো (মুসলিম, মিশকাত ১১৮ পৃষ্ঠা)। এই হাদীসের ভিত্তিতে একদল আলেম বলেন, সফরে কাস্বর পড়া ও পুরো পড়া দুইই জায়েয, তবে কস্বরটা উত্তম।

ইবনে ওমর বলেন, আমি আল্লাহর রসূলের সঙ্গে থাকতাম। তিনি সফরে দু রাকআতের বেশী পড়তেন না। আর আমি আবু বাকর, ওমর ও উসমানের সাথেও ছিলাম। তাঁরাও এই রূপ করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রসূল সফরে চিরকালই কস্বর করেন, কখনো পুরো পড়েননি। তাই একদল আলেমের মতে সফরে কস্বর করতেই হবে। তা পুরো পড়া চলবে না।

ইবনে ওমর বলেন, সফরের নামায দু রাকআত। যে ব্যক্তি এই সুন্নত ত্যাগ করে সে কুফরী করে (মুহাল্লা, ৪র্থ খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)। ইবনে আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি সফরে চার রাকআত পড়ে সে যেন ঘরে দু রাকআত পড়ে (ঐ, ২৭০ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনুল কাইয়েম বলেন, নাবী (সঃ) সফরে ৪ রাকআত নামাযগুলো ৪ রাকআতই পুরো পড়েছেন বলে ওর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর আয়েশার যে হাদীসে আছে যে, নাবী (সঃ) কাস্বর এবং পুরো দুরকমই পড়েছেন — সে হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম ইবনে তইমিয়াহ বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়, বরং এটা আল্লাহর রসূলের ওপরে একটা মিথ্যা অপবাদ (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা)।

সেজন্য আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রহমানী বলেন, আমার নিকট প্রাধান্যযোগ্য মত এই যে, প্রত্যেক মোসাফেরের জন্য পুরো নামায না পড়ে কাস্বর করাটাই অপরিহার্য। যেমন আল্লাহর রসূল অপরিহার্যরূপে কাস্বর করেছিলেন। তবে পুরো করলে তাও জায়েয হবে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)।

### সফরে সুন্নত, নফল ও বিতর নামায

হাফস ইবনে আসেম বলেন, একদা আমি ইবনে ওমরের সাথে মক্কা সফরে ছিলাম। তিনি আমাদের যোহরের নামায দু রাকআত পড়িয়ে তাঁর

জায়গায় চলে গেলেন এবং বসে পড়লেন। অতঃপর কিছু লোককে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা সব কি করছে? আমি বললাম, এরা সব সুন্নত বা নফল পড়ছে। তিনি বললেন, আমি যদি সুন্নতই পড়ব তাহলে তো ফরযই পুরা পড়তাম। আমি আল্লাহর রসূলের সঙ্গে থেকেছি এবং আবু বাকর, ওমর ও ওসমানের সঙ্গেও থেকেছি। তাঁরা কেউই সফরে দু রাকআতের বেশী পড়তেন না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসই প্রমাণ করে যে, সফরে সুন্নত ও নফল সবই মাফ। সুতরাং তা পড়তে হবে না।

কিন্তু বারা ইবনে আযেব বলেন, আমি আঠারটা সফরে আল্লাহর রসূলের সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে কোনদিনই দেখিনি যে, সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে তিনি দু রাকাত নামায ছেড়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, তিনি সফরে কখনো কখনো সুন্নত বা নফল পড়েছেন। সুতরাং তা পড়াও যেতে পারে।

হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, নাবী (সঃ) সফরে কাসর নামাযের আগে বা পরে কোন সুন্নত নামায পড়েছেন। কিন্তু এর আগে যা পরে তিনি নফল পড়তে মানা করেননি। তবে হ্যাঁ, তিনি ঘরে ও সফরে ফজরের দু রাকআত সুন্নত এবং বিত্র নামায কখনই ছাড়েননি। (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

তাই আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রহমানী বলেন, আমার মতে সফরে বিত্র ও ফজরের সুন্নত ছাড়া উচিত নয়। থাকলো ফরযের আগে ও পরে সুন্নত — এ ব্যাপারে মুসল্লীর ইচ্ছা। যদি সে পড়ে সওয়াব পাবে। আর যদি না পড়ে তাহলে গোনাহ হবে না (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)।

সুন্নতগুলো ছাড়া সফরে সবরকম নফল নামায পড়া যেতে পারে। এ সম্পর্কে সমস্ত আলেমগণই একমত (আওনুল মা'বুদ ১ম খণ্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)।

### সফরে কাযা নামায কয় রাকআত?

যদি কোন ব্যক্তির সফরে থাকা অবস্থায় ঘরেতে ভুলে যাওয়া কিংবা



ঘুমিয়ে পড়া কাযা নামাযের কথা মনে পড়ে তাহলে সে দু (২) রাকআত পড়বে। আর যদি সে ঘরে ফিরে আসার পর সফরে কোন ভুলে যাওয়া কাযা নামাযের কথা কারো মনে পড়ে তাহলে সে চার (৪) রাকআত পড়বে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা কোন নামায ভুলে যায় তাহলে যখনই তার তা মনে পড়বে তখনই সে তা পড়ে নেবে (সুনানে দা-রিমী ১ম খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসে তিনি “মনে পড়ার সময়কে” কাযা আদায়ের সময় বলেছেন, ভুলে যাওয়া যা ঘুমিয়ে পড়ার সময়কে কাযা আদায়ের সময় বলেননি। অতএব সফরে যা মনে পড়বে তা সফরের নামায হিসেবে কাসর হবে এবং ঘরে যা মনে পড়বে তা ঘরের নামায হিসেবে পুরো পড়তে হবে। ইমাম ইবনে হাযম তাই বলেন (আলমুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)।

### জুমআর দিনে সফর নিষেধ নয়

একদা ওমর (রযিঃ) একজন লোককে বলতে শোনে যে, আজকের দিন যদি জুমআর দিন না হোত তাহলে আমি সফরে বের হতাম। তখন ওমর (রযিঃ) বলেন, তুমি বের হও। কারণ, জুমআ সফরে বাধা দেয় না। আবু ওবায়দা জুমআর দিন সফর করেন এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করেননি। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, নাবী (সঃ) জুমআর দিনে সফর করেছিলেন। অতএব জুমআর দিন সকালে সফরে বের হওয়া যেতে পারে (ফিকহুস সূন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)।

### কিবলার বিবরণ

আল্লাহর রসূল যখনই নামায পড়তেন তখনই কিবলার দিকে মুখ করতেন (কুতুবে সিন্তা)। যে বস্তুকে সামনে রেখে নামায পড়া হয় তাকে কিবলা বলে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, তোমরা মাসজিদুল হারাম অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকে তোমাদের মুখ করো (সূরা বাকারা ১৫০ আয়াত)।

সেজন্য আল্লাহর ঘর যা মক্কায় অবস্থিত, তা সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানের কিবলা। ঐ কিবলা যে দেশের মুসলমানের যেদিকে পড়ে তারা সেই দিকে মুখ করে নামায পড়বে। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ

কাবা ঘরের পূর্বে পড়ে। সেজন্য এখানকার লোকদেরকে পশ্চিম দিকে মুখ কোরে নামায পড়তে হয়। তাই আমাদের কিবলার দিক পশ্চিম দিক। কিন্তু যারা কাবার পশ্চিমে আছে তাদের কেবলা পূর্বদিক। এইরূপ মদীনাবাসীদের কিবলা দক্ষিণ এবং ইয়ামনবাসীদের কিবলা উত্তর দিক। কোন লোক যখন নিজের পরিচিত জায়গায় থাকে তখন কিবলা নিয়ে তার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখন সে সফরে বের হয় তখন তার দিক প্রায়ই ঠিক থাকে না। ফলে কিবলাও গুলিয়ে যায়। তাই এখন কিবলার আইনটা সবারই জেনে নেওয়া উচিত।

আল্লাহর রসূল বলেন, মাসজিদুল হারামে নামায পড়নে-ওয়ালাদের কিবলা বায়তুল্লাহ শরীফ এবং হরম শরীফ এলাকার মধ্যে বসবাস কারীদের কিবলা মাসজিদুল হারাম আর সারা দুনিয়ার লোকদের কিবলা ‘হরম শরীফ’ (বায়হাকী, নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)।

আ’-মির ইবনে রবীআহ বলেন, একদা আমরা অন্ধকার রাতে নাবী (সঃ) এর সাথে ছিলাম। ফলে আমাদের কিবলা গুলিয়ে যায়। অতঃপর (আমরা আন্দাজ কোরে একটা দিককে কিবলা মনে কোরে) নামায পড়লাম। তারপর যখন সূর্য উঠলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমরা ভুল কোরে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ কোরে নামায পড়েছি। তখন এই আয়াতটি নাযেল হল : ‘তোমরা যেকোনো মুখ ফেরাওনা কেন সেদিকেই আল্লাহর চেহারা আছে’ — সূরা বাকারহ, ১১৫ আয়াত (তিরমিযী, বুলুগুল মারাম, ১৬ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সফরে অপরিচিত জায়গায় কিবলার খোঁজখবর নেওয়ার পরও যদি কেউ ভুল-কিবলার দিকে নামায নামায পড়ে তাহলে তার নামায হোয়ে যাযে। পুনরায় সঠিক কিবলার দিকে মুখ কোরে তাকে আর নামায পড়তে হবে না।

### সুতরার বিবরণ

যে জিনিষ দ্বারা কোন বস্তুকে আড়াল দেওয়া হয় তাকে সুতরা বলে। শরীআতের পরিভাষায় সেই থাম অথবা দেওয়াল কিংবা কাঠ, যা নামাযীর সামনে রাখা হয় তাকে সুতরা বা আড়াল বলে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর

বলেন, আল্লাহর রসূল ঈদের দিনে যখন বের হতেন তখন একটা ছোট বল্লম নিয়ে যাবার হুকুম দিতেন। অতঃপর সেটা তাঁর (সঃ) সামনে রাখা হোত। তারপর তিনি তাঁর কাছে নামায় পড়তেন এবং লোকেরাও তার পেছনে নামায় পড়তেন। আর তিনি সফরেও এইরূপ করতেন (বুখারী, মুসলিম, নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং যাদেরকে ফাঁকা জায়গায় নামায় পড়তে হয় তাদেরকে সামনে সুতরা রাখতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন (ফাঁকা জায়গায়) নামায় পড়বে তখন সে যেন কোন জিনিষ দিয়ে তার সামনে আড়াল দেয়। যদি সে কোন জিনিষ না পায় তাহলে সে যেন একটি লাঠি পুতে দেয়। যদি সে তাও না পায় তাহলে সে (অন্ততঃপক্ষে) নিজের সামনে যমীনে একটা রেখা টেনে দেয়। তারপর যে কেউ তার সামনে দিয়ে যাক না কেন সে তার (নামাযের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, ৭৪ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী বিলাল (রাযিঃ) বলেন, একদা নাবী (সঃ) কাবা ঘরে ঢুকলেন, অতঃপর তিনি নামায় পড়লেন। তখন তাঁর ও কাবার দেওয়ালের মাঝখানে তিন(৩) গজহাত জায়গা ফাঁক ছিল (আহমাদ, নাসায়ী, বুখারী, নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহর রসূল বলেন, তোমাদের কেউ যখন সুতরা দিয়ে নামায় পড়বে তখন কেউ যদি (সুত্রার ভেতর দিয়ে) তার সামনে দিয়ে চলে যেতে চায় তাহলে সে যেন তাকে সরিয়ে দেয়। যদি সে বাধা না মানে তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ, সে একটা শয়তান (বুখারী, মুসলিম)। তিনি (সঃ) বলেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানতো যে, এতে তার গোনাহ কত তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে তার জন্য ৪০ বৎসর দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেয়তর হোত। (বুখারী, মুসলিম, বাযযার, বুলুগুল মারাম ১৭ পৃষ্ঠা)

ইবনে মাজা ও ইবনে হিব্বানের রিওয়ায়াতে ৪০ বৎসরের জায়গায় একশো বৎসরের কথা আছে (আওনুল মাবুদ ১ম খণ্ড ২৫৮ পৃষ্ঠা)।

মুত্তালিব ইবনে আবী অদাআহ থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (সঃ) কে

বানী সাহ্মের দরজার কাছে নামায পড়তে দেখেছেন তখন লোক তাঁর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। অথচ তাঁর এবং ঐ দরজার মাঝখানে কোন সুতরা ছিলনা (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসায়ী, নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)।

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, তবুক যুদ্ধের সময় আল্লাহর রসূলকে নামাযীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি বললেন, তা হাওদাজের পেছনের ডাঙার মত হবে (মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ১৭ পৃষ্ঠা)।

কেউ বলেন, ঐ ডাঙার উচ্চতা এক বিঘত হবে (আওনুল মাবুদ, ১ম খণ্ড ২৫৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু আতা (রাযিঃ) বলেন, হাওদাজের পেছনের ঐ কাঠটি যেন এক (১) গজহাত কিংবা তার চেয়ে একটু বড় হয় (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

### কাবা শরীফে সুতরা লাগে কি না

মওলানা ইসমাতুল্লাহ রহমানী সাহেব লিখেছেন : মুহিব্বুদ্দীন তাবারী ‘আলকিরা’ গ্রন্থে বলেন, মাসজিদুল হারামে সুতবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ঐ মাসজিদে যদি কেন ব্যক্তি কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলে যায় তাহলে কোন আপত্তি নেই। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) মাসজিদুল হারামে নামায পড়তেন এবং পুরুষ ও নারী তাঁর সামনে দিয়ে চলে যেতেন। এই কারণেই মনে হয় প্রত্যেক যুগের লোকেরা হরম শরীফে নামাযীদের সামনে দিয়ে চলে যায় এবং কিছু লোক না গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে। তবে সতর্কতা অবলম্বন করাই উচিত (সলাতুল মুস্তফা, ৫৫ পৃষ্ঠা)।

জামাআতের নামাযে ইমামের আগে যদি সুতরা থাকে তাহলে সেটা সমস্ত মোক্তাদীদেরও সুতরা হবে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি ইমামের পেছনে দাঁড়ানো মোক্তাদীদের সামনে কাতারের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে সে গোনাহ্‌গার হবে না এবং নামাযীদের নামাযেও কোন বাধা পড়বে না (মুসান্নাফ আব্দুর রায়যাক ২য় খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)।

হিজরী ১৫ শতকে মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট রিজালবিদ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন, মক্কা ও মদীনার মাসজিদে বিনা শরীআতী কারণে মুসল্লীদের সামনে দিয়ে যাবার কোন দলীল নেই। অধিকাংশ হাজী ঐরূপ

করে থাকেন। আমার কাছে এমন বহু দলীল আছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাফগণ (সাহাবী ও তাবেরী প্রমুখগণ) মাসজিদে হারামে সুতরা যাখতেন (ইসলা-হুল মাসা-জিদ, উর্দু অনুবাদ ১২৪ পৃষ্ঠার ১নং টীকা)।

### নৌকা, ষ্টীমার ও জাহাজে নামায

সাহাবী ইবনে ওমর বলেন একদা নাবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, নৌকাতে কিভাবে নামায পড়া হবে? তিনি বললেন, ‘তাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো যদি ডুববার ভয় না থাকে’ (দারাকুতনী, মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, নৌকাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ফলে উঠাবসা ও নড়াচড়ার কারণে যদি নৌকা ডুববার ভয় থাকে তাহলে বসে নামায পড়া যেতে পারে। অন্যথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অজৈব। নামাযীর নড়াচড়ার ফলে ষ্টীমার ও জাহাজ যেহেতু ডুববার ভয় নেই সেইজন্য এতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। তবে এসব যানে যদি দাঁড়াবার জায়গা না পাওয়া যায় তাহলে অগত্যা বসে বসে পড়তে হবে।

আনাস (রাযিঃ) সেই সময় নৌকাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যখন নৌকা দাঁড়িয়ে থাকতো এবং যখন তা চলতে থাকতো তখন তিনি ও তাঁর সাথীরা তাতে বসে বসে নামায পড়তেন (বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ড ৫৮২ পৃষ্ঠা)।

### জম্বুর পিঠে ও গাড়ীতে নামায

একদা নাবী (সঃ) এবং তাঁর কিছু সাহাবা এক জায়গায় পৌঁছলেন। তখন তিনি (সঃ) কোন জম্বুর উপরে সওয়ার ছিলেন। এমনতাবস্থায় আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং জমীনও ভিজ়ে ছিল। অতঃপর নামাযের সময় হল। তিনি মোআযযিনকে আযান দেবার হুকুম দিলেন। সে আযান দিল এবং পরে ইকামত দিল। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারী অবস্থায় আগে বেড়ে গেলেন এবং জামাআতে নামায পড়ালেন। তখন তিনি এশার নামায পড়াচ্ছিলেন এবং রুকুর তুলনায় সিঁজদায় একটু বেশী ঝুকছিলেন (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারাকুতনী, নাইলুল আলতার, ২য় খণ্ড,

২৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন রকম ওযর থাকলে কিবলা ঠিক রেখে জন্তুর পিঠের ওপরে ফরয নামায পড়া চলবে এবং ঐ সময় জন্তুর পিঠের উপর সিজদা না দিয়ে রুকূর চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে এশারায় সিজদা দিতে হবে।

ইবনে ওমর বলেন, নাবী (সঃ) ফরয ছাড়া নফল নামায সওয়ারীর পিঠে পড়তেন। সে সময় ঐ সওয়ারীর মুখ যেকিকে ঘুরতো তাঁর মুখও সেইদিকেই থাকতো (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সওয়ারীর পিঠে নফল নামায পড়া মানা নেই এবং নামায শুরু করার সময় কিবলার দিকে মুখ কোরে নামায শুরু করতে হবে। কিন্তু তারপর সওয়ারীর মুখ কিবলা ছাড়া অন্য দিকে ঘুরে গেলে কোন আপত্তি নেই। সহীহায়নের অন্য যেওয়াতে আছে যে, একদা সওয়ারীতে চড়া অবস্থায় নাবী (সঃ) পূর্বদিকে মুখ কোরে (নফল) নামায পড়েছিলেন। অতঃপর যখন ফরয পড়ার ইচ্ছা করলেন তখন নেমে পড়লেন এবং কিবলার দিকে মুখ কোরে নামায শুরু করলেন।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সওয়ারীর ওপর থেকে নেমে কিবলা ঠিক কোরে যদি ফরয নামায পড়া সম্ভব হয় তাহলে সওয়ারীর ওপরে ফরয নামায হবে না। অন্যথায় ওযর থাকলে কিবলা ঠিক রেখে সওয়ারীর ওপর ফরয নামায পড়া সম্ভব হলে চলবে। যদি কোন কারণে কিবলাও ঠিক রাখা সম্ভব না হয় তাহলে নামায শুরু করার সময় কিবলা ঠিক রেখে নামায শুরু কোরতে হবে। তারপর নামায পড়াকালীন কিবলা হেরফের হোয়ে গেলেও কোন আপত্তি নেই।

গরুর গাড়ী ও মোষের গাড়ী এবং ঘোড়া ও হাতির পিঠে এবং দূরগামী বাসগাড়ীতে সাধ্যমত ফরয নামায না পড়া উচিত। যদি কোন অসুবিধার কারণে ঐসব যান থেকে নামা সম্ভব না হয় এবং নামাযের অক্লান্ত চলে যাবার উপক্রম হয় তাহলে কিবলার দিক জেনে নিয়ে কিবলামুখী হোয়ে ঐসব সওয়ারীতে বসে বসে ইশারায় নামায পড়া চলবে এবং সিজদার সময় রুকূর চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকতে হবে।

## রেলগাড়ী এবং উড়োজাহাজে নামায

রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজে উপরে বর্ণিত নিয়মে নামায পড়তে হবে । তবে সফরের শুরুতে উল্লিখিত সবরকম সওয়ারীতে চড়ার আগে যদি দুই অঙ্কের নামায একত্রে জমা কোরে কিবলা ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব হয় তাহলে তাই কোরতে হবে । যদি রেল ও প্লেন চলাকালিন কিবলার দিক ঠিক না করা যায় তাহলে আন্দাজ কোরে কোন একটা দিককে কিবলা মনে কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তা না পারলে অগত্যায় বসে বসে নামায পড়লে চলবে ।

বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কম্পাসের মত একটি ছোট্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। যা দ্বারা রেল ও উড়োজাহাজে বা যে কোন যানে ঐ যন্ত্রটি কাছে রাখলে পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিক জানতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। অতএব আজকের যুগে কিবলা ঠিক করতে না পারার তো কোন প্রশ্ন ওঠে না। ঐ যন্ত্রটির দামও খুব বেশী নয়। ২৪শে মে ১৯৭৬-এ বোম্বাই থেকে ফেরার পথে আমরা ঐ যন্ত্র দিয়ে রেলতে দিক ঠিক কোরে, সেই সঙ্গে স্থানীয় লোকদের কাছে পশ্চিম দিকের খবর নিয়ে ওর সাথে মিলে যাওয়ায় খুব আরামের সাথে রেলতে নিশ্চিন্তে নামায পড়েছিলাম।

## ভয়ের সময়ে যুদ্ধের মাঠে নামায

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নাবীর মুখ দিয়ে নামায ফরয করেছেন নিজ শহরে ৪ রাকআত, সফরে ২ রাকআত এবং ভয়ের সময়ে ১ রাকআত (মুসলিম, মিশকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ভয়ের সময়ে নামায এক রাকআত যেভাবে হোক না কেন (মুসনাদে বাযযার, এর সনদ যরীফ)। ভয়ের নামাযে (ভুল হলেও) সাহুও সিজদা নেই (দারাকুতনী এর সনদও যরীফ, বুলুগুল মারাম, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, নামাযের গুরুত্ব কত! শত্রুর মোকাবিলায়

প্রাণ যাবার আশংকায়ও নামায মাফ নেই। এমত সংকটময় অবস্থাতেও কমপক্ষে এক রাকআত নামায পড়তে হয়। দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক, শুয়ে হোক, কিংবা ইশারায়ও হোক, যেভাবেই হোক তা পড়তে হবে।

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহ্‌অম্‌হ বলেন, লড়াই চলাকালীন এক রাকআত নামায ইশারায় পড়াও যথেষ্ট। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে একটি সিজদাও দিতে হবে। যদি তাও না হয় তাহলে একটি তকবীরও দিলে চলবে। কারণ, এটাও আল্লাহর যিক্র। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের মাঠে ভয়ের নামায মাত্র এক রাকআত, ইমাম ও মোক্তাদী উভয়ের জন্য। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও আবু মুসা আশআরী এই মতের সমর্থক (ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু জমহুর ওলামা (অধিকাংশ আলেমগণ) বলেন, ভয়ের সময়ে নামাযের রাকআতও নির্ভয়ের সময়ের রাকআতের মত। ঘরে হলে ৪ রাকআত, সফরে হলে ২ রাকআত এবং অবস্থা অতি সংগীন হলে এক রাকআত। এক রাকআত সব ভয়ের সময় নয় (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)।

ইবনুল কাস্‌সার মালেকী বর্ণনা করেন, নাবী (সঃ) দশবার (১০) ভয়ের সময়ে যুদ্ধের মাঠে নামায পড়েছিলেন এবং ইবনুল আরাবী বলেন, ২৪ বার। এই নামায পড়ার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়। আবু দাউদে এই বর্ণনা আছে ৮ রকম। ইবনে হিব্বানে ৯ রকম। ইবনে হাযমের বর্ণনা ১৪ রকম। ইবনুল আরাবীর বর্ণনা ১৬ রকম। আবুল ফযল ইরাকীর বর্ণনা ১৭ রকম। হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, সবগুলোর মূল ৬ রকম (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা)।

সলাতুল খওফ বা ভয়ের নামায সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীসটিকে হাফেয ইবনু আব্দিল বার প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, ওর সনদটি সবচেয়ে জোরদার এবং ইমাম ও মোক্তাদীর নীতির সমর্থক (ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)।

ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীস এই : তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহর



সাথে নজদের দিকে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। অতঃপর আমরা দুশমনদের সামনাসামনি হলাম এবং লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর (নামাযের সময়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বার জন্য দাঁড়ালেন। সে সময় একটি দল তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালো এবং আরেকটি দল দুশমনের দিকে এগিয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে রুকু করলেন এবং দুটো সিজদা দিলেন। তারপর সবাই দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়ালেন। এবার নাবী (সঃ) একা দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তাঁর নামায পড়ার সাথীরা নামায না পড়নেওলাদের জায়গায় ফিরে গেলেন। অতঃপর তাঁরা এলেন। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) এঁদের সাথে নিয়ে রুকু ও দুই সিজদা দিলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরলেন। অতঃপর তাদের প্রত্যেকেই একা একা এক রুকু ও দুই সিজদা দিলেন (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

শেষ রাকআতটি তাঁরা কিভাবে পড়লেন তার বর্ণনা ইবনে মসউদের মুখে শুনুন : রসূলুল্লাহ সালাম ফেরার পর দ্বিতীয় দলটি (মসবুকের মত) সালাম না ফিরে দাঁড়িয়ে একা একা ২য় রাকআত পড়ে সালাম ফিরলো এবং শত্রুর মোকাবেলায় গিয়ে দাঁড়ালো। অতঃপর প্রথম দলটি এদের জায়গায় ফিরে এসে একা একা এক রাকআত নামায পড়লো। তারপর তারা সালাম ফিরলো (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)।

ইবনে ওমর বলেন, ভয় যদি খুব বেশী হয় তাহলে তোমরা পায়ে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারীর উপরে কিবলার দিকে মুখ কোরে হোক কিংবা অন্য দিকে মুখ কোরে (যেভাবে পার) নামায পড়ে নিও। ইবনে ওমরের ছাত্র নাফে' বলেন, আমার মনে হয় ইবনে ওমর এই হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকেই বর্ণনা করেছেন (বুখারী, মিশকাত, ১২৪ পৃষ্ঠা)।

পরিস্থিতি অনুযায়ী সলা-তুল খওফ বা ভয়ের নামায যেভাবেই সম্ভব সেইভাবেই উপরোক্ত হাদীস অনুসারে পড়তে হবে। সাধ্যমত নামায ছাড়া চলবে না।

### তুমুল যুদ্ধের সময় নামায

বিখ্যাত তাবিয়ী সায়ীদ ইবনে জোবায়র বলেন, দুটি শত্রুদল যখন

লড়াই করে এবং কিছু মানুষ অন্য মানুষকে মারতে থাকে এমতাবস্থায় নামাযের সময় এসে পড়লে তুমি বল : ‘সুবহা-নাল্লাহ ০ অলহামদু লিল্লা-হ ০ অলা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ০ অল্লা-হু আকবার’ তাহলে ঐটা তোমার নামায হবে। তারপরে আর নামায পুনরায় পড়তে হবে না (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা)।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোজাহেদ এবং হাকাম বলেন, যখন তীর ও তলোয়ার চলতে থাকে তখন তকবীর দিয়ে (ইশারায়) নামায পড়া যথেষ্ট। যদি তা না সম্ভব হয় তাহলে যে কোন দিকেই মুখ কোরে একটি তকবীর যথেষ্ট (ঐ, পৃষ্ঠা - ঐ)।

### অশ্বেষক এবং পলাতকের নামায

যদি কোন মুসলমান অমুসলিম ইসলাম-দুশমনকে তাড়িয়ে বেড়ায় অথবা কোন মুসলমানকে যদি তার শত্রু দৌড় করায় এবং ঐ অবস্থায় যদি নামাযের সময় এসে যায় তাহলে উক্ত দু-প্রকার লোকও সাধ্যমত নামায ছাড়তে পারবেনা। বরং তাকে ইশারায় নামায আদায় করতে হবে। যেমন এক সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রাযিঃ) একবার তা করেছিলেন। উক্ত সাহাবী বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) খালেদ ইবনে সুফয়্যান হুযালীকে হত্যা করার জন্য আমাকে পাঠালেন। তখন ঐ লোকটি আরাফাত এবং ওরানার দিকে ছিল। আমি গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম এবং মনে মনে বললাম, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার এবং ওর মধ্যবর্তী ব্যাপারটি নামাযকে দেবী করে দিতে পারে। তাই আমি চলতে থাকলাম এবং ওর দিকে মুখ কোরে ইশারাতে নামাযও পড়তে লাগলাম। অতঃপর যখন আমি তার কাছে পৌঁছলাম তখন সে আমাকে বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আরবেরই একজন লোক! আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি নাকি ওই ব্যক্তির (মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করার) জন্য সৈন্য জমা করছেন? আমি ঐ ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি। লোকটি বলল, হ্যাঁ। নিশ্চয় আমি তাই করছি। অতঃপর আমি তার সাথে সাথে কিছুক্ষণ চলতে থাকলাম। পরিশেষে সুযোগ পেয়ে গেলাম। ফলে আমি তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা কোরে ফেললাম। সে চিরতরে ঠাণ্ডা হয়ে গেল (আবু দাউদ,

১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, অত্যন্ত ভয়ের সময়ে ইশারায় নামায পড়া জায়েয। কারণ, উপরোক্ত সাহাবী আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশায় ঐ কাজ করেন। সে সময়টি ছিল অহী নাযেলের সময়। সুতরাং নাবী (সঃ) ঐ ঘটনার খবর জানতেন না, একথা বলা অসম্ভব। তাছাড়া কোন সাহাবীর কাজও দলিলযোগ্য হতে পারে যখন তাঁর বিরোধিতায় অন্য কোন মরফু হাদীস বর্ণিত না থাকে (আওনুল মা'বুদ ১ম খণ্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটিতে ইসলাম-দুশমনকে অশ্বেষণকারীর নামাযের কথা রয়েছে। এরই অন্যদিক হল দুশমনের ভয়ে পলায়নকারীর নামাযের কথা উভয়ের কুম একই। এইরূপ যাকে কোন দুশমন রুকু ও সিজদা করতে বাধা দেয়, কিংবা সে নিজের প্রাণের অথবা পরিবারের নতুবা নিজের মাল নষ্টের ভয় খায় কোন দুশমন থেকে অথবা চোর থেকে কিংবা কোন হিংস্র জন্তু থেকে তাহলে সে যে কোন দিকেই হোক মুখ কোরে ইঙ্গিতে নামায পড়বে।

আল্লামা ইরাকী বলেন, প্রত্যেক বৈধ ভয় যেমন বন্যা কিংবা আগুন প্রভৃতির ভয়ে ঐভাবে নামায পড়া ছাড়া অন্য উপায় যদি না থাকে তাহলে ঐরূপ নামায জায়েয হবে। এইরূপ এমন গরীব করযদার যে তার দারিদ্রের প্রমাণ পেশ করতে অপারগ। ফলে করযদাতা তাকে পেলে কয়েদ করবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে না। এইরূপ খুনের দায়গ্রস্থ এমন ব্যক্তি যে প্রতিশোধ গ্রহণকারীর প্রতি ক্ষমার আশা রাখে তার রাগ থেমে গেল। এরা সবাই পলাতকের হুকুমের মধ্যে গণ্য হবে। (ফিক্‌হুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা)।

১ম খণ্ডের শুরু থেকে এই পর্যন্ত কেবল ফরয নামাযের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমার জ্ঞান মুতাবেক খুঁটিনাটি আলোচনা করা হল। এবার নফল এবং কিছু সুন্নত নামায সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

### নফল নামাযের তত্ত্ব ও গুরুত্ব

আরবী নফল শব্দের অর্থ বাড়তি ও অতিরিক্ত প্রভৃতি। দিন ও রাতে

পাঁচ অঙ্ক ফরয নামায ছাড়া আরো কিছু বাড়তি নামাযও আছে যেগুলো পড়লে খুব নেকী হয়, না পড়লে গোনাহ নেই। ঐ নামাযগুলো ফরযের তুলনায় বাড়তি বলে ওদেরকে নফল বলা হয়। এই নফল নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রসূল বলেন, কিয়ামতের মাঠে বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথমে নামাযের হিসাব নিকাশ হবে। যদি তার নামায ঠিক হয় তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে এবং সফলকাম হবে। আর যদি নামাযটাই বেকার হয় তাহলে সে হতাশ হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর তার আমলের মধ্যে ফরয কাজে যদি কিছু কম পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখ, আমার এই বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না? তারপর ঐ নফল দ্বারা তার কমতি ফরয পূরো করা হবে। এইরূপ অন্যান্য সব আমলে করা হবে (আবু-দাউদ, আহমাদ, মিশকাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

মিরাজ থেকে ফিরে এসে একদা ফজরের নামাযের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি আমাকে তোমার সেই উত্তম আমলের কথা বর্ণনা কর যা তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর করেছে? কারণ, আমি বেহেশতে আমার আগে তোমার খড়মের খট খট আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।’ তিনি বললেন, আমি এমন কোন আমল করিনি, যা আমার নিকট অতি উত্তম হতে পারে। তবে হ্যাঁ, দিন ও রাতে যখনই আমি (অযু ও গোসল প্রভৃতি দ্বারা) পবিত্র হতাম তখনই আমি ঐ পবিত্রতা দ্বারা (নফল) নামায পড়তাম, যা আমার জন্য ফরয করা হয়নি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৬ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যেব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে দুশমনী করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে এমন জিনিষ দ্বারা যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয় তা হল ফরয ছাড়া নফল কার্যাবলী। আমার বান্দা নফল কাজসমূহ দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। অতঃপর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যারা দ্বারা সে শোনে এবং তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে আর তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা

হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। তাই যদি সে আমার কাছে কিছু চায় তাহলে আমি তাকে তা অবশ্য অবশ্যই দিই এবং যদি সে কোন কিছু থেকে আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে নিশ্চয় নিশ্চয়ই তাথেকে আশ্রয় দিই' (বুখারী, মিশকাত, ১৯৭ পৃষ্ঠা)। উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল ইবাদতের গুরুত্ব কত। সমস্ত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। সুতরাং একথা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নফল নামাযের মাহাত্ম্য কত।

### সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে ফরয নামায পড়ে নেবে তখন সে যেন তার বাড়ীর জন্য নামাযের কিছু অংশ বাকি রেখে দেয়। কারণ, ঘরেতে তার নামায পড়ার কারনে আল্লাহ তাআলা তার ঘরে বরকত ও কল্যান দান করেন' (মুসলিম, মিশকাত, ১১৪ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় তিনি (সঃ) বলেন, ফরয ছাড়া কোন ব্যক্তির অন্যান্য নামায তার ঘরে পড়া আমার এই মাসজিদে (নববীতে নামায) পড়ার চেয়েও উত্তম (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, ১১৫ পৃষ্ঠা)।

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যোহরের জামাআতের আগে চার (৪) ও পরে দুই (২) রাকআত এবং মগরেব বাদ দুই (২) রাকআত, এশার জামাআতের পর দুই (২) রাকআত, এবং রাতে (এক রাকআত) বেতরসহ নয় রাকআত আর ফজরের আগে দুই (২) রাকআত নামায আমার ঘরে পড়তেন (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বলেন, একদা আমি আমার ঘরে এবং মাসজিদে নামাযপড়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি দেখছো না যে, আমার ঘর মাসজিদের কত কাছে হওয়া সত্ত্বেও আমি ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায মাসজিদের তুলনায় নিজের ঘরে পড়া অধিক পছন্দ করি (ঐ, ২১০ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কিরাম বলেন, মাদীনার মাসজিদে নববীর তুলনায়ও ঘরে নফল এবং সুন্নত পড়া উত্তম (বায়লুল মানফআহ, ২৩ পৃষ্ঠা)। ওমর (রাযিঃ) বলেন, ঘরে নফল নামায জ্যোতি। অতএব

যার ইচ্ছা সে তার ঘর খুবই জ্যোতির্ময় করুক (মুসনাদে আহমাদ)। তিনি (সঃ) বলেন, তোমাদের কিছু নামায তোমরা নিজেদের ঘরে পড়িও এবং ঘরকে গোরস্থানে পরিনত কোরো না (আহমাদ, আবু দাউদ)।

একজন সাহাবী বলেন, কোন ব্যক্তির তার ঘরে নফল নামায পড়া লোকেদের সামনে নফল পড়ার চেয়ে নেকী ঐরূপ বেশী যেমন জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত একজনের একা নামায পড়ার চেয়ে বেশী (মুসল্লাফ আব্দুর রায়যাক ৩য় খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)।

### রাতের নফল নামাযের গুরুত্ব

নফল নামায রাতে ও দিনে উভয় সময়ে আছে। তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতের নফল নামায দিনের তুলনায় অধিক গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্যপূর্ণ। যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের নামায’ (মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ২৭ পৃষ্ঠা)।

তিনি (সঃ) বলেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কুরআনের বাহক এবং রাতের সাধক’ (বাইহাকী, মিশকাত, ১১০ পৃষ্ঠা (হাদীস নম্বর ১২৩৯))। এই হাদীসটির সূত্র অতি দুর্বল।

দিনের নফলের তুলনায় রাতের নফলের মাহাত্ম্য ঐরূপ, প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানের ফযীলত যেরূপ (তাবারানী, হিলয়্যাতুল আউলিয়া, কানযুল ওমমাল, ৭ন খণ্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)।

তোমরা রাতের নামায কখনো ছেড়ো না যদিও তা বকরীর দুধ দোওয়া সময় পর্যন্ত হয় (তাবারানী আওসাত)। তোমরা রাতের নামায অপরিহার্য কোরে নাও। যদিও তা এক রাকআত হয় (ঐ)। যার রাতের নামায বেশী হয় দিনে তার চেহারা চমকায় (ইবনে মাজাহ)। কোন ব্যক্তি যদি বিছানায় আলো এবং নিয়্যাত করে যে, সে রাতে নামায পড়বে। কিন্তু সে যদি ঘুমিয়ে পড়ে সকাল হোয়ে যায় তাহলে তার নিয়্যাত মোতাবেক তার জন্য নেকী লেখা হয়। আর তার ঘুমটি তার প্রভুর তরফ থেকে সদাকাহ হিসেবে গণ্য হয় (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, কানয, ৭ম খণ্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা)।

নবী (সঃ) বলেন, ‘তোমরা রাতের নামাযের জন্য দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম কোরে সাহায্য গ্রহণ করো এবং দিনের রোযার জন্য সাহারী দ্বারা

সহায়তা লাভ করো' (মুসান্নাফ আব্দুর রায়স্বাক, ৪র্থ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)।  
'তোমরা দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম করো। কারণ, শয়তান দুপুরে বিশ্রাম করে না' (তাবারানী আওসাত, কানযুল ওমমাল, ৭ম খণ্ড, ৫৭০ পৃষ্ঠা)।

মুসনাদে আহমাদে ঐ নামাযকে 'অধিক রাতের নামায' বলা হয়েছে। যাকে কুরআনে তাহাজ্জুদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং এবার তাহাজ্জুদের বর্ণনা শুনুন।

### তাহাজ্জুদের মাহাত্ম্য

যত রকম নফল নামায আছে তন্মধ্যে কেবল তাহাজ্জুদের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, '(হে মুহাম্মদ!) তুমি নিজের জন্য নফল স্বরূপ রাতে তাহাজ্জুদ পড়' (সূরায়ে বানী ইসরাইল, ৭৯ আয়াত)।

এ সম্পর্কে আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, সূরা মুযয্যামমিলের শুরু কয়েকটি আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদ ফরয করে দেন। তাই আল্লাহর নাবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা এক বছর তাহাজ্জুদ পড়েন এবং পা ফুলিয়ে ফেলেন। ঐ সময় আল্লাহ তাআলা বারটি (১২) মাস ধরে সূরাটির শেষাংশ আসমানে আটক রাখেন। তারপর সূরার শেষাংশ নামেল কোরে নামাযটি হাল্কা করে দেন। ফলে রাতের নামায ফরযের বদলে নফলে পরিণত হয় (সহীহ ইবনে খুমাইমাহ, ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)।

আনাস (রাযিঃ) বলেন, একদা রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বেদনাগ্রস্থ হন। অতঃপর যখন সকাল হয় তখন তাঁকে কেউ বলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপরে তো অসুখের চিহ্ন বিদ্যমান! তিনি বলেন, 'হুঁ, যেমন তোমরা দেখছো। তথাপি আলহামদুলিল্লাহ যে, আমি গত রাতে সাতটি সবচেয়ে বড় সূরা পড়েছি' (ঐ, ১৭৭ পৃষ্ঠা)।

ঐ তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্পর্কে নাবী (সঃ) বলেন, 'আমার মাসজিদে এক রাকআত নামায অন্য জায়গার দশ হাযার নামাযের সমান এবং মাসজিদে হারামের এক রাকআত নামায এক লাখ নামাযের সমান আর কোন রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রহরা-অবস্থায় এক রাকআত নামায বিশ লাখ নামাযের সমান হয়। কিন্তু এ সবার চেয়ে বেশী নেকী হয় ঐ দু রাকআত

নামাযে মা কোন বান্দা মাঝরাতে পড়ে' (ইবনে হিব্বানের কিতাবুস সওয়া-ব, মুনযিরীর তারগীর অন্তারহীব, ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)। (হাদীসটি যরীফ)।

তাই মা আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুখে পড়তেন অথবা ক্লান্ত হতেন তখন বসে বসে তাহাজ্জুদ পড়তেন (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা রাতের নামায তাহাজ্জুদ পড়াকে অবশ্য করণীয় করে নাও। কারণ, এটা তোমাদের পূর্বেকার সৎলোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের নৈকট্যলাভের উপায় আর ভুলভ্রান্তির খেসারত এবং গোনা থেকে বাঁচার হাতিয়ার। তিনি (সঃ) বলেন, প্রতিপালক আল্লাহ বান্দার অতি নিকটবর্তী হয় অধিক রাতের শেষ দিকে। অতএব তুমি যদি ঐ সময়ে আল্লাহর যিকরকারীদের মধ্যে হতে পার তাহলে হোয়ে যাও (তিরমিযী, মিশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

তিনি বলেন, 'আমাদের প্রভু তবারাক অতআলা প্রত্যেক রাতে দুনিয়াবী-আসমানে নেমে আসেন যখন শেষ রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর তিনি বলেন, কে আমাকে ডাকবে তার ডাকে আমি সাড়া দেব! কে আমার কাছে ভিক চাইবে তাকে আমি তা দেব! কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে তাকে আমি ক্ষমা করে দেবো' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

যারা তাহাজ্জুদ পড়ে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে (বাইহাকী)। নাবী (সঃ) এই নামায এত দীর্ঘ সময় ধরে পড়তেন যে, তাঁর পা দুটি ফুলে যেত। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আগের ও পিছনের সব গোনাহ যখন মাফ তখন আপনি এত কষ্ট করেন কেন? তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না কি?' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

যাঁরা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত তাঁরা বলেন, 'খেলোয়াড়রা তাদের খেল তামাশায় যে মজা পায় রাতে এবাদতকারীরা রাত জাগরণে ঐরূপ স্বাদ পায়'। এক বোযর্গ ব্যক্তি একথাও বলেন যে, বাদশাহরা যদি রাতে তাহাজ্জুদের সময়



ঘুম করার মজা জানতে পারত তাহলে ঐ ইবাদত-ছিনতাইকারীর প্রতি তারা ঐরূপ সৈন্যচালনা করত যেমন তারা তাদের রাজত্ব ছিনতাই হবার সময় করে থাকে।

### তাহাজ্জুদের সময়

তাবিয়ী মাসরুফ একদা আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি ? তিনি বললেন, স্থায়ী কাজ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, রাতের কোন সময় তিনি (সঃ) নামাযে দাঁড়াতে? বললেন, যখন তিনি মোরগের বাং শুভতে পেতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৭ পৃষ্ঠা)।

ইবনে বাত্তাল বলেন, রাতের তিনভাগের শেষাংশের শেষ দিকে মোরগ বাং দেয় (মিরআত, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় নামায দাউদ (আঃ) এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতে এবং রাতের তৃতীয় ভাগে নামাযে দাঁড়াতে। আর ৬ষ্ঠ ভাগে আবার ঘুমাতে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

উক্ত ২টি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, রাতকে তিন ভাগ করার পর শেষ ভাগটি তাহাজ্জুদের সময়। আমাদের দুই বাংলায় গরমকালে সূর্য ডোবার পর থেকে আনুমানিক ৭ ঘণ্টার পর রাত ১টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত এবং শীতকালে মগরেব থেকে আনুমানিক ৮ ঘণ্টার পর রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত তাহাজ্জুদের মোটামুটি সময়।

### তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমায়ান মাসে হোক কিংবা অন্য মাসে ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে ৪ রাকআত পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোরো না। তারপর ৪ রাকআত পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোরো না। তারপর তিনি ৩ রাকআত পড়তেন (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ২৭ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা আট

এক বিতর তিন রাকআত। আয়েশার অন্য বর্ণনায় আছে, নাবী (সঃ) এশা পড়ার পর ফজর পর্যন্ত ১১ রাকআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক দু-রাকআতের পর তিনি সালাম ফিরতেন এবং এক রাকআত বিতর পড়তেন। তাঁর একটি সিজদা তোমাদের কোন একজনের ৫০টি আয়াত পড়ার সময়ের মত দীর্ঘ হোত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা দশ এবং বিতর এক রাকআত। তাযীযী মাসনুনক বলেন, আমি রসূলুল্লাহর রাতের নামায সম্পর্কে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কখনো সাত, কখনো নয় এবং কখনো এগার রাকআত (বুখারী, মিশকাত, ১০৬ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা উর্দ্ধপক্ষে দশ এবং কমপক্ষে ছয় রাকআত। প্রথম বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, অধিকাংশ সময়ে নাবী (সঃ) বিতর ছাড়া ৮ রাকআত পড়তেন এবং বেশী সময় পেলে দ্বিতীয় বর্ণনানুসারে তিনি ১০ রাকআত পড়তেন। আর সময় কম পেলে কিংবা অসুখ থাকলে অথবা কোন ওযর থাকলে কখনো ছয় (৬) রাকআতও পড়তেন। আয়েশারই এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে নয় (৯) রাকআত পড়তেন। অতঃপর যখন তাঁর বয়স বেড়ে যায় এবং শরীর ভারী হোয়ে পড়ে তখন তিনি সাত (৭) রাকআত পড়তেন (নাসায়ী ১৯২ পৃষ্ঠা)।

উক্ত সাত রাকআতের মধ্যে তিনি কয় রাকআত বিতর পড়েছেন তার উল্লেখ ঐ হাদীসে নেই। তিনি যদি বিতর এক রাকআত পড়ে থাকেন তাহলে তাহাজ্জুদ নামায ছয় রাকআত। কিন্তু যদি তিনি বিতর তিন রাকআত পড়ে থাকেন তাহলে তাহাজ্জুদ সংখ্যা চার রাকআত হয়। সুতরাং কেউ যদি দেবীতে ঘুম, ভাঙার কারণে সময় কম থাকার ফলে অথবা অসুখের কারণে চার (৪) রাকআত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাকআত বিতর পড়েন তাহলেও তিনি তাহাজ্জুদের নেকী পাবেন।

পারতপক্ষে তাহাজ্জুদের নামায ছাড়া উচিত নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল স্থায়ী আমল,

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১০ পৃষ্ঠা)। একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আমরিবনিল আসকে বলে, তুমি এমন ব্যক্তির মত হয়ে না যে রাতে নামাযে দাঁড়াতে অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়তে। অতঃপর সে তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

তাহাজ্জুদের আট রাকআত নামায দুই সালামে চার (৪) চার রাকআত কোরেও পড়া যায়। যেমন আগে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত আট অথবা দশ কিংবা ছয় রাকআত দুই (২) দুই রাকআত কোরে পড়া উত্তম ও সহজসাধ্য। ইবনে ওমরের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, রাতের নামায দুই দুই রাকআত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১১ পৃষ্ঠা)।

### তাহাজ্জুদ নামাযের আগে করণীয়

সাহাবী হোযায়ফা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে দাঁত ঘষতেন (নাসায়ী)। তিনি বলেন, আমাদেরকে মিসওয়াক দিয়ে দাঁতন করার হুকুম দেওয়া হোত যখন আমরা তাহাজ্জুদের জন্য উঠতাম (নাসায়ী)। অতঃপর তিনি (সঃ) অযু করতেন (মুসলিম)। তারপর নীচের দুআগুলো (১০) দশবার কোরে পড়তেন। তারপর নামায শুরু করতেন (আবু দাউদ, মিশকাত, ১০৮ পৃষ্ঠা)। দোআগুলো এই :

(১) আল্লা-হ আকবার (আল্লাহ মহান)

(২) আলহামদু লিল্লা-হ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য)

(৩) সুবহা-নাল্লা-হি অবিহাম্দিহী **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** (আমি আল্লাহর পবিত্র বর্ণনা সহকারে তাঁর গুণকীর্তন করছি)

(৪) সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুস **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** (পুত পবিত্র বাদশার পবিত্রতা বর্ণনা করছি)

(৫) আসতাগফিরুল্লা-হ **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা

চাচ্ছি) (৬) লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ্ ছাড়া  
ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই)

(৭) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ আল্লা-  
হুম্মা ইল্লী আউযু বিকা মিন যীকিদ দুন্য়্যা ওয়া যীকি ইয়াওমিল কিয়্যামাহ  
(আল্লাহ্ গো ! আমি এই জগতের এবং পরকালের সংকট থেকে  
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

### তাহাজ্জুদ নামাযের তরীকা

উক্ত দুআগুলো পড়ার পর তিনি (সঃ) আল্লাহ্ আকবার বলে তকবীয়ে  
তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। তারপর তাহাজ্জুদের জন্য বিশেষ সানা  
পড়তেন। বিভিন্ন হাদীস একত্রিত করলে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের  
নামাযে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায় ৬/৭ রকম সানা পড়তেন। তন্মধ্যে আমার  
জ্ঞানে অথের দিক দিয়ে নিম্নের এই সানাটি উত্তম। ইবনে আব্বাস বলেন,  
নবী (সঃ) যখন রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন তখন পড়তেনঃ-

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ \* وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ  
نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ \* وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَنْ فِيهِنَّ \* وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ \* وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ  
وَالْبَعْثُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ \* اللَّهُمَّ لَكَ  
أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ  
حَاكَمْتُ فَاعْفُ عَنِّي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ  
بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ \*

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আস্তা কাইয়ি-মুস সামা-ওয়া-তি  
অলআরযি অমান ফীহিন্না ০ অলাকাল হামদু আস্তা নূকস সামা-ওয়া-তি  
অল্ আরযি অমান ফীহিন্না ০ অলাকাল হামদু আস্তা মালিকুস সামা-

ওয়া-তি অলআরযি অমাগ ফীহিন্না ০ অলাকাল হামদু আন্তাল হাক্কু ওয়া  
ওয়া'দুকাল হাক্কু ০ অলিকা-উকা হাক্কুন অকাওলুকা হাক্কুন ০ অল-  
জাম্নাতু হাক্কুন অন্নারু হাক্কুন ০ অন্নাবিইয়্যুনা হাক্কুন অমুহাম্মাদুন  
হাক্কুন অস্বন্না-আ'তু হাক্কুন ০ আল্লা-হুন্না লাকা আসলামতু অবিকা  
আ-মানতু ০ অআলাইকা জওরাক্কালতু অ ইলায়কা আনাবতু ০ অবিকা  
খা-সামতু অ ইলাইকা হা-কামতু ০ ফাগফিরলী মা-কাদামতু অমা-  
আখ্বার তু ০ অমা আসরারতু অমা আ'লান্তু ০ অমা-আন্তা আ'লামু  
বিহী মিনী ০ আন্তাল মুকাদিমু অআন্তাল মুআখখিরু লা-ইলা-হা ইন্না  
আন্তা ০ অলা-ইলা-হা গ্নায়রুকা ০

তরজমা : আল্লাহ গো! তোমারই সব প্রশংসা। তুমি আসমানসমূহ  
ও যমীন এবং তাদের মাঝে যারা আছে তাদের সবারই ব্যবস্থাপক।  
তোমারই আরো গুণকীর্তন! (কারণ) তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের  
এবং তাদের মধ্যবর্তী সবারই জ্যোতি। আবার তোমারই প্রশংসা! (কারণ)  
তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের এবং তাদের মধ্যকার সবারই মালিক।  
তোমারই সব তারীফ! (কারণ) তুমি সত্য এবং তোমার ওয়াদাও সত্য।  
আর তোমার সাক্ষাৎ সত্য এবং তোমার কথাও সত্য। আর জাম্নাত সত্য  
এবং জাহান্নামও সত্য। আর নাবীগণ সবাই সত্য এবং মুহাম্মদও (সঃ)  
সত্য। আল্লাহ গো! আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং তোমারই  
উপরে বিশ্বাস রাখি আর তোমারই উপরে ভরসা করি এবং তোমারই  
প্রতি রুজু করি। আর তোমারই কাছে মামলা পেশ করি এবং তোমারই  
কাছে বিচার কামনা করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি যা  
আগে করেছি এবং যা পরে করেছি, আর যা আমি গোপনে করেছি এবং  
প্রকাশ্যে করেছি, আর আমার তরফ থেকে যেসব ব্যাপারে তুমি সম্মত  
জ্ঞাত আছ (ঐ সমস্ত বিষয়েও আমাকে মাফ করো)। কারণ, তুমি সবার  
আগে আছ এবং তুমি সরার পেছনেও থাক। তুমি ছাড়া উপাসনার  
অধিকারী আর কেউ নেই এবং তোমা ব্যতীত আর কোন উপাস্যও নেই  
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৭—১০৮ পৃষ্ঠা)।

এরপর তিনি কিরাআত পড়তেন (আবু দাউদ, মিশকাত ১০৮ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ সূর্যে ফাতেহা পড়েন এবং তারপর কুরআনের অন্যান্য আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

নোট : তাহাজ্জুদের নামাযে সানা হিসাবে সুবহা-নাকাল্লা-হম্মা অবিহামদেকা অতাবা-রাকাসমুকা অতাআ-লা জাদুকা অল্লা-ইলা-হা গাইরুকা অথবা আল্লা-হম্মা বি-য়িদ বাইনী প্রভৃতিও পড়া যায়।

### তাহাজ্জুদের কিরাআত

আবু হুরায়রা (রযিঃ) বলেন, নাবী (সঃ) যখন রাতে নামায পড়তেন তখন কখনো নীরবে এবং কখনো উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তেন (আবু দাউদ, মিশকাত, ১০৭ পৃষ্ঠা)। ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন হজরায় রাতে নামায পড়তেন তখন বাইরের লোক তাঁর কিরাআত শুনতে পেত (সহীহ ইবনে খুয়াইমাহ, ২য় খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)।

উম্মে সালামা বলেন, রসূলুল্লাহর কিরাআতে একটি একটি হরফ আলাদা আলাদা হোত (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)। আরোশা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক রাতে সূরা বানী ইসরাযীল এবং সূরা যুমার পড়তেন (ঐ, পৃষ্ঠা ১৯১)।

### তাহাজ্জুদ ছেড়ে গেলে

আরোশা বলেন, ঘুমিয়ে পড়া অথবা অসুখের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর রাতের নামায ছেড়ে গেলে তিনি দিনে বার (১২) রাকআত নামায পড়তেন (মুসলিম, আবু দাউদ, কানযুল ওমমাল, ৭ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)।

ওমর (রযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতের কোন অযীফা কিংবা বিশেষ কোন আমল থেকে ঘুমিয়ে পড়ে সে যদি ফজর এবং যোহরের নামাযের মাঝখানে তা পড়ে তাহলে সে যেন রাতে ঐ আমল করলো (মুসলিম, মিশকাত, ১১০ পৃষ্ঠা)।

### বিত্রের পর তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ম

নাবী (সঃ) বলেন, তোমরা রাতে তোমাদের শেষ নামাযটি বিত্র বানাও (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার ভয় খায় সে যেন (এশা বাদ) বিত্র পড়ে নেয়। আর

যে ব্যক্তি শেষ রাতে ওঠার আশা রাখে সে যেন শেষ রাতে বিত্ৰ পড়ে। কারণ, শেষ রাতের নামাযের বিশেষ সাক্ষ্য দেওয়া হয়। সুতরাং এটাই উত্তম (মুসলিম, মিশকাত, ১১ পৃষ্ঠা)।

দুটোই হাদীস প্রমাণ করে যে, শেষরাতে বিত্ৰ পড়া উত্তম। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষরাতে উঠতে পারবে না সে যেন প্রথম রাতে বিত্ৰ পড়ে নেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি যদি এশা বাদ বিত্ৰ পড়ে নেয় এবং শেষরাতেও তার ঘুম ভাঙে। ফলে সে তখন যদি তাহাজ্জুদ পড়তে চায় তাহলে সে কি করবে? যদি সে তাহাজ্জুদ পড়ে তাহলে রাতের শেষ নামায বিত্ৰ হয় না। আর যদি সে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং বিত্ৰও পড়ে তাও সেটাও ঠিক হয়না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, একই রাতে দুবার বিত্ৰ নেই (মুসনাদে আহমাদ, নাসারী, তিরমিযী, বুলুগুল মারাম, ২৭ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আলেমদের, দুটি মত আছে। কিছু আলেমের মতে এক রাকআত নামায নফলের নিয়্যাতে পড়ে বিত্ৰটি ভেঙে দিতে হবে এবং তারপর তাহাজ্জুদ পড়ে সবশেষে আবার বিত্ৰ পড়তে হবে। অন্যদল বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিত্ৰের পর বসে দু রাকআত নফল পড়েছেন (আহমাদ)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, বিত্ৰ পড়ার পর আর বিত্ৰ হবে না বটে, তবে রসূলুল্লাহর ঐ দু রাকআত নফলের ভিত্তিতে যে কেউ যত রাকআত নফল পড়তে চায় জোড়া জোড়া পড়তে পারে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। তিরমিযী শরীফের অতুলনীয় ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারপূরী (রহঃ) বলেন, বিত্ৰ ভাঙার ব্যাপারে আমি কোন সহী হাদীস পাইনি (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং এই মতে এশা বাদ বিত্ৰ পড়ার পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে এবং তাহাজ্জুদের পর আর বিত্ৰ পড়তে হবে না। বরং প্রথম রাতের বিত্ৰ শেষরাতেও বহাল থাকবে। চার ইমাম ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত তাই (ঐ, পৃষ্ঠা—ঐ)।

## রাতের ইবাদতের খেসারত দিনে

আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন রাতের ইবাদতের কিছু নামায পড়তে পারতেন না তখন তিনি দিনে বার (১২) রাকআত নামায পড়তেন (মুসান্নাফ আব্দুর রায়যাক ৩র খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার অযীফা থেকে ঘুমিয়ে পড়লো কিংবা তার রাতের ইবাদতের কিছু থেকে শুয়ে পড়লো তারপর সে ফজর ও যোহর নামাযের মধ্যে তা পড়লো সে যেন রাতেই তা পড়লো (ঐ—৫০ পৃষ্ঠা)।

অতএব কারো রাতের অযীফা কিংবা নফল নামায ছাড় গেলে তিনি তা পরদিন ফজর থেকে যোহরের মধ্যে পড়লে ঐ নেকীই পেতে পারেন। তবে প্রত্যেক দিন এরূপ হবে না। বরং কখনো কখনো চলতে পারে।

## তারাবীহের বিবরণ

রমাযান ছাড়া বাকী এগারো মাসে অর্ধেক রাতের পর যে নামায পড়া হয় তাকে হাদীসে সলা-তুল লায়ল, কিয়ামুল লায়ল ও তাহাজ্জুদ বলা হয়েছে এবং রমাযানের রাতে যে নামায পড় হয় তাকে কিয়ামে রমাযান নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং কিয়ামে রমাযান ও তাহাজ্জুদ একই নামাযের বিভিন্ন নাম। রমাযানের রাতে যে নামায পড়া হয় তা প্রায়ই জামাআত কোরে পড়া হয় এবং এর কেরাআতও একটু লম্বা হয়। ফলে চার রাকআত নামায পড়ার পর সবাই একটু দম নেয় এবং আরাম করে। ঐ জিরিয়ে নেওয়াকে আরবীতে তারাবীহাতুন বলে। যার বহুবচন তারাবীহ। এই তারাবীহ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে কোন নামাযের নামের সাথে যুক্ত পাওয়া যায় না। রমাযানের রাতের নামাযে মুসল্লীরা চার রাকাতের পর একটু আরাম করে নেয় বলে ওলামায়ে কিরাম ঐ নামাযের নাম তারাবীহ দিয়েছেন। সুতরাং এগার মাস যার নাম তাহাজ্জুদ রমাযানে তারই নাম তারাবীহ।

দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ১১ মাস তাহাজ্জুদ মাঝরাতের আগে চলে না, কিন্তু রমাযানে চলে। আর ১১ মাস তাহাজ্জুদ জামাআত কোরে



পড়া হয় না, কিন্তু একমাসে তারাবীহ জামাত কোরে পড়া হয়, কোন হাদীস দ্বারা জানা যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানে তারাবীহ ও তাহজ্জুদ দুইই পড়ছেন। তেমনি কোন হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, তারাবীহ ও তাহজ্জুদ দুটো আলাদা আলাদা নামায। রমযানে রোযা রাখার কারণে রোযাদারদের শরীর কাহিল ও দুর্বল হোয়ে যায়। তার উপরে ইফতার ও রাতের খাবার খেয়ে এশা পড়ে শুয়ে আবার মাঝরাতে উঠে তাহজ্জুদ পড়া বেশ কষ্টকর হয় বলে করুনার ছবি মহানবী (সঃ) রমযানে তাহজ্জুদ নামাযটিকে এশা বাদ পড়ে তারাবীহের রূপ দান করতঃ তাঁর উম্মতের উপর বিরাট এহসান করেছেন। যাতে তাঁর উম্মতরা এশা বাদ তারাবীহ পড়ে মজায় ঘুমিয়ে এবং ফজরের কিছু আগে উঠে সাহারী খেয়ে রোযা রাখার জন্য আবার তাজা হোয়ে যায়।

### তারাবীহের ফযীলত

তারাবীহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহর নাবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযাকে ফরয করেছেন এবং আমি তার কিয়ামকে (অর্থাৎ তারাবীহকে) সুন্নত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রমযানে রোযা রাখে এবং রাতে নামাযে দাঁড়ায় সে মায়ের পেট থেকে পয়দা হবার মত সমস্ত গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হোয়ে যায় (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ, ৯৫ পৃষ্ঠা, নায়লুল আওতার, ২য় খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)।

এইজন্যই মনে হয় একশো বিশ (১২০) বছরের বৃদ্ধ সুঅয়দ ইবনে গাফলাহ রমযান মাসে রাতে (তারাবীর) ইমামতি করতেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)। রাফেযী ছাড়া আর কোন ফের্কা তারাবীহ অস্বীকার করেনা (মাবসুত, ২য় খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)।

সাহাবী সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযাকে করেছেন এবং তার রাতের কিয়ামকে (তারাবীহকে) নফল করেছেন। ঐ মাসে যে ব্যক্তি কোন নফল কাজ করে সে যেন অন্য মাসে কোন ফরয কাজ করে (বায়হাকীর শোআবুল ইমান, মিশকাত, ১৭১ পৃষ্ঠা)।

এই বরীফ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, তারাবীর নামায পড়লে অন্য মাসের ফরয নামাযের সমান নেকী পাওয়া যায় এবং আগের সহীহ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, তারাবীহ পড়লে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়। এটা হল একা একা তারাবীহ পড়ার সওয়াব।

কিন্তু কেউ যদি জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়ে তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সালাম না ফেরা পর্যন্ত ইমামের সাথে জামাআতে (তারাবীর) নামায পড়ে তার জন্য রাতভোর নামায পড়ার নেকী লেখা হয় (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, ১১৪ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ আমাদেরকে জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়ার তওফীক দিন — আমিন।

### মেয়েদেরও তারাবীহ পড়া সুন্নত

আরফাজাহ বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) লোকদেরকে রমযান মাসে রাতে নামাযের জন্য হুকুম দিতেন এবং পুরুষের জন্য একজন ইমাম ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। আমি মেয়েদের ইমাম হতাম (বাইহাকী, কানযুল ওম্মা-ল, ৮ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মেয়েদেরও তারাবীর জামাআত হোত। সুতরাং পুরুষদের মত মেয়েদেরও তারাবীহ পড়া সুন্নত (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)।

### তারাবীর নামায কয় রাকআত?

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানে কয়েক রাত জামাআত কোরে তারাবীহ পড়েছিলেন। এছাড়া কুতুবে সিভার অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সঃ) কয়েক রাতে জামাআত কোরে তারাবীহ পড়েছিলেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোতে একথার উল্লেখ নেই যে, তিনি তখন কয় রাকআত তারাবীহ পড়ছিলেন। এই অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, জা-বির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানে মাসে আমাদেরকে নিয়ে ৮ রাকআত (তারাবীহ)

ও বিতর নামায পড়ান (তাবারানী সগীর, আবু ইয়ালা, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা, কিয়ামুল লায়ল, মিরআত, ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

একদা আয়েশা (রযিঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল যে, রমযানে রসূলুল্লাহ নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, রমযান ও রমযান ছাড়া অন্য মাসেও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামায ১১ রাকআতের বেশী ছিল না। ৪রাকআত কোরে ৮রাকআত (তারাবীহ) এবং ৩ রাকআত (বিতর)— (বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)। সাহেব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, খলীফা ওমর ফারুক (রাযিঃ) উবাই ইবনে কাব ও তামীমদারী নামক দুই সাহাবীকে রমযান মাসে ১১ রাকআত (তারাবীর) জামাআত পড়বার হুকুম দিয়েছিলেন (মুঅত্তা ইমাম মালিক, ৪০ পৃষ্ঠা, মিশকাত, ১১৫ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা আইনী হানাফী বলেন, তারাবীর নামায কয় রাকআত সে সম্পর্কে আলেমদের অভিমত কয়েক প্রকার পাওয়া যায়। যেমন ৪১ রাকআত বিতরসহ। ৩৯ রাকআত। ৪৭ রাকআত, (বিতর ৭ রাকআত)। ৩৬ রাকআত (বিতর ৩ রাকআত)। ২৮ রাকআত। ২০ রাকআত ও ১১ রাকআত (উমদাতুলকারী, ১১ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

এই সমস্ত রিওয়াযাত সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, কেবলমাত্র ১১রাকআতের রিওয়াযাতটি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে সহীহ সনদে পাওয়া যায় এবং খলীফা ওমরও এই ১১ রাকআতের হুকুম দিয়েছিলেন। আর বাকী কোন একটি রিওয়াযাতও রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এবং খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে সহীহ সনদে পাওয়া যায় না।

আল্লামা নিমুত্তী হানাফী বলেন, বায়হাকীর বরাত দিয়ে ২০ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে খলীফা উসমান ও খলীফা আলীর যুগের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা ভুল। কারণ, বায়হাকীর কোন গ্রন্থেই 'উসমান ও আলীর যুগের কথা পাওয়া যায় না। (তালীক আলা আসা-রিস্ সুনান, মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)।

মুঅত্তা ইমাম মালিকে এই রিওয়াযাতও পাওয়া যায় যে, ওমর (রযিঃ)

নাকি ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। এ রিওয়াযাতটি সহীহ নয়, বরং সবারই মতে যরীফ এবং এই রিওয়াযাতটি মুঅত্তার অন্য সহীহ ১১ রাকআতের বিপরীত। তাই মুহাদিসীনে কিরামের নিকট এটি আমলের অযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য এবং রিওয়াযাতটির মতন শব্দের হেরফের দোষে দুষ্ট বলে পরিত্যাজ্য। দেওবন্দের সবচেয়ে কৃতিছাত্র ও ওস্তাদ এবং ভারত বিখ্যাত মনিষী আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, ২০রাকআত সম্পর্কে যতগুলো হাদীস আছে সবগুলোর সনদই যরীফ। ঐগুলোর যরীফ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুহাদিসগণ একমত (আলআরফুশ শাযী ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী (রহঃ) আবু মিজলায থেকে ৬ রাকআত তারাবীহ পড়ার একটি রিওয়াযাত বর্ণনা করেছেন (কিয়ামুল লাইল ৯২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এই রিওয়াযাতটি মওকুফ এবং সহীহ মরফু রিওয়াযাতের বিপরীত বলে পরিত্যাজ্য। ১৩ রাকআতেরও একটি রিওয়াযাত পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ রাকআত সবই তারাবীহ নয়। বরং অন্যান্য রিওয়াযাত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, ঐ ১৩র মধ্যে তারাবীহ ৮ রাকআত এবং বিত্র ৩ রাকআত আর ফজরের সুন্নত ২ রাকআত।

হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ বাহরুর রা-য়িক শারহে কানযুন দাকা-য়িকে লেখা আছে:- নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকাল পর্যন্ত ১১ রাকআতেরই উপরে তাঁর আমল ছিল।

### হানাফী মতে বিশ রাকআতের অবস্থা

কিছু ভায়েরা বায়হাকী, তাবারানী ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়েন। ঐ রিওয়াযাত সম্পর্কে হানাফী ফিকহের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিদাযার ব্যাখ্যালেখক আল্লামা ইবনুল হমাম বলেন, উক্ত হাদীসটি দুর্বল এবং বুখারী মুসলিম রিওয়াযাতকৃত সঠিক ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী (ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)। সুতরাং এ বিষয়ের ফলকথা এই যে, রমায়ানের রাতে সুন্নত হল বিত্র সমেত এগার (১১) রাকআত নামায (ঐ)। তাই বিশ রাকআতের মধ্যে আট রাকআত সুন্নত হবে এবং বাকি (বার রাকআত) হবে নফল (ঐ)।

হিদায়াতে বর্ণিত হাদীসসমূহের ভুলত্রুটি যাচাইকারী হানাফী পণ্ডিত আল্লামা যায়লায়ী (রহঃ) বলেন, বিশ রাকআতের হাদীসটি যযীফ হবার সাথে সাথে আয়েশা বর্ণিত সহীহ হাদীসের (এগার রাকআতের) বিরোধী (নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা তাহতাত্তী ও আল্লামা আবুস্‌সউদ হানাফী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ রাকআত পড়েননি, বরং আট রাকআত পড়েছেন (তাহতাত্তী হাশিয়া দুররে মোখতার ১ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা মিসরী ছাপা, এবং ফাতহুল মুয়ীন শারহে কান্ব, ২৬৫ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা হামাভীর আল আশবাহ অন্নাযা-য়িরের বরাতসহ)।

আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিশ (২০) রাকআত প্রমানিত নেই। যেমন তা বাজারে প্রচলিত। কিন্তু ইবনে আবী শায়বার রিওয়ায়াতে যে বিশ রাকআত আছে তা যযীফ এবং সহীহ হাদীসের বিপরীত (ফাতহ সিররিল মান্নান লিতা-য়ীদি মাযহাবিন নুমান, ৩২৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, আট (৮) রাকআতের সুন্নত হওয়াটা দলীল মোতাবেক (রদ্দে মুহতার হাশিয়া দুররে মুখতার ১ম খণ্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা)। বাহরুর রা-য়িক ২য় খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠায়ও আছে যে, তারাভীহ (৮) রাকআত সুন্নত।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) বলেন, এগার রাকআত সরওয়ায়ে দোআলম (সঃ) এর কর্ম দ্বারা প্রমানিত এবং বিশ রাকআতের তুলনায় তা জোরদার (ফুযুযে কা-সিমিয়াহ, ১৮ পৃষ্ঠা)।

দেওবন্দী হানাফী আলেমদের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিদ্বান আল্লামা আন্বর শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, তের রাকআতের বেশী তারাভীর নামায প্রমানিত নেই, তবে একটি দুর্বল হাদীস ছাড়া (ফাইয়ুল বারী, ২য় খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা)।

হানাফী জগতের বড় মুহাদ্দিস এবং তবলীগ জামাতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, বিশ (২০) রাকআত তারাভীহ নির্দিষ্টরূপে নাবী (সঃ) থেকে মরফুভাবে মুহাদ্দিসীনে কিরামের তরীকা অনুযায়ী

প্রমানিত নেই এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহও নেই (আওজাযুল মাসালিক শারহে মুঅত্তা ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমানিত হল যে, বুখারীর রিওয়াযাত অনুযায়ী রমাযান ও গায়র রমাযানে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায ১১ রাকআতই।

ইবনে আবী শায়বায় বর্ণিত বিশ রাকআত তারাবীর হাদীসটিতে একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন, যে, খলীফা ওমর (রযিঃ) বিশ (২০)রাকআত পড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে এক হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা শওক নিমভী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ এবং ওমরের মৃত্যুর মাঝে ১০৯ বছরের ব্যবধান। অতএব যিনি ওমরের যুগে পয়দাই হননি তিনি ওমরের নির্দেশের কথা কিভাবে বলেন? সেই সাথে তাঁর এই বর্ণনাটি সহী হাদীসের বিপরীত।

আল্লামা আইনী হানাফী বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, যে বর্ণনাগুলোতে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর তারাবীহ পড়ানোর বর্ণনা আছে, তাতে তো রাকআতের উল্লেখ নেই? আমি বলবো, ইমাম ইবনে খুযাইমাহ ও ইবনে হিব্বান জাবের রাযিয়ায়াল্লাহু আনহুর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে রমাযানে আট (৮) রাকআত নামায পড়ান (উমদাতুল কারী ৭ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, মুনীরিয়াহ ছাপা)।

আল্লামা আন'অর শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, একথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নাবী (সঃ) এর তারাবীহ আট (৮) রাকআত ছিল (আল আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, হানাফী শায়খদের কথা দ্বারা বিশ রাকআত তারাবীহ বোঝা যায়, কিন্তু দলীলের তাগিদ, বিতর সহ এগার (১১) রাকআত তারাবীহ ঠিক (মিরআত ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)।

হানাফী ফিক্হ নুরুল ঈযাহের ব্যাখ্যাকারী বলেন, ইবনে আবী শায়বা, তাবারানী ও বায়হাকীতে ইবনে আব্বাস বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিশ রাকআত পড়া হাদীসটি যয়ীফ (মারাকিল ফালাহ- ২২৪ পৃষ্ঠা)।

এই গ্রন্থের টীকাকার আল্লামা তাহতাভী বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিত্বের সহ মাত্র এগার (১১) রাকআত তারাভীহ প্রমানিত আছে (ঐ পৃষ্ঠার ৮নং টীকা)।

হানাফী ফিক্হ কানযুদ দাকা-য়িক এর টীকাকার মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান নানুতবী বলেন, নাবী (সঃ) বিশ রাকআত তারাভীহ পড়েনি, বরং আট রাকআত পড়েছেন (হাশিয়া কানযুদ দাকা-য়িক ৩৬ পৃষ্ঠা)।

বুখারী শরীফের টীকাকার মাওলানা আহমাদ আলী সাহারনপুরী বলেন, বিত্বের সহ রমাযানের কিয়াম (তারাভীহ) (১১) এগার রাকআত জামাআত সহকারে। নাবী (সঃ) তা করেছিলেন (বুখারী ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩নং টীকা)।

নিম্নলিখিত হানাফী গ্রন্থসমূহেও মন্তব্য করা হয়েছে যে, বিশ রাকআত. তারাভীহ পড়ার হাদীস দুর্বল ও আমলের অযোগ্য (আবুত তাইয়িব মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কাদের সিদ্ধি হানাফী কৃত শারহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা, শায়খ মুহাম্মাদ থানভী হানাফীর হাশিয়া নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, মুজতাবারী ছাপা, মুফতী আযীযুর রহমানের ফাতা-ওয়া দা-রুল উলুম দেওবন্দ ২য় খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)।

বিশ রাকআত তারাভীহের প্রমানে বর্ণিত হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবু শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমানকে দুর্বল এবং বিভিন্ন দোষে দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছে এই সব গ্রন্থসমূহে :- ইমাম নবভীর শারহে মুসলিম ১৭ পৃষ্ঠা, হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানীর তাহযীবুত তাহযীব ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, আদদিরায়াহ ১২৩ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, ইবনে হাজার হায়সামীর আলফাতা-ওয়াল কুবরা ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, আল্লামা সুয়ুতীর তানতীরুল হাওয়ালিক ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, মুঅত্তার শারহে যুরকানী ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, সুবুলুস সালাম ২য় খণ্ড, ১০ম পৃষ্ঠা, ইমাম শওকানীর নায়লুল আওতা-র ৩য় খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা। সুতরাং বিশ রাকআত তারাভীহ নাবী (সঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের সুন্নত নয়। বরং এটা কিছু মযহাবপন্থী আলেমের সীমিত জ্ঞানের ফতওয়া।

তাই শায়খুল হাদীস মাওলানা মোঃ ইউনুস কুরায়শী দেহলভী (রহঃ)

বলেন, বিশ (২০) রাকআত তারাযীহ খাস কোরে কোন সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয়না। এ ব্যাপারে যে রিওয়াযাতটি ইবনে আবী শায়বার হাওয়ালা দিয়ে হানাফী ভায়েরা পেশ করেন তা দুর্বল। আল্লামা যায়লাযী হানাফী এবং হিদাযার ব্যাখ্যাকার ইবনুল হুমাম ওটিকে অত্যন্ত যয়ীফ বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়। তবে হাঁ, খুলাফায়ে রাশিদীনের পর কিছু সাহাবী এবং তাবয়ী থেকে তের রাকআতেরও বেশী পড়ার প্রমান পাওয়া যায়। এইজন্য যদি কেউ কখনো তের রাকআতেরও বেশী চল্লিশ রাকআত পর্যন্ত পড়ে ফেলে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বিশ ও তেইশ রাকআত নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। কারণ, এই আমলের বিদআত হোয়ে পড়ার ভয় আছে (দস্তুরুল মুত্তাকী, ১১৫ পৃষ্ঠা)।

### তারাযীহের জামাআত ও তার সময়

সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ মসজিদে রমায়ানের রাতে ভিন্ন ভিন্ন দলে (তারাযীর) নামায পড়তেন। তাদের মধ্যে যিনি কোরআনের কিছু হাফেয হতেন তার সাথে পাঁচ কিংবা ছয় অথবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী লোক নামায পড়তেন। মা আয়েশা বলেন, ঐ সময় এক রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার হুজরার দরজায় একটি চাটাই টাঙিয়ে দিতে বললেন। আমি তাই করলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এশার পড়ার পর ঘর থেকে বের হলেন। তখন মসজিদে যারা ছিলেন তারা তাঁর কাছে জড় হল। ফলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত ধরে (তারাযীর) নামায পড়লেন (মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড, ৭-৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তারাযীর জামাআত করেছিলেন এবং তা এশার জামাআত শেষ কোরে নিজ ঘরে সুন্নত ইত্যাদি পড়ার পর ঐ জামাআত করেছিলেন।

আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একুদা রমায়ানে অর্ধেক রাতে বের হলেন, অতঃপর মসজিদে নববীতে নামায পড়লেন এবং কিছু লোকও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর সকালে তারা আলোচনা করায় ২য়



রাতে আরো লোক জড় হ'ল। ফলে তিনি নামায পড়লেন। সমবেত সাহাবীরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর সকাল বেলায় আলোচনা হওয়ায় ওয় রাতে আরো বেশী লোক জড় হ'ল। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) মর থেকে বের হলেন এবং সবাইকে নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর ৪র্থ রাতে এত লোক জড় হ'ল যে, মসজিদে জায়গা হোল না। ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে মর থেকে বের না হয়ে ফজরের সময় বের হলেন এবং ফজরের নামায পড়ে বললেন, তোমাদের রাতের অবস্থা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমি ভয় পেলাম যে, (তারা'বীর) নামায যদি তোমাদের উপর ফরয হোয়ে যায় তখন তোমরা যদি তা আদায় করতে অক্ষম হোয়ে পড়? অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মৃত্যু পর্যন্ত ঐরূপ চলতে থাকে (বুখারী ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটি প্রমান করে যে, তারা'বীর জামাআত এশার পর না কোরে অর্ধেক রাতেও তা শুরু করা যেতে পারে। এর দ্বারা এও প্রমানিত হয় যে, তারা'বীর নামায ফরয হোয়ে গেলে উম্মতের কষ্ট হবে বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) গোটা রমাযানে জামাআত কোরে তারা'বীহ পড়েনি। বরং কয়েক রাত পড়ে সুন্নত জারী কোরে গেছেন। আবু হুরাইরার রিওয়াযাতে আছে, রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর থেকে খলীফা আবু বাকরের যুগে এবং খলীফা ওমরের যুগে প্রথম দিক পর্যন্ত ব্যাপারটি ঐরূপ চলতে থাকে (মুসলিম, মিশকাত, ১১৪ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ কেউ বিনা জামাআতে একা একা, কেউ শেষ রাতে, কেউ ঘরে, কেউ মসজিদে, বিক্ষিপ্তভাবে তারা'বীর নামায পড়তে থাকে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)।

তাবাকাত ইবনে সা'দে আছে, আগে তারা'বীর অবস্থা ঐরূপ ছিল যে, কোথাও ৪ জনের, কোথাও ১০ জনের দল নামায পড়তো। যে কারী ভাল সুরে পড়তে পারতো তার সাথে মুসল্লীদের সংখ্যা বেড়ে যেত। তার চেয়ে যদি কোন ভাল কারী এসে পড়তো তাহলে লোকেরা পুরানোকে ছেড়ে দিয়ে নতুনের সাথ ধরতো। এরূপে একটা বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছিল এবং লোকদের মধ্যেও একটা কুপ্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই ওমর (রযিঃ) এক সাহাবী উবাই ইবনে কা'বের ইমামতীতে জামাআত সহকারে তারা'বীহ

পড়ার হুকুম জারী করেন (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৫ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, নামায কে আহকাম ওয়া মাসায়েল, ১৩৮ পৃষ্ঠা)।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেন, একদা (১৪ হিজরীর রমায়ান মাসের রাতে) আমি খলীফা ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে মসজিদে (নববীতে) গেলাম। অতঃপর লোকদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখলাম। কেউ একা নামায পড়ছে। কারো সাথে কিছু লোক জামাআত করছে। ঐ বিশৃঙ্খলাভাব দেখে খলীফা ওমর (রযিঃ) বললেন, আমি যদি সবাইকে এক কারী ইমামের পেছনে জমা করে দিই তাহলে খুব ভাল হোত। তারপর তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'বের পেছনে জমাআত করালেন। পরের রাতে তিনি আবার মসজিদে এলেন এবং সবাইকে একটি কারীর পেছনে জামাআতে নামায পড়তে দেখে বললেন, কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা। তবে হাঁ, (শেষরাতে তাহাজ্জুদের) যে নামায থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে তা এই (তারাবীহ) থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছো। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়তো (বুখারী, মিশকাত, ১১৫ পৃষ্ঠা)।

উক্ত সমস্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত হয় যে, রমায়ানের প্রথম রাতে কয়েক রাত জামাআত সহকারে তারাবীহ পড়া রসূলুল্লাহ সুনত এবং তিন খুলাফায়ে রাশেদীন ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতে মাসভোর জামাআতে তারাবীহ পড়া সুনত।

কারণ, নাবীজীর এন্তেকাল ও আবু বাকরের মৃত্যুর পর ওমর (রযিঃ) যখন খলীফা হন তখন তারাবীহ ফরয হবার আশংকা না থাকায় তিনি ১৪ হিজরীতে একজন হাফেযে কুরআন ইমামের পেছনে ছোট ছোট তারাবীর জামাআতগুলোকে একটি বিরাট জামাআতে পরিণত করেন (আওনুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সারা জাহানে ঐ নিয়মই চলে আসছে।

### জামাআতে তারাবীহ ও একা তাহাজ্জুদ

বিভিন্ন হাদীস ও ওমরের উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, রমায়ান মাসেও এশা বাদ তারাবীহ পড়ার চেয়ে শেষরাতে জামাআত

কোরে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম। কলকাতা মেটিয়ারক্জের প্রথম আহলে হাদীস জা-মে মসজিদ হাওলদার পাড়া জামে মসজিদে আমার দাদাদের যুগে ইং ১৯২০-৪০ সালে রমাযানের শেষ রাতে জামাআত কোরে তাহাজ্জুদ পড়া হোত। এখনো মেটিয়ারক্জের আহলে হাদীস মসজিদগুলোতে শবেকদরের পাঁচটি রাতে জামাআত সহকারে তাহাজ্জুদ পড়া হয়। তাই একটা প্রশ্ন এই ওঠে যে, এশা বাদ জামাআতে তারাবীহ পড়া উত্তম, না এশার পরে তারাবীহ শেষরাতে একা একা তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম?

এ ব্যাপারে সর্বকালের অন্যতম সেরা মনিযী ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, এশা বাদ তারাবীহ পড়া সুন্নত। রাফেযীরা তারাবীহকে মকরুহ ও আপত্তিকর মনে করে। জামাআতের সওয়াব পাবার উদ্দেশ্যে এশার পরে তারাবীহ পড়া শেষরাতে একা একা তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে উত্তম (মুখতাসার ফাতা-ওয়া মিসরিয়াহ, ৮১ পৃষ্ঠা, নামায কে আহকাম ওয়া মাসা-য়েল, ১৩৯ পৃষ্ঠা)।

### তারাবীহতে কুরআন খতম

রসুলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে রাতের নামায ফরয হোয়ে যাবার ভয়ে রমাযানের রাতে মাসভোর তারাবীহ হয়নি। সেজন্য নাবীজীর যুগে তারাবীতে কুরআন খতমের প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁর (সঃ) পর খলীফা আবু বাকরের যুগে তারাবীর জামাআতের প্রচলন হয়নি। সুতরাং ঐ যুগে খতম তারাবীর কথাই ওঠে না। অতঃপর খলীফা ওমরের যুগে তারাবীর জামাআত চালু হলে তখনও খতম তারাবীহ হয়েছিল কিনা আমি কোন প্রমান পাইনি। তবে ওমর ফারুক (রাযিঃ) যে-দুজনকে তারাবীর ইমাম মনোনীত করেছিলেন তাঁরা দুজনেই কুরআনের হাফেয ছিলেন। ইবনে সীরীনের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত দুই ইমামের একজন ইমাম তামীম দা-রী (রাযিঃ) একবার এক রাকআতে পুরো কুরআন খতম করেছিলেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)।

সায়ীদ ইবনে জোবায়ের তাঁর বাড়ীতে এক রাকআতে এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরও এক রাকআতে কোরআন খতম করেছিলেন (তাহাভী, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা)। তাবিযী মোজাহেদ বলেন, আলী আযদী রমাযানের

প্রত্যেক রাতে কোরআন খতম করতেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)।

আবদুর রহমান ইবনে উসমানের বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, খলীফা উসমান গনীও একদা রাতে এক রাকআতে গোটা কোরআন খতম করেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি এক রাকআতেই শেষ করে দিলেন? তিনি বললেন, এটা আমার বেতরের নামায ছিল (বায়হাকী, ৩য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)। উক্ত বর্ণনাগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, সাহাবায়ে কিরামের কেউ বেতরে এবং কেউ নফল নামাযে কোরআন খতম করেছিলেন।

সাহাবী হোযায়ফা বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে চার (৪) রাকআত নামায পড়েন। তাতে তিনি সূরায় বাকারহ্ ও আলে ইমরান, এবং নিসা ও মা-য়িদা কিংবা আনআ-ম সূরাগুলো পড়েন (আবু দাউদ, মিশকাত, ১০৭ পৃষ্ঠা)।

উক্ত চারটি সূরা ছয় পারারও বেশী। সুতরাং তিনি (সঃ) প্রতি রাকআতে গড়ে দেড় পারারও বেশী পড়েন। আরাজ বলেন, (আমাদের যুগের) কারী আট (৮) রাকআতে সূরা বাকারা পড়তেন। আর যখন তিনি (১২) বার রাকআতে ঐ সূরাটি পড়তেন তখন লোকেরা মনে করতো যে, তিনি খুব হাক্কা পড়েছেন (মুত্তা মালেক, মিশকাত, ১১৫ পৃষ্ঠা)।

সূরা বাকারা প্রায় আড়াই পারার মত। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবী ইমাম নাবী (সঃ) এর অনুকরণে তারাবীতে লম্বা কেরাআত ধরতেন এবং আট (৮) রাকআতে দু'পারারও বেশী পড়তেন।

নামাযের মধ্যে কোরআন তেলাঅতের ফযীলত সম্পর্কে একদা নাবী (সঃ) বলেন, নামাযের বাইরে কুরআন তেলাঅতের চেয়ে নামাযের ভেতরে কুরআন পড়া উত্তম এবং তসবীহ ও তকবীর পড়ার চেয়ে নামাযের বাইরে কুরআন তেলাঅত উত্তম এবং দান খয়রাতের তুলনায় তসবীহ পড়া উত্তম আর রোযার তুলনায় দান খয়রাত উত্তম এবং রোযা হল জাহান্নামের আগুন থেকে বাচার ঢালস্বরূপ (বাইহাকীর শুআবুল ইমান, মিশকাত, ১৮৮ পৃষ্ঠা)।

অনত্রে তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে দশটি আয়াত পড়ে তার নাম গাফেল ও ভোলাদের মধ্যে লেখা হয়না এবং যেব্যক্তি নামাযে একশোটি আয়াত পড়ে তার নাম একনিষ্ঠ এবাদতকারীদের মধ্যে লেখা হয়। আর যেব্যক্তি নামাযে এক হাজার আয়াত পড়ে তার নাম (উহুদ পাহাড় সমান) অটেল নেকী অর্জনকারীদের মধ্যে লেখা হয় (আবু দাউদ, মিশকাত, ১০৭ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, নফল নামাযে কোরআন যত বেশী পড়া যায় ততই লাভ। রমাযান মাস নেকীর ঝড়ের মাস এবং কুরআন অবতরনের মাস। সুতরাং রমাযানে যত বেশী কুরআন পড়া হবে ততই ঝড়ো নেকী কুড়ানো যাবে। আবার ঐ কুরআন যদি নফল নামাযে যেমন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে পড়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তদুপরি তারাবীতে যদি গোটা মাসে কুরআন খতম করা যায় তাহলে কুরআন নাযেলের গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং অসংখ্য নেকীও পাওয়া যায়। আমার মনে হয় উক্ত ধারনাবলী সামনে রেখে তারাবীতে কুরআন খতমের প্রচলন শুরু হয়েছে।

### খতম তারাবীহ ফরয ও সুন্নত নয়

কুরআনের কোন আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা একথা প্রমানিত হয়না যে, তারাবীহতে কুরআন খতম করা ফরয কিংবা সুন্নত। এই খতম তারাবীহ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেরীনে ইযামের জারী করা সুন্নত কিনা তাও জানা যায়না। অতএব প্রত্যেক রমাযানে তারাবীহতে কুরআন খতম করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তথাপি কিছু কিছু মুসলমান তারাবীর জামাআতে কুরআন খতমকে ফরযের মত মনে করে এবং খতমের জন্য কখনো কখনো হাফেয না পাওয়ার ফলে কোন ব্যবসায়ী হাফেযকে ধরে কমপক্ষে (৩) তিনদিনে কিংবা পাঁচ-সাত দিনে তারাবীতে খতমে কোরআনের আপ্রান চেষ্টা করে। ফলে কোন কোন মসজিদে মুসল্লীদের নামাযে দাঁড়াতে কষ্ট হবে বলে ঐরূপ হাফেযরা বসে বসে কুরআন শোনায় এবং নামমাত্র আধপারা কোরে নামাযে পড়ে কুরআন খতম করতঃ নযরানা নিয়ে অন্য মসজিদে লাইন দেয়। এরূপ করলে উক্ত

রূপ মুসল্লী এবং হাফেযগণ গোনাহগার হবেন না কি? আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন!

ইমাম হাসান বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তারাবীহের প্রত্যেক রাকআতে দশটি এবং ঐরূপ আয়াত পড়তেন। কারণ, তারাবীহতে একবার কুরআন খতম সূন্নত। আর এটা সহজেই অর্জিত হয় দশটি করে আয়াত প্রতি রাকআতে পড়লে। কারণ, (হানাফী মতে) তারাবীহ বিশ রাকআত হিসেবে গোটা রমায়ানে ছয়শো রাকআত হয়। আর কুরআনের আয়াত সংখ্যাও ছয় হাজার এর কিছু বেশী (শামী ১ম খণ্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা)।

অতএব হানাফী সমাজের যারা গোটা মাসে নয়, বরং দশ-বার দিনে তারাবীহতে কুরআন খতম করেন তাঁরা তাদের ইমামকেও মানেন কি?

### তারাবীহ চলাকালীন বিশেষ দুআ

মুসলমানদের একটি দল তারাবীহের নামায চার চার রাকআত পড়ার পর একটি দুআ পড়েন। তা হল:-

‘সুবহানা যিল মুলকে অল মালাকূত.....মালায়েকাতে অররুহ।

তারাবীহ চলাকালীন এই দুআসহ অন্য কোন দুআ পড়ার প্রমান রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাওয়া যায় না।

তবে আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) যখন তাবাবীহের মাঝে বসতেন তখন এই শব্দগুলো বারংবার পড়তেন:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ☆

উচ্চারণ:- লা-ইলা হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ লা-শারীকা লাহ০  
আস্তাগফিরুল্লা-হাল লাহী লা-ইলা-হা ইল্লা-হু।

তরজমা:- কোন উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। যাঁর কোন অংশীদারই নেই, আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই (বাদা-য়িউল ফাওয়া-য়িদ, ৪র্থ খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

একথা প্রসিদ্ধ যে, ইমাম আহমাদের অযীফা ও ফাতাওয়াগুলো কোন

না কোন হাদীস বা সাহাবীদের আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত হোত। সেজন্য কেউ যদি তাঁর আমলকৃত উক্ত দুআটি তারাবীহের মাঝে পড়তে চান তাহলে তা পড়তে পারেন। একথা বলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আতাউল্লাহ হানীফ ভুজয়ানী (রহঃ) (বেনারসের মাসিক পত্রিকা মুহাদ্দিস, জুন-জুলাই, ১৯৮৩ সংখ্যা ২২ ও ২৩ পৃষ্ঠা)।

### ইশরাকের নামায

আরাবী ইশরাক শব্দের অর্থ আলোকিত হওয়া। সূর্য ওঠার পর জগত আলোকিত হয় বলে সূর্যোদয়ের পর যে নামাযের ইঙ্গিত বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায় মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায় তার নাম সলা-তুল ইশরাক বা ইশরাকের নামায। এই নামাযের নামের সাথে ‘ইশরাক’ শব্দটি দুনিয়ার কোন হাদীসে পাওয়া যায়না। এই নামটি তারাবীহের মত ওলামায়ে কিরামের আবিষ্কার। ইবনুল আরাবী বলেন, মুহাম্মাদ (সঃ) এর আগে এই নামাযটি অন্যান্য নাবীদের নামায ছিল। যেমন দাউদ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন, আমি পাহাড়গুলোকে তার বশ করে দিয়েছিলাম, যারা তার সাথে আশিঈ (সঙ্কায়) এবং ইশরাকে তসবীহ পড়তো, সূর্যে স্ব-দ, ১৮ আয়াত (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা)।

জাবের ইবনে সামুরাহ বলেন, যে জায়গাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায পড়তেন সেখান থেকে তিনি ততক্ষণ উঠতেন না যতক্ষণ না সূর্য উঠতো। অতঃপর সূর্য উঠে গেলে তিনি (সঃ) নামাযে দাঁড়াতেন (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দিয়ে ইশরাকের নামায প্রমানিত হয়।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় সূর্য খুব ভাল কোরে উদ্ভিত হবার কথা উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং সূর্য ওঠার পরপরই ৫/১০ মিনিটের মধ্যে ইশরাক পড়লে হবেনা, বরং ২০/২৫ মিনিট পর তা পড়তে হবে। এই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ফজরের নামায পড়ার পর যেব্যক্তি তার ঐ নামাযের জায়গায় বসে থাকবে যতক্ষণ না সে যুহার (ইশরাকের) দু রাকআত নামায পড়ে এবং ভাল ছাড়া বাজে কথা না বলে

তার গোনা মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশী হয় (আবু দাউদ, মিশকাত, ১১৬ পৃষ্ঠা)।

তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য একটু উপরে ওঠার পর ভাল কোরে অযু করতঃ দু রাকআত নামায পড়ে তার গোনাহ্ মাফ কোরে দেওয়া হয় কিংবা সে ঐরূপ নিষ্পাপ হোয়ে যায় যখন তার মা তাকে জন্ম দেয় (মুসনাদে আহমাদ, দারিমী, কানযুল ওম্মাল, ৭ম খণ্ড, ৫৭৬ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস প্রমান করে যে, ইশরাকের নামায দুই রাকআত। তার বেশী নয়।

কিন্তু বাংলাদেশের মওলানা ইবনে ফযল সাহেব লিখেছেন, ২, ৪, ৬ অথবা ৮ রাকআত পর্যন্ত ইশরাকের নামায পড়া জায়েয (সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)।

আমার মনে হয় দুইয়ের বেশী রাকআত ইশরাকের নয়, বরং চাশতের। বিভিন্ন হাদীসে এই দুই নামাযের জন্য ‘যুহা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেজন্য কেউ কেউ ইশরাক ও চাশতের মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরে চাশতের রাকআতগুলোকেও ইশরাকের রাকআত সংখ্যা মনে করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ, ‘যুহা’ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যে যেসব বর্ণনায় ‘ফজরের নামায পড়ার পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত ঐ জায়গা থেকে না উঠে যুহার নামায পড়ার’ উল্লেখ আছে কেবল সেই বর্ণনাগুলোকেই মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইশরাক বলে অভিহিত করেছেন। আর এইরূপ বর্ণনায় রাকআত সংখ্যা দুই (২) আছে। তার বেশী নেই।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী (রহঃ) বলেন, আল্লামা ইরাকী বলেছেন, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় হযরত আলী থেকে বর্ণিত আছে যে, সূর্যোদয়ের পর যখন তা এক বল্লম বা দুই বল্লম সমান উপরে সরে যায় তখন তিনি দু রাকআত পড়তেন। তারপর সূর্য যখন প্রথম প্রহরের উপরে উঠে যেত তখন তিনি চার রাকআত পড়তেন। এই হাদীসটি ইশরাক ও যুহার মধ্যে পার্থক্যকারী দলীল (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)।

এই দুই রাকআতে কোন খাস সূরা পড়ার অথবা বিশেষ চংয়ে পড়ার কোন বর্ণনা হাদীসে পাওয়া যায়না। সুতরাং সাধারণভাবেই ঐ দুটি রাকআত পড়তে হবে। এর ফযীলত সম্পর্কে আর একটি বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়ে। তারপর সে



ওখানেই বসে বসে আল্লাহর যিক্র করে যতক্ষণ না সূর্য উঠে। তারপর সে দু রাকআত নামায পড়ে। তার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াবের সমান নেকী হয় (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

ইশরাকের নামায প্রসঙ্গে সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, যখন তোমরা ফজরের নামায পড়ে নেবে তখন তোমরা আল্লাহর যিক্র করতে থাকবে যতক্ষণ না সূর্য ওঠে। যদি তোমরা তা না পার তাহলে ঘুমিয়ে পড়। কারণ, ঘুমানোওলা নিরাপদ (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

### চাশত ও আউওয়াবীনের নামায

বিভিন্ন হাদীসে যে নামাযটিকে সলাতুয যুহা বলা হয়েছে ফারসীতে তাকে চাশতের নামায বলা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন বাঙালী আলেমরা ‘যুহার’ প্রতিশব্দ আবিষ্কার না কোরে ফারসী প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছেন। ফলে সলাতুয যুহা এই উপমহাদেশে চাশতের নামায নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরাবী ‘যুহা’ শব্দের অর্থ সূর্যের ঔজ্জ্বল্য খুব ভালভাবে পরিস্ফুট হওয়া। যা সূর্যোদয়ের ৩ ঘন্টার পর প্রকাশ পায় এবং যাকে প্রথম প্রহরও বলা হয়। এই নামায প্রথম প্রহরের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগে পর্যন্ত পড়া হয় বলে এর নাম যুহা রাখা হয়েছে।

### চাশত নামাযের সময়

যায়দ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) একদা কিছু লোককে চাশতের নামায পড়তে দেখে বলেন, এরা সবাই এই নামাযটিকে অন্য সময়ে পড়া উত্তম মনে করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, উটের বাচ্চা মায়ের কোলের ভেতরে বসে ধূপ তপাতে তপাতে রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে বালু তেতে যাওয়ায় বাচ্চা যখন মায়ের কোল ছেড়ে পালায় তখনই সলা-তুল আউওয়া-বীনের সময় হয় (মুসলিম, মিশকাত, ১১৬ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, দুই বাংলায় চাশতের নামাযের মোটামুটি সময় গরমকালে বেলা ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা এবং শীতকালে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং

পাকিস্তানে চাশতের সময় বেলা সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১২টার মত হয়। এই হাদীস দ্বারা একথাও প্রমানিত হয় যে, সলাতুয যুহারই অপরা নাম সলা-তুল আউওয়াবীন। আবু হুরাইরা (রযিঃ) তাই বলেন (মুস্তাদরকে হা-কিম ১ম খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু যাংলাদেশের মওলানা ইবনে ফযল সাহেব লিখেছেনঃ মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামাযের নাম সালাতুল আউয়া-বীন (সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)।

তিনি এর বরাতে যে তিনটি কেতাবের নাম দিয়েছেন সেই আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে মগরেবের ৬ রাকআত নফল নামাযের নাম ‘আউওয়া-বীন’ বলে উল্লিখিত হয়নি। জানিনা তিনি কিভাবে ঐ নফলের নাম আউওয়াবীন লিখেছেন। আউ-ওয়াব শব্দের অর্থ খুবই অনুতপ্ত এবং আল্লাহর কাছে অধিক রুজুকারী। সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের আগে পর্যন্ত সময়টা দৈনন্দিন কাজকামের সর্বোত্তম সময়। এই সময় নিজের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে চাশতের নামাযে সেইই দাঁড়াতে পারে যে আউওয়াবের মধ্যে গন্য হতে পারে।

### চাশতের নামাযের ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘মানুষের শরীরে ৩৬০ টি জোড় আছে। তার কর্তব্য হল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে সদাকাহ করা।’ সাহাবীরা বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নাবী? তিনি (সঃ) বলেন, ‘মসজিদে থুথু পড়ে থাকলে তা মুছে দেওয়া এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দেওয়া, যদি এটা না পাও তাহলে চাশতের দু (২) রাকআত নামায পড়া ওর জন্য যথেষ্ট’ (আবু দাউদ, মুসলিম, মিশকাত ১১৬ পৃষ্ঠা)।

তিনি (সঃ) বলেন, ‘আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য ৪ রাকআত নামায পড় তাহলে দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব’ (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী, আহমাদ)। তিনি (সঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ১২ রাকআত যুহার নামায পড়ে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটি সোনার অট্টালিকা তৈরী করেন’ (তিরমিযী,

ইবনে মাজা, মিশকাত, ১১৬ পৃষ্ঠা)।

তিনি (সঃ) বলেন, নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম 'বাবু যুহা'। যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন একজন আহ্বানকারী চিল্লো বলবে, তারা কোথায় যারা 'সলা-তুয যুহা চিরকাল পড়তো? এই দরজাটি তোমাদের। এই দিয়ে তোমরা আল্লাহর রহমতে এর ভেতরে প্রবেশ করো (হাকিম, যা-দুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)।

চাশত ও ইশ্রাকের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্পর্কে হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, এই নামায সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসগুলোর সনদে আপত্তি আছে। এর কোনটা সুত্রহিন এবং কোনটা জাল (ঐ, ৯৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু হাফেযদুনয়া হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী বলেন, কারো কারো মতে চাশত সংক্রান্ত হাদীসগুলো মশহুর এবং মোতাওয়াতেরের কাছাকাছি (ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)।

### চাশতের নামাযের রাকআত সংখ্যা কত

উপরের হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, চাশতের নামায ২, ৪ ও ১২ রাকআত। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন নাবী (সঃ) চাশতের নামায ৮ রাকআত পড়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১১৫ পৃষ্ঠা)। অবরানীর রিওয়াযাতে ২, ৪, ৬, ৮ ও ১২ রাকআত প্রমানিত হয় (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

সব রিওয়াযাতগুলো একত্রিত করলে দেখা যায় যে, চাশতের নামায কমপক্ষে ২ রাকআত এবং উর্দ্ধপক্ষে ১২ রাকআত, তার বেশী নেই। বিখ্যাত তাবেরী মুজাহিদ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুহার নামায কোনদিন ২ রাকআত, কোনদিন ৪ রাকআত, কোনদিন ৬ রাকআত, কোনদিন ৮ রাকআত পড়েছেন (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)। সেজন্য কোন এক ব্যক্তি আসওয়াদ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞেস করেন, সলাতুয যুহা কয় রাকআত পড়বে? তিনি বলেন, তুমি যত চাও (যা-দুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যিনি চাশতের নামায পড়তে চান তিনি তার অবসর বুঝে ২ থেকে ১২ রাকআতের মধ্যে যতটা সম্ভব ততটা পড়তে

পাঠেন।

### চাশতের নামাযের খাস সূরা

উক্বা ইবনে আমির বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) হুকুম দেন যে, আমরা যেন চাশতের নামাযে কতিপয় সূরা পড়ি। তন্মধ্যে অশশামসে অযুহা-হা এবং অযযুহা (হাকেম, মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)।

দু-রাকআত পড়লে এই সূরা দুটি পড়া উচিত। হাফেয আবু নুআইম হিলয়্যাতুল আউলিয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে গালেব যুহার নামায ১শো রাকআত পড়তেন (আলহাভী লিসসুয়ুতী, ১ম খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা, ১৯৫৯ সংস্করণ)।

### চাশতের নামাযে জামাআত

এক সাহাবী ইত্বান ইবনে মালিক বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বাড়ীতে চাশতের নামায পড়েন। তখন কিছু সাহাবী তাঁর পেছনে দাঁড়ান। অতঃপর তারা তাঁর ঘরে নামায পড়েন (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)।

নারী সাহাবী উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) চাশতের নামায আট (৮) রাকআত পড়তেন তখন তিনি প্রতি দু-রাকআতে সালাম ফিরতেন (ঐ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)।

### দুপুরে নফল নামায

আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব বলেন, যাওয়ালের পর অর্থাৎ মাথার উপর থেকে সূর্য পশ্চিমে একটু ঢলার পর এবং যোহরের (ফরয ও সুন্নত পড়ার) আগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ৪ রাকআত নফল পড়তেন এবং একথাও বলতেন যে, এই সময়টিতে আসমানের দরজাগুলো খোলা হয়। সেজন্য আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে যেন আমার নেক আমল ওপরে ওঠানো হয় (তিরমিযী, মিশকাত, ১০৪ পৃষ্ঠা)।

নারী (সঃ) আরো বলেন, যাওয়ালের পর যোহরের আগে ৪ রাকআত নামায তাহাজ্জুদের নামাযের মত গন্য করা হয় এবং এই সময়ে এমন

কোন জিনিষ নেই, যে আল্লাহর তসবীহ পড়েন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন: “তখন প্রত্যেক জিনিষের ছায়া ডাইনে ও বামে আল্লাহকে সেজদা করতঃ ঝুকে পড়ে। এমনতাবস্থায় তারা নিজেকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করে” সূরায়ে নাহল, ৪৮ আয়াত (তিরমিযী, বাইহাকীর শুআবুল ইমান, মিশকাত, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

এই ৪টি রাকআত যোহরের আগের ৪ রাকআত সুন্নত, না কি তা ছাড়া আলাদা ৪ রাকআত নফল নামায-এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, এটা যোহরের আগের ৪ রাকআত সুন্নত। আলাদা নফল নয়। কিন্তু হাফেয ইরাকী বলেন, এটা যোহরের আগের ৪ রাকআত সুন্নত ছাড়াও বাড়তি ৪ রাকআত। যার নাম যাওয়ালের সুন্নত (মিরআত ২য় খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)।

ইবনে হাজার আঙ্কালানীও তাই বলেন। ওমর ফারুক, ইবনে আব্বাস, ইবনে মসউদ, আবু সালমা, ওরঅহ এবং আরো অনেক ওলামায়ে সালাফ যাওয়ালের নামায পড়তেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় (আলহা-ভী লিল ফাতা-ভী, ১ম খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা)।

### মগরেবের পর নফল নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মগরেব বাদ ৬ রাকআত (নফল) নামায পড়ে তার মধ্যে সে কোন বাজে কথা বলেনা তার ঐ নামাযগুলো তার বৎসরের এবাদতের সাথে বদলে দেওয়া হবে (তিরমিযী)।

হাদীসটি অত্যন্ত যরীফ। তিনি (সঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি মগরেব বাদ ২০ রাকআত নফল নামায পড়ে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেন (তিরমিযী, মিশকাত, ১০৪ পৃষ্ঠা)।

নাবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মগরেব বাদ ৬ রাকআত নামায পড়ে তার গোনা মাফ কোরে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয় (অবারানী)। তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মগরেব পর ৬ রাকআত পড়ে ওর বদলে তার ৫০ বৎসরের গোনাহ মাফ কোরে দেওয়া হয় (কিয়ামুল লাইল মুহাম্মদ ইবনে নাসর কৃত)।

নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মগরেব বাদ কারো সাথে কথা বলার আগে

৪ রাকআত নামায পড়ে তার জন্য ঐ নামাযটিকে ইল্লিয়ানে তুলে রাখা হয় এবং সে যেন মসজিদে আকসায় লায়লাতুল কাদর পাবার মত হয়। আর এই নামাযটা অর্ধেক রাত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম হয়' (মুসনাদে ফিরদাওস)। নাবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মগরেব বাদ ৪ রাকআত নামায পড়ে সে আল্লাহর রাহে একটার পর একটা জেহাদ করার সওয়াব পাবার মত হয় (ঐ)।

ইমাম শওকানী বলেন, উক্ত সমস্ত হাদীসগুলোই অত্যন্ত দুর্বল। এ ব্যাপারের হাদীসগুলো প্রমান করে যে, মগরেব এবং এশার মাঝে বহু নামায পড়া যায়। এই সব যযীফগুলো একত্রিত হবার ফলে কিছুটা দাঁড়াতে পারে, বিশেষ কোরে ফযীলত সংক্রান্ত ব্যাপারে। আল্লামা ইরাকী বলেন, সাহাবীদের মধ্যে ইবনে মসউদ, ইবনে আমর, ইবনে ওমর, সালমান ফারসী ও আনাস ইবনে মালেক মগরেব এবং এশার মাঝে কিছু নামায পড়তেন (নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড, ৩০০ ও ৩০১ পৃষ্ঠা)।

### কতিপয় বিশিষ্ট নফল নামাযী

আবু জা'ফর বলেন, ইমাম হোসায়নের পুত্র আলী (রহঃ) প্রত্যেক দিন ও রাতে এক (১০০০) হাজার রাকআত নামায পড়তেন (সিফাতুস সফওয়াহ, ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)। এত অধিক ইবাদতের জন্য তাঁর নাম যয়নুল আবেদীন অর্থাৎ সাধকদের ভূষণ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। (তাযকিরাতুল ছফ্ ফা-য, ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের ছাত্র মায়মুন ইবনে মিহরান তাবিয়ীও প্রতি দিন ও রাতে এক (১০০০) হাজার রাকআত নামায পড়তেন (ঐ, ১ম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)।

ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, বিশ্ব ইবনে মুফায্য়াল একদিন ছাড় দিয়ে সর্বদা রোযা রাখতেন এবং প্রতি দিন ও রাতে চারশো (৪০০) রাকআত নফল নামায পড়তেন (তাযকিরাতুল ছফ্ ফায, ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম রাক্কাশী বাসরী এবং ইমাম আবু কিলাবাহ বাসরী প্রতি দিন ও রাতে চার (৪০০)শো রাকআত নফল নামায পড়তেন (ঐ, ২য় খণ্ড,

৪৪ ও ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

আবদুল্লাহ বলেন, আমার এর পিতা আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রত্যেক দিন ও রাতে তিনশো (৩০০) রাকআত নফল নামায পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি (কুরআন মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু কিনা ব্যাপারে) কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং আশী (৮০) বছর বয়সে পৌঁছে যান তখনও তিনি প্রত্যেক দিন দেড়শো (১৫০) রাকআত নামায পড়তেন (সিফাতুস সফওয়াহ, ২য় খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)।

জোনায়েদ বাগদাদী প্রতিদিন তিনশো (৩০০) রাকআত নফল নামায এবং তিন হাজার (৩০০০) বার তসবীহ পড়তেন (ঐ, ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)।

ইবনে সামাআহ বলেন, হারুন রশীদ বাদশাহ দরবারে কাযী থাকার যুগে ইমাম আবু ইউসুফ প্রত্যহ দুশো (২০০) রাকআত নফল নামায পড়তেন (তাযকিরাহ, ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)। ইমাম আস'াদ নাখয়ীও দিনরাতে দুশো (২০০) রাকআত নামায পড়তেন (মিরআতুল জিনান, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম হোসায়নের পৌত্র ইমাম বাকের প্রতিদিন দেড়শো (১৫০) রাকআত নফল পড়তেন (তাযকিরাহ, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)। বাদশাহ হারুন রশীদ প্রতিদিন একশো (১০০) রাকআত নফল পড়তেন এবং প্রতিদিন নিজের ব্যক্তিগত ফাণ্ড থেকে এক (১০০০) হাজার টাকা দান করতেন (মিরআতুল জিনান, ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

আবু আহমাদ মাগায়িলী বলেন, সামনুন ইবনে হামযাহ প্রতিদিন ও রাতে পাঁচশো (৫০০) রাকআত নফল নামায পড়তেন। আর আবু আহমাদ কালা-নিসী বলেন, একদা এক ব্যক্তি বাগদাদের ফকীরদেরকে চার হাজার (৪০০০) দেহহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দান করেন। তখন সামনুন আমাকে বলেন, আমার তো অত দানের সামর্থ নেই। তবে আমি ওর প্রত্যেক দেহহামের বদলে এক রাকআত কোরে নামায পড়তে পারবো।

অতঃপর আমরা মাদায়েনে গেলাম। সেখানে তিনি চার হাজার (৪০০০) রাকআত নামায পড়লেন (সিফাতুস সফওয়াহ, ২য় খণ্ড, ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা)।

## ঈদের নামায

আরাবী ঈদ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা। মুসলমানদের ঈদ প্রতি বছরে খুশির পরগাম নিয়ে ফিরে আসে বলে ঐ উৎসবের নাম ঈদ রাখা হয়েছে। (মুফরাদা-তু গারীবিল কুরআন ৩৫৮ পৃষ্ঠা)।

মুসলমানদের ঈদ অন্যান্য জাতির জাতীয় উৎসবের মত রং তামাশায় কাটবে না, বরং তা শরীআত সম্মত আনন্দের মাধ্যমে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের ভেতর দিয়েই অতিবাহিত হবে। যেমন সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফেতরের দিনে ঘর থেকে বের হতেন। অতঃপর নামায পড়ে (ঈদ উৎসব) শুরু করতেন (মুসলিম, মিশকাত, ১২৭ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদের দিনে প্রথম কাজ হল ঈদের নামায পড়া। তাই এখন দেখা যাক যে, এই নামাযের গুরুত্ব কত।

## ঈদের নামাযের গুরুত্ব

রসূলুল্লাহ সঃ) ২য় হিজরীর ১লা শওওয়ালে সর্ব প্রথম ঈদুল ফেতরের নামায পড়েন। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তিনি এই নামায ত্যাগ করেননি। কুরআনে আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মদ) তুমি (ঈদের) নামায পড়ো এবং কুরবানী করো (সূরায়্যে কাওসার)। এই আয়াতের নির্দেশমূলক হুকুম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আজীবন ঈদের নামায ত্যাগ না করা প্রমাণ করে যে, ঈদের নামায অজেব ও অপরিহার্য এবং কোন মতেই তা পরিত্যাজ্য নয়। হানাফীদের মতও তাই (মিরাতাত, ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)।

দিল্লির মিঞা সাহেব মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মওলানা ইউনুস দেহলভী (রঃ) বলেন, ঈদের দু-রাকআত নামায মুসলমানদের উপর অজেব। কারণ, হাদীসের শব্দ দ্বারা তা অজেব হওয়া পরিস্কার বোঝা যায়। (মুসনাদে আহমাদ, ৭৫ পৃষ্ঠা)।

কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদের নামায ত্যাগ করেছেন। তেমনি নাবীজীর পরে চার খলীফা এবং তাবেরীয়ন ও তাবের-তাবেয়ীন প্রমুখ কেউই এই নামায পড়েননি বলে তার প্রমাণ



পাওয়া যায় না (দসতুরুল মুত্তাকী, ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা)।

### ঈদের নামাযের আগে করনীয় কর্তব্য

রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই ঈদের দিনে গোসল করতেন, (ইবনে মাজা, ৯৪ পৃষ্ঠা)। তারপর তিনি সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরতেন। কখনো তিনি সবুজ রংয়ের কাপড় পরতেন। আবার কখনো লাল ফুলের বুটি দেওয়া চাদর পরতেন (যা-দুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)। সাহাবী জাবের বলেন, দুই ঈদেতে ও জুমআতে নাবী (সঃ) তাঁর লাল বুটি দেওয়া বিশেষ চাদরটি পরতেন (ইবনে খুযাইমা, নায়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)।

তারপর তিনি সর্বোত্তম খুশবু লাগাতেন (হাকিম, ফাত্হুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)। তারপর তিনি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদুল ফেতরের জন্য সকালে ঘর থেকে বের হতেন (বুখারী) এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদের নামায না পড়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

আলী (রাযিঃ) বলেন, সুন্নত হল ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া (তিরমিযী, বুলুগুল মারাম ৩৫ পৃষ্ঠা)। তাই তিনি হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং হেঁটেই বাড়ী ফিরতেন (ইবনে মাজা, ৯৩ পৃষ্ঠা)। এবং ঘর থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত তকবীর দিতে দিতে যেতেন (হাকিম, তালখীসুল হাবীর, ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা)। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, ঈদের নামাযের জন্য কোন্ সময়ে তিনি ঘর থেকে বের হতেন? তাই এবার ঐ সময়ের আলোচনা করা যাক।

### ঈদের নামাযের সময়

হাসান ইবনে আহমাদ আলবান্না কিতাবুল আযাহীতে লিখেছেন, জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, নাবী (সঃ) আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফেতরের নামায তখন পড়েন যখন সূর্য দুই বল্লম উপরে ছিল এবং ঈদুল আযহা সূর্য এক বল্লম উপরে থাকাকালীন পড়ান (তালখীসুল হাবীর, ১৪৪ পৃষ্ঠা)। সে যুগে ঘড়ি আবিষ্কৃত না হওয়ায় সাহাবীরা একটা অনুমান করে এক বল্লম ও দুই বল্লমের কথা বলে সময়টা বোঝাতে চেয়েছেন।

অন্য এক সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বসর একদা ঈদুল ফেতর কিংবা

ঈদুল আযহা পড়তে বের হন। অতঃপর ইমাম সাহেব দেরী করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন, এই সময়েই আমরা (রসূলুল্লাহর যুগে) নামায পড়ে ফারোগ হয়ে যেতাম। এটা হল ইশরাকের সময় (মুসনাদে আহমাদ আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকিম ও বাইহাকী, মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)।

শায়খুল হাদীস মওলানা ইউনুস (রহঃ) বলেন, সূর্যোদয়ের পর থেকে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় হল ইশরাকের অন্ত (দসতুরুল মুত্তাকী, ১৪২ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ আনুমানিক সোয়া ঘণ্টা। সুতরাং সব হাদীসগুলো একত্রিত করলে পরিস্কার বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফেতর পড়া উত্তম। যদিও এই নামায হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের মতে সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর থেকে মাথার উপর হতে পশ্চিমে সূর্য চলে পড়ার আগে পর্যন্ত পড়া চলে। আহলে হাদীসদের মতও তাই। তবে সময় পার কোরে দেরী করে ঐ নামায পড়ার ব্যাপার সবারই মতে অপসিকর।

মুসনাদে শাফিয়ীতে মুরসালভাবে আছে যে, নাবী (সঃ) একদা আমার ইবনে হায্মকে পত্রে লেখেন, তুমি ঈদুল আযহা জলদি পড়ো এবং ঈদুল ফিতর দেরী করো। আর লোকেদের নসীহত করো (আল আসফিয়াহ, ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে কুদামাহ বলেন, ঈদুল আযহা জলদি পড়ার কারণ এই যে, যাতে কুরবানীর সময় অনেক পাওয়া যায় এবং ঈদুল ফিতর দেরী করার কারণ এই যে, যাতে ফিতরা আদায় করার সময় বেশী পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)।

অনেক গ্রামাঞ্চলে ঈদুল ফেতরের নামায চাঁদের খবর সঠিক সময়ে পেয়েও বেলা ১০/১১ টায় পড়া হয়। এটা সুন্নত সম্মত নয়। তবে হাঁ, চাঁদের খবর দেরীতে পাওয়ার কারণে যদি যাওয়ালের আগে পর্যন্ত ঈদুল ফেতর পড়া সম্ভব হয় তাহলে দেরী করে পড়াতে আপত্তি নেই। কিন্তু যাওয়ালের আগে সম্ভব না হলে অথবা চাঁদের খবর যদি দুপুরের পর

পাওয়া যায় তাহলে তখনই রোযা ভেঙে ফেলে পরের দিন সকালে নামায পড়তে হবে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ঈদের নামায কোথায় পড়া হবে মসজিদে, না মাঠে?

### ঈদের নামাযের জায়গা

সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী বলেন, নাবী (সঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন (বুখারী, মুসলিম)। আবু হুরায়রা (রযিঃ) বলেন, একবার বৃষ্টি হওয়ায় নাবী (সঃ) সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায পড়েন (আবু দাউদ, ইবনে মা-জা, মিশকাত, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা)।

উক্ত দুটি হাদীস প্রমান করে যে, মসজিদে নয়, বরং কোন এক মাঠে ঈদের নামায পড়া উত্তম। রসূলুল্লাহর সুন্যত সেটাই। তবে বৃষ্টি হলে এবং মাঠে নামায পড়া সম্ভব না হলে মসজিদে ঈদের নামায পড়া যাবে। হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও আহলে হাদীসদের অভিমত তাই। কিন্তু শাফেয়ীদের মতে ঈদের নামায মসজিদে পড়া মাঠে পড়ার চেয়েও উত্তম (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)।

মদীনার পূর্বদিকে মসজিদে নববী থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ঈদগাহ এক হাযার হাত দূরে ছিল। ওমর ইবনে শিবহ আখবারে মদীনাতে এই বর্ণনা দিয়েছেন। (ফতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)। রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার ছাড়া আজীবন ঐ ঈদগাহে ঈদের নামায পড়েছেন (যাদুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)।

ঈদের নামায যেহেতু নামায সেজন্য নামাযের কথা বলার সাথে সাথেই যেকোন লোকের মনে আযান ও ইকামতের কথা ভেসে ওঠে। তাই এবার জেনে নিন ঈদের নামাযে আযান ও একামত আছে কিনা।

### ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত নেই

সাহাবী জাবের ইবনে সামুরাহ বলেন, আমি রসূলুল্লাহর সাথে কয়েকবার দুই ঈদের নামায পড়েছি বিনা আযানে ও বিনা ইকামতে (মুসলিম, মিশকাত, ১২৫ পৃষ্ঠা)।

## ঈদের নামায কয় রাকআত

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সঃ) ঈদের দিনে দু রাকআত নামায পড়েন। তার আগে এবং পরে কোন নামায তিনি পড়েননি (কতুবে সিভা ও মুসনাদে আহমাদ, বুলুগুল মারাম, ৩৫ পৃষ্ঠা)। এবার শুনুন তিনি কিভাবে নামায পড়তেন।

## ঈদের নামাযের তরীকা

রসূলুল্লাহর (সঃ) ঈদগাহে যাবার সময় একটা লাঠি বা বল্লম বয়ে নিয়ে যাওয়া হত এবং নামায শুরুর আগে সেটা তাঁর সামনে সুতরা হিসেবে গিঁথে দেওয়া হোত (বুখারী)। অতঃপর তিনি ‘আল্লাহ আকবর’ বলে তকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধতেন। তারপর তিনি সানা পড়তেন (ইবনে খুযাইমা)। এরপর তিনি পর পর সাতটি তকবীর দিতেন। প্রতি দুই তকবীরের মাঝখানে তিনি একটু কোরে চুপ থাকতেন। এই চুপ থাকার মাঝে তিনি কোন বিশেষ যিকর করতেন বলে কোন প্রমান পাওয়া যায় না।

ইবনে ওমর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহর সুন্নতের অত্যাধিক পাবন্দির কারণে প্রত্যেক তকবীরের সাথে দুই হাত তুলতেন এবং প্রত্যেক তকবীরের পর হাত বাঁধতেন (বাইহাকী)। এভাবে সাতটি তকবীর বলার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা ফাতিহা পড়তেন, তারপর সূরা ক্বা-ফ, কিংবা সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা পড়তেন। অতঃপর তিনি রুকু ও সিজদা করতেন।

এভাবে প্রথম রাকআত সম্পূর্ণ করার পর তিনি সিজদা থেকে উঠে পরপর পাঁচটি তকবীর দিতেন। তারপর সূরা ফাতেহা পড়ে সূরা কামার কিংবা সূরা গা-শিয়া পড়তেন। অতঃপর তিনি রুকু ও সিজদা কোরে দু রাকআত নামায পড়া শেষ করতেন। সালাম ফেরার পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে যমীনে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। তখন ঈদগাহে কোন মেঘার নিয়ে যাওয়া হোতনা, তারপর দুআ কোরে শেষ করে দিতেন (যা-দুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ১২১-১২২ পৃষ্ঠা)।

## ঈদের নামাযে সুন্নতী কেরাআত

নুমান ইবনে বাশীর বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই ঈদে ও জুমআতে সূরায়ে সাব্বিহিন্মা রব্বিকাল্ আলা ও হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ পড়তেন। আর যখন ঈদ ও জুমআ একই দিনে পড়তো তখনও তিনি ঐ সূরা দুটিকে উক্ত দুই নামাযেই পড়তেন (মুসলিম)। আবু অ-কেদ লাইসী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনে সূরা কাফ ও সূরা কামার পড়তেন (ঐ, মিশকাত, ৮০ পৃষ্ঠা)।

একটি যরীফ হাদীসে আছে, ইবনে আব্বাস (রযিঃ) বলেন, নাবী (সঃ) দুই ঈদের নামাযে আন্মা ইয়াতাসা-আলুন এবং অশশামসে অযুহা-হা পড়তেন (মুসনাদে বায্‌যার, নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)। আর এক হাদীসে আছে, খলীফা আবু বাকর একবার ঈদের দিনে সূরা বাকারা পড়েন (ইবনে আবী শায়বা)।

উক্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করার পর ইমাম শওকানী মন্তব্য করেন, এ ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীস প্রমান করে যে, দুই ঈদে সূরা আ'লা ও সূরা গা-শিয়া পড়া পছন্দনীয়। ইমাম আহমাদের মত তাই। ইমাম শাফিয়ীর মতে সূরা কা-ফ ও সূরা কামার পড়া বাঞ্ছনীয়। (কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন খাস সূরা নির্দিষ্ট নেই (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)। যার যা ইচ্ছা সে তাই পড়বে।

আহলে হাদীসরা বলেন, যে কেউ তার ইচ্ছা মত সূরা পড়তে পারে, তবে নাবীজীর পছন্দ অনুযায়ী বেশীর ভাগ সূরা আ'লা ও গাশিয়া এবং কখনো কখনো সূরা কা-ফ ও সূরা কামার পড়া উত্তম। যাতে কোরে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নত পালনেরও নেকী পাওয়া যায়। নাবী (সঃ) দুই ঈদের কেরাআত চিল্লো পড়তেন (মুসনাদে শাফিয়ী, মিশকাত, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

হানাফী ফকীহগন বলেন, অন্য সূরা না পড়ে কেবল উক্ত চারটি সূরা বরাবরই পড়লে তা পড়া মকরাহ হবে (বাদায়ি' ১ম খণ্ড,)। এটা তাদের কিয়াসী ফাঁকা ফতওয়া।

## ঈদের নামাযে বাড়তি তকবীর কয়টা

রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই ঈদের নামাযে কিছু বাড়তি তকবীর দিতেন। তার সংখ্যা কয়টি সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঐ বাড়তি তকবীর ৬, ৯, ১২ এবং ১৩। এর মধ্যে (৯) তকবীর সংক্রান্ত তিরমিযী বর্ণিত হাদীসটির শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ হাদীসটি ইবনে মসউদের (রাযিঃ) ব্যক্তিগত আমল। তা রসূলুল্লাহর আমল নয়।

মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত আবদুর রহমান ইবনে আওফের হাদীসে ১৩ তকবীরের যে রিওয়ায়াতটি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, ঐ হাদীসে ১২ তকবীরের সাথে তকবীরে তাহরীমাকেও গন্য করা হয়েছে।

আবু দাউদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ও মুসান্নাফ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত হাদীসে আছে:- সাহাবী আবু মুসা আশআরীকে একদা জিজ্ঞেস করা হয় যে, দুই ঈদের নামাযে রসূলুল্লাহর তকবীর কেমন ছিল? তিনি বলেন, জানাযার মত চার তকবীর (আওনুল মাবুদ, ১ম খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটির ব্যাখ্যা ইবনে মসউদ বলেন, তকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাকআতে কেরাআতের আগে ৪ তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কেরাআতের পরে রুকুর তকবীরসহ ৪ তকবীর। অর্থাৎ তকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তকবীর বাদ দিলে বাড়তি তকবীর হয় ৬ তকবীর। এটাই ইমাম আবু হানীফার মত। এই হাদীস দ্বারা কিন্তু একথা প্রমানিত হয় না যে, প্রথম রাকআতে তকবীর কেরাআতের আগে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে তকবীর কেরাআতের পরে হবে। যা হানাফীদের অভিমত।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের সবাই বলেন, উক্ত তিনটি রিওয়ায়াতেরই সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। বিধায় সব বর্ণনাগুলোই যরীফ। তাছাড়া হানাফী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ গ্রন্থ হিদায়াতে আছে যে, ঐ ৬ তকবীর সাহাবী ইবনে মসউদের ব্যক্তিগত উক্তি। তা রসূলুল্লাহর আমল নয়।

নাবী (সঃ) এর আমল ১২ তকবীর। কারণ, তিরমিযীতে ৫টি, আবু দাউদে ৪টি, ইবনে মাজাতে ৪টি, মুঅত্তা ইমাম মালিকে ২টি এবং

বাইহাকী, মুসনাদে বাযযার, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, দারাকুতনী, অবারানী এবং দুই হানাফী মুহাদ্দিস এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ তাহাভী ও মুঅত্তা ইমাম মুহাম্মাদ প্রভৃতি ১১টি হাদীস গ্রন্থে ২২টিরও বেশী হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই ঈদের নামাযে ১ম রাকআতে কেরাআতের আগে সাত (৭) তকবীর এবং ২য় রাকআতে কেরাআতের আগে পাঁচ তকবীর, মোট বার (১২) তকবীর দিতেন। শাফেয়ী মালেকী, হাম্বালী ও আহলে হাদীসদের ফাতওয়া তাই।

ইমাম আবু হানীফার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বার (১২) তকবীরের উপর আমল করতেন (রদ্দুল মুহতার, ৭৮০ পৃষ্ঠা)।

ইমাম তিরমিযী বলেন, বার (১২) তকবীর সংক্রান্ত হাদীসটির সুত্র হাসান ও উত্তম। তিনি তাঁর ‘ইলালে কুবরা’ গ্রন্থে বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এয় চেয়ে বেশী সহীহ আর কোন হাদীসই এ বিষয়ে নেই (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, শারহুন নেকায়াহ, ১ম খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার বলেন, (১২) তকবীরের বর্ণনাগুলো নাবী (সঃ) থেকে হাসান বা উত্তম সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর বিরোধিতায় কোন সবল কিংবা দুর্বল হাদীসও নাবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি (আলমুগনী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, হারামায়ন বা মক্কা ও মদীনাবাসীদের (বার (১২) তকবীরের আমলটাই প্রাধান্যযোগ্য আমল (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)। মুঅত্তা ইমাম মালেকের ফারসী ভাষ্যে তিনি বলেন, হারামায়নবাসীদের আমলটাই সঠিক আমল (মুসাফফা ১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী হানাফী বলেন, সাহাবী আবু হুরায়রার বার (১২) তকবীরের উপর আমলটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত নয়, বরং তা হল নাবী (সঃ) এরই নির্দেশ। যার উপর আমল অপরিহার্য (আততালীকুল মুমাজ্জাদ, ১৪১ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ সঃ) ঈদের নামাযে তকবীরে তাহারীমা ছাড়া বার (১২)

তকবীর দিভেন (হা-কিম, ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা)।

তাই বলছি, রসুলুল্লাহর মরফু হাদীস বিশুদ্ধ সনদে অধিক হারে পাওয়া সত্ত্বেও যারা তাঁর একজন সাহাবীর ব্যক্তিগত ফতওয়ার উপর আমল করে আল্লাহ তাদের সুমতি দিন-আমিন।

### তকবীরগুলোর গুরুত্ব

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে এই বাড়তি তকবীরগুলো বলা অজেব। সুতরাং কেউ যদি এই তকবীর ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সাহুও সেজদা দিতে হবে। হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা এই তকবীরগুলো বলা অজেব প্রমানিত হয় না। তাই অধিকাংশ ওলামার মতে এটা অজেব নয়, বরং সুন্নত। এটা ভুল কোরে কিংবা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলেও নামায বাতিল হবে না। ইবনে কুদামাহ বলেন, এ ব্যাপারে, কারো মতভেদ নেই (আলমুগনী ২য় খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)। আহলে হাদীসদেরও মত তাই।

### তকবীর গুলোর মাঝে দুই হাত তোলা হবে কিনা

এ ব্যাপারে ইমাম নাযীর হোসায়ন দেহলভী (রহঃ) বলেন, কোন মরফু হাদীস দ্বারা জানা যায়না যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) দুই ঈদের তকবীরগুলোর মাঝে দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলেছিলেন। সেজন্য হাত না তোলাই উচিত (ফাতাওয়া নাযিরিয়াহ, ১ম খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা)।

ওমর (রযিঃ) জানাযা ও ঈদের প্রত্যেক তকবীরে দুই হাত তুলতেন (বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)। তাই আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, হাত তোলা উচিত (ফাতা-ওয়া সানায়িয়াহ, ১ম খণ্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)।

আমার বুখারী শরীফের রসমী ওস্তাদ শায়খুল হাদীস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, এ ব্যাপারে সহীহ মরফু হাদীসে কোন প্রমান নেই বলে আমার মতে হাত না তোলা উত্তম। কিন্তু কেউ যদি ওমর, ইবনে ওমর ও যায়দ ইবনে সাবেত (রযিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণিত মওকুফ হাদীস অনুযায়ী হাত তোলে। তাতে আপত্তি নেই (মিরআত, ২য় খণ্ড ৩৪২



পৃষ্ঠা)।

ওমরের ঐ হাত তেলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোন বিরোধিতার বর্ণনা জানা যায় না (আলমুগনী ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা)।

নোট:- ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ বুধবার সকাল ৬টায় আমি এবং মওলানার পুত্র মওলানা আবদুর রহমান সাহেব তাঁদের ইউ,পি, আযমগড় জেলার মোবারকপুর টাউনের বাড়ীতে বুখারী শরীফের দুটি হাদীস পড়ে আমি উক্ত আল্লামা রহমানী সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহন করে ধন্য হই-  
আলহামদুলিল্লাহ আলা যা-লিক।

### মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া ওয়া-জেব

নারী সাহাবী উম্মে আতিয়াহ বলেন, আমাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন হায়েযওলী ও পর্দানশীন মেয়েদেরকে দুই ঈদের দিনে ঘর থেকে বের করি। অতঃপর তারা যেন মুসলমানদের জামাআতে হাযির হয় এবং দুআতে শরীক হয়। আর হায়েযওলীরা যেন নামায থেকে আলাদা থাকে, কেবল দুআতে শরীক হবে। এই হুকুম শুনে এক মহিলা সাহাবীয়াহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো কাছে যে চাদর নেই সে কি করবে? তিনি (সঃ) বললেন, সে যেন তার অন্য সঙ্গিনীর চাদরে জড়িয়ে যায় (কিন্তু যাওয়া চাই)। বুখারী ১৩৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, মিশকাত, ১২৫ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজা, ৯৪ পৃষ্ঠা, ইবনে খুযায়মা ২য় খণ্ড ৩৬১-৩৬২ পৃষ্ঠা, ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় তিনি (সঃ) বলেন, প্রত্যেক সাবালিকা নারীর জন্য ঈদগাহে রওয়ানা হওয়া ওয়াজেব (আহমাদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা, তবারানী কবীর, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা, কানযুল ওমমাল ৮ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)।

ইবনে আব্বাস বলেন, নাবী (সঃ) তাঁর মেয়েদের এবং বিবিদেরকে দুই ঈদে নিয়ে যেতেন (ইবনে মাজা, ৯৪ পৃষ্ঠা)। আবু বাক্র ও আলী রযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, দুই ঈদে ঈদগাহে রওয়ানা হওয়া মেয়েদের হক (ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, মিরআত ২য় খণ্ড, ৩৩২

পৃষ্ঠা)। ইবনে ওমর তাঁর পরিবারবর্গের যাকে যাকে সম্ভব হোত দুই ঈদগাহে নিয়ে যেতেন (ইবনে আবী শায়বা ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)।

উক্ত সমস্ত হাদীসগুলো প্রমান করে যে, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। যদি কারো নিজের চাদর না থাকে তাহলে সে যেন পরের চাদরে জড়িয়ে কিংবা কারো চাদর ধার নিয়েও ঈদগাহে যায়। ঐ মহিলা যুবতী ও বুড়ী, বিবাহিতা ও কুমারী, হায়েয ও নেফাসওলী সবাই যেতে পারে। তবে যে নারী তালাক কিংবা স্বামী শোকের ইদত পালন করছে সে যেতে পারবে না। তাছাড়া বিনা চাদরে বা বিনা বোরকায়ও বাওয়া চলবে না।

মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কুদামাহ বলেন, যেসব মেয়েরা ঈদগাহে যাবে তারা যেন খুশবু না মাখে, সিঙ্গার না করে এবং ফ্যাশনওলা বাহারী কাপড় না পরে, বরং দৈনন্দিন জীবনের পুরানো কাপড় পরে এবং পুরুষদের থেকে আলাদা থাকে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মেয়েরা যেন দৈনন্দিন কাপড় পরে রওয়ানা হয় এবং পুরুষদের সাথে মিশে না যায় (আলমুগনী ২য় খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মেয়েরা মসজিদে অবশ্য অবশ্যই যাবে, তবে সাধারণ বেশে (সেজেগুজে রং ঢং কোরে নয়) আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা, তলখীসুল হাবীর ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ পরে মেয়েরা যে সব (রং ঢং) আমদানী করে তা যদি তিনি দেখতে পেতেন তাহলে মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া বন্ধ কোরে দিতেন, যেমন বানী ইসরাইলদের মেয়েদেরকে মানা করা হয়েছিল (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে হানাফী ফতওয়ায় মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া নিষিদ্ধ। এর জওয়াবে তিন মযহাব পন্থী ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, আয়েশার উক্তি তাঁর ব্যক্তিগত মত। তথাপি তিনি নিজেও মেয়েদেরকে ঈদগাহে না যাবার ফতওয়া জারী করতে সাহস পাননি। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) সহীহ হাদীস তাঁর ব্যক্তিগত ধারনার বিরুদ্ধে বিদ্যমান। তাছাড়া নাবী (সঃ) এর অফাতের বহু পরে উম্মে আতিয়াহ (রাযিঃ) উপরোক্ত ফতওয়া দেন যে, আমাদেরকে ঈদগাহে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তখন কোন সাহাবীও ঐ ফতওয়ার বিরোধিতা

করেননি। সুতরাং নাবীর হুকুমের সামনে আয়েশা কেন, যেকোন ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত ধারণা অগ্রহণযোগ্য, বিধায় তা পরিত্যাজ্য।

অতএব মেয়েদের ঈদগাহে যেতে কোন মানা নেই। তবে এটা লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কোন মহিলা যেন ঈদের নামে সিঙ্গার কোরে, রংবেরং শাড়ী ও রকমারী গহনা পরে এমনভাবে ঈদগাহে না যায় যদ্বারা অন্য পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরে ফেতনা দেখা দেয়।

### শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর ফতওয়া

ভারতগৌরব আল্লামা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, দ্বিনী শাআ-য়ির যা ইসলামের বিশেষ নিদর্শনাবলী প্রকাশের জন্য সবারই ঈদগাহে রওয়ানা হওয়া, এমনকি শিশু ও নারী এবং পর্দানশীন মহিলা ও হায়েযওলী নারীদেরও ঈদগাহে যাওয়া মোস্তাহাব যা পছন্দনীয় কাজ। তবে ঋতুবতীরা নামাযে শরীক না হোয়ে মুসলমানদের দুআয় শরীক হবে (ছজ্জাতুল্লাহিল যা-লেগাহ ২য় খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)।

### আল্লামা আনঅর শাহ কাশমীরীর ফতওয়া

দেওবন্দী হানাফীগণ যাকে ভারতের ইমাম বুখারী বলে অভিহিত করেন সেই আল্লামা আনঅর শাহ কাশমীরী (রহঃ) বলেন, আমাদের আসল মযহাব নারীদের ঈদগাহে যাওয়া। কিন্তু ফতওয়াওলারা তা নিষেধ করেছেন। আল্লামা মোগলতায়ী হানাফীর ছাত্র শায়খ সিরাজুদ্দীনের 'আন্তাওয়ীহ আলাল বুখারী, থেকে আল্লামা আইনী আমাদের আসল মযহাবের কথা নকল করেছেন (তা হল মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া নিষিদ্ধ)। আমি বলছি, আল্লামা আইনী প্রকৃত ব্যাপার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। কারণ, প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, এই মসআলাটি হেদায়ার ১০৫ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, মেয়েরা সব নামাযেরই জন্যে ঘর থেকে নিশ্চয়ই বের হবে। কারণ, আকর্ষণ কম থাকার কারণে কোন ফেতনাই হতে পারে না। অতএব তাদের ঈদগাহে নামায পড়তে যাওয়াটা আপত্তিকর ও মকরুহ নয় (আল আরফুশ শাযী, ২৩২ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী বলেন, বৃদ্ধ মহিলাদের ঈদগাহে রওয়ানা হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (উমদাতুল কারী)।

ইমাম নবভী বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) মেয়েদের ঈদগাহে যাবার ব্যাপারে একবার অনুমতি দিয়েছেন এবং অন্যবার তিনি তা মানা করেছেন (নবভী শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফার প্রথম অনুমতিসূচক উক্তিটি যেহেতু হাদীসের অনুকূল সেহেতু এই অভিমতটি গ্রহণীয় হবে। আর তাঁর যে উক্তিটি নিষেধমূলক তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ অসিয়াতে বলেনঃ “ইয়া- স্বাহ্‌হাল হাদীসু ফাহওয়া মাযহাবী” অর্থাৎ হাদীস যখন সহীহ প্রমানিত হবে তখন সেটাই হবে আমার মযহাব (শামী ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)।

### ঈদের জামাআত না পেলে

একদা সাহাবী আনাস (রাযিঃ) ঈদের জামাআত না পাওয়ায় নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে দু-রাকআত নামায পড়েন (বুখারী, ১৩৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম বাইহাকী বলেন, যদি কেউ ঈদের জামাআত না পায় তাহলে সে নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গকে নিয়ে দু-রাকআত নামায কাযা পড়বে (বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)।

যদি কেউ ঈদের নামায এক রাকআত পায় তাহলে সে ঈদের ফযীলত পাবে এবং ইমামের সালাম ফেরার পর সে দ্বিতীয় রাকআত একা পড়ে নেবে। যে জামাআত পাবে না সে একলাও দু রাকআত পড়তে পারে। যদি দু বা তিন জন কিংবা তার চেয়ে বেশী লোক জমা হয়, চায় তারা পুরুষ হোক কিংবা নারী তারা জামাআত কোরে দু রাকআত পড়তে পারে। এমতাবস্থায় খুতবার প্রয়োজন নেই (বুখারী, দসতুরুল মোত্তাকী, ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামায ও তার ফযীলত

যখন কোন মুসলমান মারা যায় তখন তার আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ চংগে কিছু দুআ করা হয়। ঐ বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুআ করার নাম জানাযার

নামায। এই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জানাযায় শরীক হোয়ে নামায পড়ে এবং তাকে কবরও দেয় সে দু কীরাত নেকী পায়। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড় সমান নেকী। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামায পড়ে কিন্তু মাটি দেয়না সে এক কীরাত নেকী পাবে (বুখারী ও মুসলিম মিশকাত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামাযের জন্য অযু শর্ত

বিখ্যাত তাবিয়ী নাফেঅ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলতেন, কেউ যেন বিনা অযুতে জানাযার নামায না পড়ে (মুত্তা ইমাম মালিক, ৮০ পৃষ্ঠা)। তবে হাঁ, অযু করতে গিয়ে জানাযা যদি ছেড়ে যাবার আশংকা থাকে তাহলে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তুমি তায়াম্মুম করো এবং নামায পড় (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা)।

### লাশ ও ইমামের অবস্থান কিরূপ হবে

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহর পেছনে একটি মেয়ের জানাযা পড়ি। সে রক্তস্রাবে মারা গিয়েছিল। তখন তিনি (সঃ) লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়ান (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

একদা আনাস (রাযিঃ) একটি পুরুষ লাশের মাথা বরাবর এবং মহিলা লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ান। অতঃপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে এইরূপ দেখেছি (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)।

হানাফী মতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই জানাযায় ইমাম সাহেবকে লাশের বুক বরাবর দাঁড়ানো উচিত (শারহুন নিকা-য়াহ ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। মওলানা ইসমাতুল্লাহ রহমানী বলেন, সহীহ মরফু হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই (সলাতুল মোস্তফা, ২২৩ পৃষ্ঠা)।

### মুত্তাদীদের লাইন কটা হবে

মালিক ইবনে হোবাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, যে মুসলমানের মরার পর তার জানাযায় মুসলমানদের

তিন লাইন লোক নামায পড়ে তার জন্য (আল্লাহ তাআলা ক্ষমা) অপরিহার্য করে দেন। তাই জানাযা পড়েনেওলারা মোক্তাদীর সংখ্যা যখন কম মনে করতো তখন তারা মালেক (রাযিঃ) বর্ণিত এই হাদীসটির ভিত্তিতে তিনটি লাইন করে নিতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন, মোক্তাদী যদি তিন লাইনের কম হয়, যেমন চারজন, তাহলে তিন লাইন না কোরে দু লাইনে দুজন কোরে দাঁড়ানো আমার মতে পছন্দনীয় (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা)।

### মুসল্লী সংখ্যা কত হওয়া উচিত

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কোন মুসলমানের জন্যায় এমন (৪০) চল্লিশজন লোক যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি যদি শরীক হোয়ে ঐ লাশের জন্য দুআ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের সুপারিশ নিশ্চয়ই কবুল করবেন (মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামায পড়ার নিয়ম

আবু ওমামাহ ইবনে সাহল ইবনে হোনাযফ (রাযিঃ) বলেন, জানাযার নামাযে সুন্নত হল তকবীর দেওয়া। তারপর সূরায়ে ফাতেহা পড়া। তারপর নাবী (সঃ) এর উপরে দরুদ পড়া। তারপর মাইয়েতের জন্য আন্তরিক দুআ করা এবং প্রথম তকবীরের পর ছাড়া অন্য তকবীরের পর কেরাআত না পড়া (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, নাসায়ী, ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)।

কোন এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, জানাযার নামাযে সুন্নত হল ইমামের তকবীর দেওয়া। তারপর সূরায়ে ফাতেহা মনে মনে পড়া এবং পরবর্তী তকবীরগুলোতে লাশের জন্য বিশেষ দুআ পড়া এবং ঐ তকবীরগুলোতে অন্য কিছু না পড়া। তারপর সালাম ফেরা (মুসনাদে শাফিযী, মা'রিফাতু বায়হাকী, তালখীসুল হাবীর, ১৬১ পৃষ্ঠা)।

তাবিয়ী মনীযী ইমাম শা'বী বলেন, জানাযার নামাযে প্রথম তকবীর দেওয়ার পর আল্লাহর হামদ ও সানা দিয়ে গুর কোরতে হবে এবং দ্বিতীয়

তকবীরের পর নাবী (সঃ) এর উপরে দরুদ, তৃতীয় তকবীরে লাশের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তকবীরের পরে সালাম ফিরে জানাযা শেষ কোরতে হবে (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ৩য় খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামাযে তকবীর কয়টা

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার আবু হাসমার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সঃ) জানাযার নামাযে চার (৪) পাঁচ (৫) সাত (৭) ও আট (৮) তকবীর দিতেন। পরিশেষে নায্জাশীর মৃত্যু হলে তিনি লোকেদের নিয়ে মাঠে নামায পড়েন এবং চার (৪) তকবীর দেন। তারপর তিনি ঐ চার তকবীরে অটল থাকেন। অবশেষে তাঁর অফাত হয় (ইস্তিয্কা-র, তালখীসুল হাবীর, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)।

মাওলানা আহমাদ হাসান দেহলভী (রহঃ) এবং মাওলানা আবদুর রউফ রহমানী ঝাণানগরী (রহঃ) বাইহাকীর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন যে, ওমর (রাযিঃ) চার তকবীরের ব্যাপারে সাহাবীদের এজমা করে দেন (হাশিয়াতুদ দেহলভী আলা-বুলুগিল মারা-ম, ১ম খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা এবং নামায কে আহকাম ও মাসায়েল, ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

ঐ এজমার ব্যাপারে ইমাম ইবনে হায়ম (রহঃ) বলেন, ওমর (রাযিঃ) এর চার তকবীরের উপর এজমা করা সংক্রান্ত সব হাদীসগুলোই অত্যন্ত যয়ীফ। তাই ঐ এজমার দাবী মিথ্যা (মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা)। জানাযার তকবীর পাঁচ। তার বেশী নয় এবং চারও উত্তম, কিন্তু তার কম নয় (ঐ, ১২৪ পৃষ্ঠা)। এজন্য অধিকাংশ সমাজে প্রচলিত তকবীর সংখ্যা চার।

### জানাযার নামাযে সানা পড়তে হবে কিনা

জানাযার নামাযে সানা পড়তে হবে কিনা কোন মরফু হাদীস দ্বারা জানা যায়না। তাই ইমাম নবভী বলেন, সঠিক মতে সানা পড়তে হবেনা। তবে সঠিক মতে আউযু পড়তে হবে (রওযাতুত তলবীন ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)

বলেন, একদা আবু হুরাইরা (রাযিঃ)কে জানাযা পড়ার ঢং জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লাশ রাখার পর আমি তকবীর দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করি এবং নাবী (সঃ) এর উপরে দরুদ পড়ি, তারপর বলি....(মুত্তত্তা ইমাম মালেক ৭৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসে বর্ণিত ‘প্রশংসা করি’ বাক্য দ্বারা প্রমানিত হয় যে, জানাযায় সানা পড়তে হবে (কিতাবুল জানা-য়িয়, ৫৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফার মতে সানা পড়তে হবে (মুসাওওয়া, ২০০ পৃষ্ঠা)। নাসায়ী শরীফের টীকা লেখক পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আতাউল্লাহ হানীফ ভুজয়ানী ও আল্লামা ইসমায়ীল গুজরানওলাও বলেন, সানা পড়তে হবে (রসুলে আকরম কী নামায, ১৪২ পৃষ্ঠা)।

### সানার পর সূরায়ে ফাতেহা ও একটি সূরা

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নাবী (সঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়েন (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত, ১৪৬ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ, ১০৮ পৃষ্ঠা)। এক আনসারী নারী উম্মে শারীক বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে জানাযাতে সূরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দেন (ইবনে মাজাহ ১০৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটি কিঞ্চিৎ বরীফ। কিন্তু ইবনে আব্বাস বর্ণিত অন্য সহীহ হাদীস এর সমর্থক। একদা ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা চিলে পড়ে বলেন, তোমরা জেনে নাও যে, এটা (চৈঁচিয়ে পড়া) সুন্নত (বুখারী, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইবনে আবী শায়বা, তালখীসুল হাবীর, ১৬০ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি (রাযিঃ) সূরা ফাতেহার পর একটি সূরাও চৈঁচিয়ে পড়েন (বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা, আবু ইয়াল্লা, নাসবুর রা-য়াহ, ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠার ৮নং টিকা)।

একদা সাহাবী মিস্‌অর ইবনে মাখরামাহ জানাযার নামাযে প্রথম তকবীরে সূরা ফাতেহা এবং একটি সূরা চিলে পড়ে বলেন যে, আমি মসলা জানি না তা নয়, বরং আমার ইচ্ছা তোমাদের জানিয়ে দিই যে,



এটা সুন্নত কাজ (মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

বিখ্যাত সাহাবী ইবনে মসউদ জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়েন (ইবনে আবী শায়বা, ৩য় খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমরিবনে আ-স ও জাবের এবং সাহল ইবনে হোনায়ফ জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়েন (কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা, হাকেম, ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠার ৫ নং টীকা)। ইমাম নবভী বলেন, সূরা ফাতেহার শেষে আমীন বলতে হবে (রওযাতুত তালিবীন ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)।

### দ্বিতীয় তকবীরের পর দরুদ পড়তে হবে

প্রথম তকবীরের পর নীরবে সানা এবং চৈচিয়ে সূরা ফাতেহা ও একটি ছোট সূরা চিল্ল পড়ার পর দ্বিতীয় তকবীর দিয়ে নাবী (সঃ) এর উপরে দরুদ পড়তে হবে। নামাযে আত্তাহিয়াতের পর যে দরুদ পড়া হয় সেই দরুদই জানাযার দ্বিতীয় তকবীরের পর পড়তে হবে।

এই দরুদ চৈচিয়ে না আস্তে কিভাবে পড়া হবে সে সম্পর্কে আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, জানাযার নামাযে দরুদ চিল্ল পড়া সম্পর্কে কোন স্পষ্ট সহীহ হাদীস প্রমানিত নেই। অতএব দরুদ নীরবে পড়া উচিত (কিতাবুল জানা-য়েয, ৬১ পৃষ্ঠা ও ২ নং টীকা)।

### তৃতীয় তকবীরের পর লাশের জন্য আন্তরিক দুআ

নীরবে দরুদ শরীফ পড়ার পর তৃতীয় তকবীর দিয়ে তারপর লাশের জন্য বিশেষ দুআ করতে হবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন লাশের জন্য নামায পড়বে তখন তার জন্য আন্তরিক দুআ করবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১৪৬ পৃষ্ঠা)।

মাইয়েতের জন্য এই দুআ বিভিন্ন বর্ণনায় প্রায় ১০ রকম পাওয়া যায় (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ৩য় খণ্ড, ২৯১-২৯৪ পৃষ্ঠা)

তা-বিত্তী ইবরাহীম বলেন, মাইয়েতের জন্য কোন দুআ খাস নেই। ওর মধ্যে যেটা চাও পড়তে পার (ত্রি, ২৯৪ পৃষ্ঠা)।

তাই এখানে বিখ্যাত ও সর্বজন আমলকৃত দুটি দুআ পেশ করা হল।

আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন জানাযার নামায পড়তেন তখন এই দুআ পড়তেন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا  
وَأَنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَرَفَهُ  
عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ \*

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মাগ্ফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা০ অশা-হিদিনা  
অগা-য়িবিনা০ অ স্ফীরিনা অকাবীরিনা০ অযাকারিনা অউন্সা-না০ আল্লা-  
হুম্মা মান আহ্য্যাইতাহূ মিন্না ফাআহ্যিহী আ'লাল ইসলা-ম অমান্  
তাঅফ্ফাইতাহূ মিন্না ফতাঅফ্ফাহূ আ'লাল ইমা-ন০ আল্লা-হুম্মা লা-  
তাহরিননা আজ্জাহূ অলা-তাফ্তিমা-বা'দাহূ০

তরজমাঃ আল্লাহ গো! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়)  
উপস্থিত ও অনুপস্থিত আর আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নর ও  
নারী সবাইকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে থেকে তুমি যাকে  
বাঁচিয়ে রাখবে তাকে তুমি ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রেখো এবং যাকে  
তুমি মারতে চাও তাকে তুমি ঈমানের অবস্থায় মেরো। আর আল্লাহ এই  
লাশের প্রতিদান থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এরপরে  
আমাদেরকে ফেতনায়ও ফেলোনা (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে  
মাজা, মিশকাত, ১৪৬ পৃষ্ঠা এবং মুসলিম, বুলুগুল মারা-ম, ৪০ পৃষ্ঠা)।

### এক সাহাবীর প্রিয় দুআ

আওফ ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি  
জানাযার নামায পড়েন। অতঃপর আমি তাঁর দুআর মধ্যে হতে এই  
দুআটি মুখস্থ করে নিই। (দুআটি শুনে) আমার আকাংখা হল যে, আমি  
যদি ঐ মাইয়েতটা হতাম (তাহলে মরণটা সার্থক হোত) -মুসলিম, মিশকাত,  
১৪৫ পৃষ্ঠা)।

মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, জানাযার দুআর ব্যাপারে  
আওফ ইবনে মালেক বর্ণিত এই হাদীসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ (তালখীসুল  
হাবীর, ১৬১ পৃষ্ঠা)। দুআটি এই:-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ  
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِّ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ  
مِنَ الدَّنَسِ - وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا  
مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \*

উচ্চারণ:- আল্লা-হুমাগ্ফির লাহ অরহাম্হু অআ'-ফিহী অঅ'ফু  
আ'নহু অআক্রিম নুযলাহ ওয়াঅসসিসঅ' মুদখালাহু অগসিলহু বিলমা-  
ল্লি অস্সালজি অলবারাদিও অনাক্কিহী মিনাল খাতা-য়া কামা-নাক্কাইতাস  
সাওবাল আবয়ায়া মিনাদ দানাসিও অআব্দিলহু দা-রান্ খায়রাম্ মিন  
দা-রিহী অআহ্লান খাইরাম্ মিন আহ্লিহী অযাওজান খাইরাম্ মিন  
যাওজিহীও অআদখিলহল জাল্লাতা অআ'য়িহু মিন ফিত্নাতিল্ কাব্রি  
ওয়া আ'যা-বিন না-রুও.

তরজমা:- আল্লাহ গো! তুমি এই লাশকে ক্ষমা করো এবং এর উপরে  
দয়া করো। আর একে নিরাপদে রাখো এবং এর গোনাহ্ মাফ করো।  
আর এর আতিথ্য সম্মানের করো এবং এর প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করো। আর  
একে পানি এবং বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধুয়ে ফেল এবং একে দোষত্রুটি  
থেকে ঐভাবে পরিস্কার করো যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে  
সাফ করো। আর এর পার্শ্ব ঘরের বদলে তুমি একে একটি উত্তম ঘর  
দান করো এবং এর পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার এবং জুড়ির  
বদলে এক উত্তম জুড়ি দান করো। আর একে তুমি জাল্লাতে দাখেল করো  
এবং কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে একে মুক্তি  
দিও।

উক্ত দুআগুলো পড়ার পর চতুর্থ তকবীর দিয়ে তারপর সালাম ফিরে  
জানাযার নামায শেষ করতে হবে। এই হাদীসের বর্ণনাকারীর উক্তি  
সাক্ষ্য দেয় যে, এই দুআগুলো রসূলুল্লাহ (সঃ) চোঁচিয়ে পড়েছিলেন।

## চতুর্থ তকবীরের পর একটু দেরী করা ও তারপরে

### সালাম ফেরা

যায়দ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সঃ) চার (৪) তকবীর দিতেন। তারপর একটু থামতেন যতক্ষণ তিনি চাইতেন। আমার মনে হয় এই দেরীটা এই জন্য করতেন যাতে শেষ কাতারের লোক তকবীর দিতে পারে। তারপর তিনি ডানদিকে এক সালাম ফিরতেন এবং প্রত্যেক তকবীরের সাথে দুই হাত তুলতেন (মুসনাদে শাফিয়ী, আলআসয়িলাহ, ১ম খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামাযে সালাম কয়টা

সাহাবী ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা এবং তা-বিরী সায়ীদ ইবনে জোবায়র প্রমুখ জানাযার শেষে কেবল ডানদিকে সালাম ফিরতেন (ইবনে আবী শায়বা, ৩য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)। তাই ইমাম আহমাদের মতে জানাযার নামাযে সালাম একটা।

সাহাবী আ-মির ডাইনে ও বামে দুদিকে সালাম ফিরতেন (ঐ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)। ইবনে মসউদ বলেন, জানাযার সালাম অন্যান্য নামাযের সালামের মত হবে। অর্থাৎ দুই সালাম। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে দুই সালাম দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)। ইমাম ইবনে হায্ম এবং আহলে হাদীসদের মতও তাই।

### শিশুদের জন্য আলাদা দুআ

হাসান (রাযিঃ) শিশুদের জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ে এই দুআ

পড়তেনঃ- **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذَخْرًا وَأَجْرًا** ☆

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজ্জ আ'ল্‌হ লানা সালাফাও অফারাফাও অযুখরাও অ আজরা।

তরজমাঃ- হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্ববর্তী ও

অগ্রগামী এবং পরকালের ধনভাণ্ডার ও পুরস্কার কোরে দাও (তা'লীকে বুখারী, মিশকাত, ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

## জানাযার দুআগুলো চেষ্টায়ে না আস্তে

আগে হাদীস পেশ করা হয়েছে যে, দরুদ শরীফ ছাড়া বাকি দুআগুলো চিল্পে পড়া যেতে পারে, বরং তা চেষ্টায়ে পড়া উচিত। যাতে অনেকে তা জেনে ও শিখে নিতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লামা সা'লবী হানাকী আল্লামা যায়লায়ী হাশিয়ায় বলেন, ইমাম আবু ইউসুফের মতে তা খুব চিল্পে পড়া নয় এবং একেবারে নীরবেও নয় (যাখীরাহ, ২৪১ পৃষ্ঠা)। বরং উত্তম হল মাঝামাঝি পড়া (ফাতা-ওয়া তাতারখানিয়া, ২৬৮ পৃষ্ঠা ও যাহরাতু রিয়া-যিল আবরার, ২৭৪ পৃষ্ঠা)।

## তকবীরগুলো দেবার সময় দুই হাত তুলতে হবে কিনা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দুটি হাত তুলতেন প্রত্যেক নামাযে তকবীরের সময় এবং জানাযার উপরেও (তাবারানী আওসাত, মাজমাউন্ যাওয়া-য়িদ ২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা, ইলা-লে দারাকুতনী, নাসবুর যা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, দুই সাহাবী ইবনে উমার ও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা জানাযার নামাযে প্রত্যেক তকবীরে দুই হাত তুলতেন (বাইহাকী ৪র্থ খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, যা-দুল মাআদ ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব, কা-সিম ইবনে মুহাম্মাদ, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, উরহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে আবী রাবাহ, ইবনে শিহাব যুহরী, প্রমুখ (সাহাবী ও তাবয়ীগণ) যখন জানাযার নামাযে তকবীর দিতেন তখন তাঁরা প্রত্যেক তকবীরেই দুই হাত তুলতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৩য় খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম মা-লিক ইবনে অহাবে বলেন, জানাযার চার তকবীরে দুই হাত তোলা যাকে ভাল লাগে সে তুলবে (আলমুদাও'না তুল কুবরা ১৬০ পৃষ্ঠা)।

ইমাম শা-ফিয়ী বলেন, সাহাবীদের হাদীস এবং রসূলুল্লাহর সুন্নত

অনুসারে মুসল্লীগণ জানাযার প্রত্যেক তকবীরে দুই হাত তুলবে (কিতাবুল উন্ম ১ম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) বলেন, জানাযার চার তকবীরের মাঝে রসূলুল্লাহ (সঃ) হাত তুলতেন বলে যে কয়টি হাদীস পাওয়া যায় সব কটিই যযীফ। তবে হাঁ, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীসে আছে যে, তাঁরা দুজন চার তকবীরের মাঝে দুইহাত তুলতেন-হাদীসগুলো সহীহ ও বিশ্বস্ত। তিন ইমাম, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের মতে প্রত্যেক তকবীরেরই দুই হাত তোলা উচিত (কিতাবুল জানা-য়েয, ৬৩ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফার মতে প্রথম তকবীর ছাড়া বাকী তকবীরে হাত তোলা যাবে না। তাঁর দলীল তিরমিযী ও দারাকুতনী বর্ণিত দুটি হাদীস সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী হানাফী বলেন, ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী এবং ইবনে মায়ীন ও উকাইলীর মতে ঐ দুটি হাদীসও যযীফ (নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

অধিকাংশ আহলে হাদীস আলেমের মতে প্রত্যেক তকবীরে দুই হাত তুলতে হবে। এই তকবীরের সময় কিছুলোক উপর দিকে মাথা তোলে। তা তাদের মনগড়া কাজ।

### দুআর শব্দে কোন পরিবর্তন হবে না

বাংলাদেশের দুই আলেম মওলানা আহমাদ আলী এবং মওলানা ইবনে ফযল সাহেব লিখেছেনঃ বালিকা হইলে আজআলহো-র স্থলে ‘হা’ পড়তে হবে (আদর্শ নামায শিক্ষা, ১২৫ পৃষ্ঠা, সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)।

এঁদের মত কোন কোন আলেম বলেন যে, লাশটি নারী হলে তার দুআর সর্বনামগুলো স্ত্রীলিঙ্গ পড়তে হবে। তাঁদের এইমত ব্যক্তিগত এবং কিয়াসী মত। হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই।

ইমাম শওকানী বলেন, মাইয়েত পুরুষ ও স্ত্রী যেকোন হোক না কেন তার জানাযার হাদীসের দুআগুলো যেমন হাদীসে আছে তেমনই হুবহু পড়তে হবে। লাশ স্ত্রী হলে সর্বনামগুলো স্ত্রীলিঙ্গে বদলানো যাবেনা।

কারণ, ঐ সর্বনামের বিশেষ্য 'মাইয়েত' যা লাশ। স্ত্রীলোকটি নয়। আর আরাবীতে 'মাইয়েত' শব্দটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা)।

### মেয়েরাও জানাযা পড়তে পারে

মেয়েদেরও জানাযার নামায পড়া বৈধ। কারণ, রসূলুল্লাহর (সঃ) স্ত্রীগণ এক সাহাবী সা'দ ইবনে আবী অক্কাসের জানাযার নামায মসজিদে পড়েছিলেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে মেয়েরা জানাযার নামায একা একা পড়বে, তবে জামাআতে করলেও চলবে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের মতে জামাআতে পড়া উচিত এবং মেয়েদের ইমামকে মেয়েদেরই মাঝখানে দাঁড়াতে হবে (আলমুগনী, সলাতুল মোস্তফা, ২৩০ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামায পুরো না পেলে

তাবিয়ী 'নাফে' বলেন, জানাযার নামাযে কোন তকবীর ছেড়ে গেলে সাহাবী ইবনে ওমর তা পুরো করতেন না। এইরূপ তাবিয়ী ইমাম শা'বী ও ইমাম আতা বলেন, জানাযার নামাযে তোমার কোন তকবীর ছাড় গেলে তা পুরো কোরতে হবেনা (ইবনে আবী শায়বা ৩য় খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)।

একটি হাদীসে আছে, একদা মা আয়েশার এক প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমি যে তকবীর শুনে পাও সেই তকবীর দাও আর যা ছাড় যায় তা পুরো কোরতে হবেনা (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) মুত্তা ইমাম মালেকের বরাত দিয়ে ইমাম যুহরী তাবিয়ীর ফতওয়া পেশ করেছেন যে, জানাযার নামাযের কিছু অংশ ছেড়ে গেলে তা অন্যান্য নামাযের মত পূরন করতে হবে (কিতাবুল জানা-য়য ৭০-৭১ পৃষ্ঠা)।

এটা হল একজন তাবিয়ীর ফতওয়া এবং উপরের দুটো ফতওয়া

একজন সাহাবী ও দুজন তাবিরীর ফতওয়া। আমার মতে সাহাবীর ফতওয়াই অগ্রাধিকার যোগ্য। অতএব জানাযার কিছু অংশ ছাড় গেলে তা পুরো করতে হবেনা। বিবেকও তাই বলে।

আল্লামা মুল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, জানাযার নামাযে পিছপড়া ব্যক্তি তার থেকে যা যা ছাড় যাবে তা সে একের পর এক পূরণ করবে (শারহুন নিকা-য়াহ ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। এর প্রমানে তিনি কোন হাদীস পেশ করতে পারেন নি। তাই এটা তাঁর বিবেকী ফতওয়া।

### সদ্য ভূমিষ্ট ও খসে যাওয়া সন্তানের জানাযা

নাবী (সঃ) বলেন, সদ্য ভূমিষ্ট শিশু যদি আওয়ায না দেয় কিংবা নড়াচড়া না করে তাহলে ঐ মৃত সন্তানের উপর জানাযা পড়তে হবেনা (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

তিনি (সঃ) বলেন, খসে যাওয়া সন্তানের উপরেও জানাযা পড়তে হবে এবং তার মা-বাপের জন্য ক্ষমা ও দয়ার দুআ করতে হবে (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, মিশকাত, ১৪৬ পৃষ্ঠা)।

১ম হাদীসটি দ্বারা প্রমানিত হয় যে, খসে যাওয়া সন্তানের মধ্যে যদি জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় তাহলে তার জানাযা পড়তে হবে। অন্যথায় মৃত হলে বিনা জানাযায় তাকে কবর দিতে হবে।

### কোন লাশের কাটা অংশে জানাযার নামায

কোন লাশের যদি কোন কাটা অঙ্গ যেমন হাত, পা, মাথা ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহলে ঐ অঙ্গটিকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়তে হবে। যেমন একদা আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) একজন লোকের পা-য়ের উপর জানাযা পড়িয়েছিলেন (আহমাদ)। একদা ওমর সিরিয়াতে কিছু হাড়ের উপর এবং আবু ওবায়দা (রাযিঃ) মাথার উপরে জানাযা পড়িয়েছিলেন (আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ)।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, একদা উটের যুদ্ধের পর একটি পাখী একটি হাত মক্কায় উড়িয়ে এনে ফেলে দেয়। তার আংটি দেখে চেনা যায় যে, ঐ হাতটি ইতাব ইবনে ওসায়েদের। তখন মক্কাবাসীরা ঐ হাতটির উপরে



জানাযার নামায পড়েন । তবে হাঁ, চোর ও ডাকাতের কাটা হাতের উপর জানাযা হবেনা (মুহাল্লা ৫ম খণ্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা, ও আলআসয়িলাহ ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)।

### আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও ফাসেকের জানাযা

সাহাবী জাবের বলেন, একদা নাবী(সঃ) এর কাছে একজন আত্মহত্যাকারীর লাশ আনা হলে তিনি তার জানাযা পড়েননি(মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩৯ পৃষ্ঠা)। এইরূপ জোহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারের দিনে গনীমতের (জেহাদেলন্ধ) মাল চুরি করায় নাবী (সঃ) তার জানাযা না পড়ে বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও (বুখারী মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী)।

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কিরাম বলেন, আত্মহত্যাকারী এবং চোর ও ডাকাতের জানাযা আলেম ও পরহেযগার লোক না পড়ে সাধারণ লোক পড়বে। যাতে অন্যান্য লোকেরা সাবধান হয়ে যায় এবং শিক্ষা পায়।

কিন্তু ইমাম ইবনে হাযম বলেন, প্রত্যেক মুসলমান চায় সে ফাসেক হোক কিংবা সৎ, সে ব্যভিচারের শাস্তিতে কতলকৃত হোক কিংবা কোন চরম পাপী, তাদের জানাযা ইমাম সাহেবই পড়বেন। এইরূপ কোন বেদআতী যদি কাফেরের পর্যায় পৌঁছে না যায় তাহলে তারও জানাযা পড়তে হবে। কারণ, কুরআন ও হাদীসের দলীল সহ যুক্তিও বলে যে, একজন ফাসেক তো কোন মহান ব্যক্তির তুলনায় তার মুমিন ভাইয়ের দু'আর মুখাপেক্ষী বেশী। তাই বিখ্যাত তাবেয়ী আতা (রহঃ) জারজ সন্তান ও তার ব্যভিচারিণী মা এবং খুনের দায়ে নিহত ও ব্যভিচারের দায়ে নিহত আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের শাস্তিতে কতলকৃত প্রভৃতি লোকেদের জানাযা পড়তেন (মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ১৬৯ ও ১৭১ পৃষ্ঠা)।

### গায়েবী জানাযা

আবীসিনিয়ার বাদশাহ আসহিমাহ নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিন নাবী (সঃ) সাহাবীদেরকে ঐ মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে

মাঠে গিয়ে চার তকবীর সহকারে গায়েবী জানাযা পড়েন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে হাযম বলেন, এই হাদীস প্রমান করে যে, জামাআত সহকারে গায়েবী জানাযা পড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বা সর্ববাদীসম্মত অভিমত। এর খেলাফ করা বৈধ নয় (মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক এর বিরোধী। কিন্তু তাঁদের দুজনের কাছে তাঁদের দাবীর প্রমানে ব্যক্তিগত যুক্তি ছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে কোন দলীল নেই (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৫৩৫ পৃষ্ঠা)।

তাই বাস্তবে দেখা গেছে যে, যুলফিকার আলী ভুটোর ফাঁসির পর পাক-ভারত-বাংলাদেশের হাজার হাজার হানাফী তাঁদের ফিকহের ফতওয়া না মেনে গায়েবী জানাযাহ পড়েছেন।

ঐ বিরোধীদের সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল জালীল সামরুদী (রহঃ) বলেন, খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যারা ‘গায়েবী জানাযা’ মানেনা তাঁরাই আবার উপরোক্ত হাদীসটিরই একাংশ দ্বারা জানাযার তকবীর প্রমান করেন যাকে শরীআতও অসম্ভব মনে করে (যাহ-রাতু রিযা-যিল আবরা-র, ২৮১ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন —আমিন!

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ যাইলারী হানাফী (রহঃ) ইমাম বাইহাকীর এযং ওরা-কিদীর কিতাবুল মাগা-যীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সঃ) মৃত্যু যুদ্ধের দুই শহীদ রসূলুল্লাহর পালক পুত্র যায়দ ইবনে হা-রিসাহ এবং হযরত আলীর বড় ভাই জাফর ইবনে আবী তা-লিবের গায়েবী জানাযাহ পড়েছিলেন (নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)।

### মুসলমান ও অমুসলমানের লাশ মিশে গেলে

যদি কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা দাঙ্গায় অনেক লোক মারা যায় এবং তাদের মধ্যে মুসলমান ও অমুসলমান কোনটা বোঝা না যায় তথাপি সবাইকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়া অজৈব। যদি সবারই জানাযা একেবারে পড়া হয় তা জায়েয কিংবা প্রত্যেকের যদি আলাদা আলাদা পড়া হয় তাও জায়েয। নিয়্যাতের সময় এই কথাগুলো বলতে হবে: আল্লা-হুমাগ্‌ফির লাহ ইন কা-না মুসলিমান—অর্থাৎ আল্লাহ গো! তুমি একে ক্ষমা করো

যদি ইনি মুসলমান হয় (রওয়াতুত তলেবীন, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নবভী বলেন, আমার মতে সবার জানাযা একবারেই পড়া উত্তম। আর শহীদের লাশের সাথে বিনা শহীদের লাশ মিশে গেলে তার হুকুমও ঐরূপ হবে যেমন মুসলমানের সাথে কাফেরের লাশ মিশে গেলে হয়। (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)।

### একাধিক লাশের জানাযার নিয়ম

তাবিয়ী নাফেঅ্ বলেন, একদা ইবনে ওমর (রাযিঃ) নয়জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়েন। তখন তিনি ইমামের সামনে পুরুষের লাশ রাখেন এবং পুরুষের ডান পাশে কিবলার দিকে নারীদের লাশ রাখেন। অতঃপর সবারই জানাযা একসাথে একবারে পড়েন। এইরূপ একদা ওমরের পুত্র যায়দের লাশ ইমামের সামনে রেখে তার ডান পাশে কিবলার দিকে তাঁর মা হযরত আলীর কন্যা উম্মে কুলসূমের লাশ রাখা হয়। ইমাম ছিলেন সায়ীদ ইবনুল আ'-স (রাযিঃ)। ঐ জানাযায় হাসান, হোসায়ন, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর, আবু সায়ীদ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ ৮০ জন সাহাবী শরীক ছিলেন।

হাদীসেও আছে যে, নাবালক শিশু এবং নারীর জানাযা একসাথে হলে বাচ্চাটা ইমামের সামনে থাকবে এবং নারীটিকে কেবলার দিকে রাখতে হবে। এইরূপ যদি কোন জানাযায় পুরুষ ও নারী এবং বাচ্চা থাকে তাহলে প্রথমে পুরুষ, তারপরে নারী, পরপর কিবলার দিকে রাখতে হবে (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা ও আলআসয়িলাহ, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

### মসজিদে জানাযার নামায চলে কিনা

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বাইয়ার দুই পুত্র সুহাইল এবং তাঁর ভাইয়ের জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন (মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে অধিকাংশ আলেমের মতে মসজিদে জানাযা পড়া বৈধ। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে তা বৈধ

নয়। তাঁদের মতে আবু হুরাইরার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যেব্যক্তি মসজিদে কারো জানাযা পড়ে তার জন্য কিছুই নেই (তাহাভী)। অন্য বর্ণনায় আছে, তার জন্য কোন পুরস্কারই নেই (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। আর এক বর্ণনায় আছে, সে নামায, নামাযই নয় (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ)।

উক্ত হাদীসগুলো পেশ করার পর হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী কারী বলেন, “তার জন্য কোন পুরস্কার নেই” -বাক্যটি মারাত্মক ভুল। আর বাকী বর্ণনাগুলোও যরীফ (শারহুন নিকায়াহ ১ম খণ্ড, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা)।

আর এক হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যাইলারী বলেন, ঐরূপ হাদীস ইবনে আদীর আলকা-মিলেও আছে। কিন্তু ইমাম নবভী বলেন, ঐ সব হাদীসই যরীফ। যা দলীলযোগ্য হতে পারেনা (নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা)।

মোসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা এবং সুনানে সাঈদ ইবনে মনসুরে আছে যে, ওমর (রাযিঃ) খলিফা আবু বাক্বরের জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন (হাশিয়া দেহলাভী আলা-বুলুগিল মারা-ম, ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে হাফেয ইবনুল কাইয়েম বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই মসজিদের বাইরে জানাযা পড়তেন এবং কখনো কখনো মসজিদের ভেতরেও পড়েছেন। দুরকমই জায়েয। তবে অসুবিধা না হলে মসজিদের বাইরে পড়াটাই উত্তম (যা-দুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)।

### কবরে জানাযার নামায

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করেন যে, একে মাটি কখন দেওয়া হয়েছে? লোকেরা বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন, আমাকে তোমরা খবর দাওনি কেন? তাঁরা বললেন, রাতের অন্ধকারে আমরা তাকে মাটি দিয়েছি। তাই আপনাকে ঘুম থেকে জাগাতে ভাল মনে করিনি। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। ফলে আমরাও তাঁর পেছনে লাইন দিলাম। তিনি ঐ কবরে জানাযা পড়লেন (বুখারী মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, একদা নাবী (সঃ) একরাত পর, অন্যবারে তিনরাত পর এবং আর একবার এক মাস পর কবরে গিয়ে জানাযা পড়েন (যা-দুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ সাহাবী আবু হুরাইরা (মদীনা শরীফের গোরস্তান) জামাতুল বাকীর মাঝখানে আয়েশার কবরে জানাযা পড়েন। ইবনে ওমর এবং ওমর ইবনে আবদুল আযীযও তাই করেন (ফিক্‌হুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের উক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে সবারই মতে কবরেও জানাযা পড়া যেতে পারে। তবে হানাফী মতে নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে হানাফীদের কাছে ব্যক্তিগত কেয়াস ছাড়া কুরআন ও হাদীসের কোন দলীল নেই।

### দাফনের পরে কবরে আযান

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, কবরের নিকটে কেবলমাত্র যিয়ারত করা এবং দাঁড়িয়ে দুআ করা ছাড়া আর সব কাজ মকরুহ (ফাতহুল কাদীর ২য় খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বলেন, কবরে আযান দেওয়া সুন্নত নয়। ইবনে হাজার আস্কালানী তাঁর ফাতওয়া গ্রন্থে বলেন, ঐ আযান বিদআত (শামী ৬৫৯ পৃষ্ঠা)।

বিদআতের মধ্যে একটি, যা ভারতে প্রচলিত হয়ে গেছে—তা হল দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া (দুরারুল বিহা-র, রা-হে সুন্নত ৩৪০ পৃষ্ঠা)। ভারতের ব্রেলীপন্থী হানাফীগণ কবরে আযান দেন।

আল্লামা মাহমুদ বালানীর তানকীহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাওশীহে আছে, ঐ আযান কোন জিনিসই নয় (রা-হে সুন্নত ৩৪০ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার ইমাম কে হওয়া উচিত

মাইয়েত যদি জীবদ্দশায় তার জানাযা পড়বার জন্য কাউকে অসিয়্যত করে থাকে তাহলে সেইই জানাযা পড়াবে। যেমন খলীফা আবুবাকর ওমরকে, খলিফা ওমর সুহাইবকে এবং তাঁর পুত্র হাযেরকে, ইবনে

মসউদ ইবনে যুযায়রকে, আবু বাকরাহ আবু বরযাহকে এবং আয়েশা আবু হুরায়রাহকে তাঁদের জানাযা পড়াবার জন্য অসিয়্যত করেছিলেন। তাই তাঁরাই ওদের জানাযা পড়িয়েছিলেন। ফলে এটা ইজমায় পরিণত হয় (আল আস্য়িলাহ, ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নবভী বলেন, অসীর পর অলী বা মাইয়েতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জানাযা পড়বে। তারপর মসজিদের ইমাম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে প্রথমে পিতা, তারপর দাদা, তারপর পুত্র, তারপর পৌত্র, তারপর ভাই (রওয়াতুত তলিবীন, ২য় খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)।

### জানাযার নামাযের পরেই দুআ করা প্রসঙ্গে

দুই ব্রেলী হানাফী আলেম ও মুফতী আহমাদ ইয়ার খান কানযুল উম্মালের বরাত দিয়ে এবং মাওলানা মুহাম্মাদ উমার প্রমুখ বাইহাকী ও আলফাতহর রব্বানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাযিঃ) তাঁর মেয়ের জানাযা পড়েন। এবং চতুর্থ তকবীরের পর দুআ করেন। আর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে এরূপ করতে দেখেছি (জা-আল হাক্ক ২২৩ পৃষ্ঠা, মিকয়া-সে হানফিয়্যাত ৫৩৬ পৃষ্ঠার সারাংশ)।

উক্ত হাদীস দ্বারা জানাযার পরে দুআ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসটি দলীলের যোগ্য নয়। কারণ, ওর এক বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে মুসলিম আবদী হিজরীকে রিজালবিদ ইমাম ইয়াহইয়া- ইবনে মায়ীন বলেন, ওর হাদীস কিছুই নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, ওঁর হাদীস অস্বীকৃত। ইবনে আদী বলেন, ওঁর হাদীস আমার নিকট দলীলযোগ্য নয় (তাহযীবুত তাহযীব ১ম খণ্ড, ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা)।

অতএব এই হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। তাই এটা আমলযোগ্যও নয়। এই দুআ হানাফী সমাজের ব্রেলী গ্রুপরা করেন। তাই এবার দেখা যাক যে, এ ব্যাপারে হানাফী ফকীহগন কি বলেন। দ্বিতীয় আবু হানীফা আল্লামা ইবনে নুজাইম বলেন, জানাযার সালাম ফেরার পর দুআ করবেনা (আলবাহররুর রা-য়িক ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)।

হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, জানাযার নামায

পড়ার পরেই মাইয়েতের জন্য দুআ করবে না। কারণ, জানাযার নামাযে এটা বাড়াবাড়ি কাজ (মিরকা-ত ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা)।

জানাযার পর দুআকে যেসব হানাকী ফিকহ গ্রন্থে মাকরুহ তথা আপত্তিকর বলা হয়েছে তা হল এইঃ (মুহিত বা-বুল জানা-যাহ্, কুনয়্যাহ্, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা, খুলা-সাতুল ফাতা-ওয়া, ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, ফাতা-ওয়া সিরাত-জিয়াহ ২১৪ পৃষ্ঠা, ফাতা-ওয়া বাযযা-যিয়াহ ১ম খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, জামিউর রুমূয ১ম খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, নাকউল মুফতী অলমাসা-য়িল ৬১ পৃষ্ঠা প্রভৃতির বরাতে মাওলানা মুহাম্মাদ সারফারাজ খান সাফদার এর রা-হে সুন্নত ৩১৩-৩১৫ পৃষ্ঠা)।

### সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামায

আল্লামা আহমাদ যকী বাশা বলেন ১০ম হিজরীর ২৯শে শওয়াল মোতাবেক ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় মদীনা শরীফে সূর্যগ্রহণ হয়। ঐ দিনে রসূলুল্লাহ পুত্র ইবরাহীম মারা যান (মুহাল্লার ৫ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠার টীকা)।

তখন মুশরিকরা বলতে থাকে যে, ভূপৃষ্ঠের কোন মহান ব্যক্তি মারা গেলে(তার শোকে) সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই মুশরিকী ধারনার প্রতিবাদে নাবী (সঃ) বলেন, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং ঐ দুটি আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু। তিনি যখন চান ওদের মধ্যে কোন নতুন ব্যাপার সৃষ্টি করে দেন। অতএব ওদের কোনটা যখন গ্রহণগ্রহণ হবে তখন তোমরা ততক্ষণ নামায পড়তে থাকবে যতক্ষণ না গ্রহণ কেটে গিয়ে আলো ফুটে ওঠে (নাসায়ী, মিশকাত, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ লাগলে নামায পড়তে হবে। ঐ নামায কিভাবে পড়তে হবে তা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মুখে শুনুন।

### সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের বিশেষ ঢং

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়। ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েন এবং লোকেরাও তাঁর

সাথ দেন। প্রথমে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাকারা পড়ার মত কেরাআত পড়লেন। তারপর খুব লম্বা রুকু করলেন, ফের মাথা তুলে কেরাআত পড়তে লাগলেন। তবে প্রথম কেরাআতের চেয়ে দীর্ঘতায় একটু কম কেরাআত পড়ে তিনি রুকুতে গেলেন। এবারের রুকু প্রথম রুকু চেয়েও একটু কম হল। তারপরে তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে সেজদা দিলেন, তারপর সেজদা সেরে তিনি দাঁড়ালেন। অতঃপর লম্বা কেরাআত পড়লেন, তবে প্রথমে তুলনায় একটু ছোট কেরাআত। তারপর তিনি লম্বা রুকু করলেন, যা প্রথম রুকু চেয়ে কম ছিল। তারপর মাথা তুলে আবার কেরাআত পড়লেন, যা প্রথমে তুলনায় একটু ছোট ছিল। অতঃপর লম্বা রুকু করলেন, যা প্রথমে তুলনায় একটু কম ছিল। তারপর তিনি মাথা তুলে সেজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরলেন। ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি খুতবা দিলেন এই বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এরা গ্রহণগ্রহস্থ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর যিকর কোরবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায পড়তে হবে। ঐ নামায দু রাকআত হবে। ওতে রুকু চারটি হবে এবং নামায জামাআত সহকারে হবে। এই জামাআতের জন্য ঘোষণাও করতে হবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

### এই নামাযে রুকু কয়টি?

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই দু-রাকআত নামাযের রুকু সংখ্যা দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, আট ও দশ হতে পারে (মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত, ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা ও ইবনে আবী শায়বা, ২য়খণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনুল কাইয়েম বলেন, চার রুকু হাদীসটি সবচেয়ে সহীহ (যা-দুল মাআ-দ ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)। আল্লামা আবদুল হাই লখনভী হানাফীও তাই বলেন (যাফারুল আমা-নী বিশারহি মুকাদ্দামাতিল জুরজা-নী, ২৩১ পৃষ্ঠা)।



তাই মালিকী ও শাফিয়ী, হাম্বলী ও আহলে হাদীসদের মতে এই দু রাকআত নামাযে রুকু (৪) চারটি হবে। কেবল ইমাম আবু হানীফা এবং কুফাবাসীদের মতে ওতে ঈদ ও জুমআর মত দুটি রুকু হবে (বিদা-য়াতুল মুজতাহিদ ১ম খণ্ড ২০৩পৃষ্ঠা, শারহুন নিকা-য়াহ ১ম খণ্ড ১০৫পৃষ্ঠা)।

### এই নামাযের কিরাআত

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আনকাবুত এবং ২য় রাকআতে সূরা রুম কিংবা সূরা লুকমান পড়েন (দারাকুতনী, বায়হাকী, তলখীসুল হাবীর, ১৪৮ পৃষ্ঠা)। হাসান বলেন, একদা নাবী (সঃ) সূর্যগ্রহণের নামাযের একটি রাকআতে সূরা নাজম পড়েন (ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)।

আসমা বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যগ্রহণের নামাযে এত লম্বা কিরাআত পড়েন যে, আমি বেসামাল হয়ে পড়ি। ফলে আমি নিজের সামনে পানির মশক থেকে পানি নিয়ে নিজের মাথায় ঢালতে থাকি (মুসলিম)। সাহাবী ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন, একদা সূর্যগ্রহণের নামাযে লম্বা কিরাআত ধরার কারণে কিছু লোক বেহুঁশ হয়ে পড়ে। ফলে পানির বালতি ভরে ভরে তাদের মাথায় ঢালা হয় (আবু দাউদ)।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কিরূপ আগ্রহ সহকারে সূর্যগ্রহণের নামায পড়তেন। কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ লোকই ঐ নামাযের প্রতি ভ্রক্ষেপই করে না। তাই আমাদের উচিত সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় জামাআতের ঘোষণা কোরে জামাআত সহকারে নামায পড়া। কোন জায়গায় যদি জামাআত না হয় তাহলে ঘরে একা একা ঐ নামায পড়া উচিত। গ্রহণ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয় এবং লম্বা কিরাআত না জানার কারণে নামায যদি জলদি শেষ হয়ে যায় তাহলে নামাযের জায়গায় বসে বসে দুই হাত তুলে তাসবীহ ও তাকবীর এবং তাহমীদ ও তাহলীল অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ও আল্লা-হু আকবার এবং আলহামদু লিল্লা-হ ও লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ এবং অন্যান্য দুআ পড়তে হবে। পরিশেষে গ্রহণ যেন শেষ হয়ে যায় (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ২য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা ও ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নবভী বলেন, চন্দ্রগ্রহণের নামাযে কিরাআত চোঁচিয়ে পড়া এবং সূর্যগ্রহণে নীরবে পড়া পছন্দনীয় (রওয়াতুত ত-লিবীন, ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)।

এর প্রতিবাদে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, সহীহ ইবনে হিব্বানে আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সঃ) সূর্যগ্রহণের নামাযে কিরাআত চোঁচিয়ে পড়েছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, এই চিল্পে পড়া হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ (তালখীসুল হাবীর, ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

এই কিরাআত চোঁচিয়ে হবে, নীরবে, এ ব্যাপারে হানাফী ইমামগণ দ্বিধাগ্রস্ত। ইমাম আবু হানাফীর মতে, সূর্যগ্রহণের নামাযের কিরাআত নীরবে হবে (শারহুন নিকা-য়াহ ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, এই কিরাআত চোঁচিয়ে হবে। কারণ, এই জামাআতেও ঈদের মত জামাআত করা হয় (আল্ জাওহারাতুন নাইয়িরাহ শারহে কুদুরী, ৯৭ পৃষ্ঠা)।

### সূর্য গ্রহণের নামাযে খুতবা আছে কিনা

হানাফী ফিক্হ হেদায়া বলে যে, সূর্যগ্রহণের নামাযে কোন খুতবা নেই। কারণ, এর প্রমাণ নেই। এই দাবীর প্রতিবাদে আল্লামা যায়লায়ী হানাফী বলেন, এই দাবী ভুল। কারণ, বুখারী ও মুসলিমে আসমা, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা এবং মুসলিম, আহমাদ, হা-কিম, ইবনে হিব্বান, নাসায়ী প্রভৃতিতে বর্ণিত আটটি হাদীস প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামাযের পর খুতবা দিয়েছিলেন (নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে খুযাইমা বলেন, ইবনে মসউদের হাদীসে আছে, নাবী (সঃ) নামাযের আগেও খুতবা দিয়েছিলেন। অতএব সূর্যগ্রহণের-নামাযে ইমামের উচিত নামাযের আগে এবং নামাযের পরে খুতবা দেওয়া (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ এই নামাযে জুমআর মত দুই খুতবা হবে। ইমাম নবভীও তাই বলেন (রওয়াহ, ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী বলেন, মোট খুতবা ৮টি বরং ১০টি, এই হিসাবে সূর্যগ্রহণের খুতবাও আমাদের মতে আছে। নায্মে আছে যে,

এই নামাযের পর খুতবা সবারই মতে দিতে হবে। ফাতাওয়া কাযীখান ও খুলসাতেও এইরূপ ফতওয়া আছে (হাশীয়া ইবনে আবেদীন, ৮৭৪ ও ৮৮১ পৃষ্ঠা, যাহারাতু রিয়া-যিল আবরার, ২৬৫ পৃষ্ঠা)।

### চন্দ্র গ্রহণের নামাযও জামাআত কোরে পড়া সুন্নত

হানাফী ফকীহরা বলেন, সূর্যগ্রহণের নামায জামাআত সহকারে পড়া সবারই মতে সুন্নত। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের নামায জামাআত কোরে পড়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। হানাফী ফিক্‌হগ্ৰন্থ বাহরুর রায়েক ও মুজতবায় আছে, চন্দ্রগ্রহণের নামায জামাআত সহকারে জায়েয, কিন্তু সুন্নত নয়।

এর প্রতিবাদে আল্লামা আব্দুল জলীল সামরুদী (রহঃ) বলেন, বুখারী প্রভৃতি হাদীসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ দুটি নামাযই জামাআত কোরে পড়া সুন্নত বলে ঐমানিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী সীরাতে ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পঞ্চম (৫ম) হিজরী সনে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। তখন নাবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা জামাআত সহকারে নামায পড়েছিলেন। ইসলামী যুগে এটাই প্রথম গ্রহণ (যাহারাতু -রিয়া-যিল আবরা-য় ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম দারেমী প্রমুখ বলেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপারে জ্যোতিষীদের কোন কথার উপরে আমল করা যাবেনা (য়ওয়াতুত ত-লিবীন, ২য় খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা)।

আলবাহর গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, সূর্যোদয়ের পর যদি চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয় তাহলে গ্রহণের নামায পড়বে না। ইমাম নবভী বলেন, কোন সময় যদি ঈদ ও সূর্যগ্রহণ কিংবা জুমআ ও সূর্যগ্রহণ একই সময়ে পড়ে এবং ঈদ ও জুমআ ছেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তখন ঈদ ও জুমআ আগে পড়তে হবে। অন্যথায় অবস্থা বুঝে সূর্যগ্রহণের নামায আগে হবে। এইরূপ চন্দ্রগ্রহণ ও বিতর কিংবা তারাবীহ একই সময়ে হোয়ে পড়লে গ্রহণের নামায আগে হবে (ঐ, ৮৭ পৃষ্ঠা)।

### ইস্তিস্কা বা পানি চাওয়ার নামায

আরবী ইস্তিস্কা শব্দের অর্থ পানি চাওয়া। কোন সময় যদি কোন

এলাকায় বৃষ্টি না হয় তখন বৃষ্টি চাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটা করতে হয়। ঐ পানি চাওয়ার বিশেষ প্রার্থনার নাম ইস্তিস্কার নামায।

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি দিন নির্দিষ্ট কোরে সূর্যোদয়ের পরে মেস্হার সহকারে ঈদগাহে গেলেন এবং মেস্হারে বসলেন। তারপর তিনি তকবীর দিয়ে এবং আল্লাহর প্রশংসা কোরে বললেন, তোমরা তোমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করছো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাঁর কাছে দুআ করতে বলেছেন এবং তিনি তোমাদের দুআ কবুল করার ওয়াদাও করেছেন।

তারপর তিনি (সঃ) নিম্নে বর্ণিত দুআগুলো পড়ে দুই হাত এতটা তুললেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশটা দেখা যেতে লাগলো। তারপর তিনি লোকেদের দিকে পিঠ ফেরালেন এবং চাদরটা হেরফের করে নিলেন। তখনও তিনি দুই হাত উঠিয়ে ছিলেন। তারপর আবার তিনি লোকেদের দিকে মুখ করলেন এবং মেস্হার থেকে নামলেন ও দু রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মেঘ সৃষ্টি করলেন। যা গর্জন করলো, চমকালো এবং বর্ষালো। অতঃপর তিনি মসজিদে না আসতেই রাস্তাঘাট ভেসে উঠলো। ফলে লোকেদের ছুটোছুটি দেখে তিনি এতটা হেসে ফেললেন যে, তাঁর সামনের দাঁত বেরিয়ে পড়লো। এবার তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান এবং আমি আল্লাহর দাস ও প্ররিত দূত (আবু দাউদ, মিশকাত, ১৩২ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হাদীসে বর্ণিত দুআগুলোর শব্দ এইঃ-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُفْعَلُ مَا يُرِيدُ \* اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَعْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينِ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আ-লামীন০ আররহমা-

নির রহিম০ মা-লিকি ইয়াও মিন্দীন০ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ইয়াফআ'লু  
মা-যুরীদ০ আল্লা-হুমা আস্তালা-হ লা-ইলা-হা ইল্লা আস্তা০ আস্তাল  
গানিইয়ু অনাহনুল ফুকারা-য়ু০ আনযিল আ'লায়নাল গাইসা অজ্জআ'ল  
মা-আনযালতা লানা কুও'অতাও অবালা-গান ইলা হীন০

তরজামাঃ সবরকম প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্বজগতের প্রতিপালক।  
যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়াময়। যিনি প্রতিফল দিনের মালিক।  
আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা কোরে  
থাকেন। আল্লাহ গো ! তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর আর নেই কোন  
উপাস্য। তুমি পরমুখাপেক্ষিহীন এবং আমরা ফকীর-মিসকীন। তুমি আমাদের  
উপরে বৃষ্টি নামাও এবং যা নামাবে তাকে আমাদের জন্য এক যুগ পর্যন্ত  
শক্তির উৎস এবং উপকারী বানিয়ে দাও।

উক্ত হাদীস দ্বারা এই বিষয়গুলো প্রমানিত হয়ঃ (১) মিন্বারে বসে  
খুত্বা দেওয়া (২) দুই হাত তুলে দুআ পড়া (৩) কাঁধের চাদর হেরফের  
করা (৪) দু'রাকআত নামায পড়া প্রভৃতি। অন্যান্য হাদীসে উক্ত বিষয়গুলোর  
বিশদ বিবরণ আছে এবং কিছু আনুষঙ্গিক বিবরণ আছে। তা নিম্নে  
দেওয়া হল।

### ইস্তিসকা সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞাতব্য

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তিসকার জন্য  
পুরানো কাপড় পরে বিনয় সহকারে জড়সড় হয়ে কাঁদকাঁদভাবে মাঠের  
দিকে রওয়ানা হতেন (সুনানে আরবাআহ, মিশকাত, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

নাবী (সঃ) মসজিদে নববীতে ইস্তিসকার নামায না পড়ে ঐ মসজিদ  
থেকে আধ মাইল দূরবর্তী 'যাওরা' নামক বাজারের নিকটবর্তী 'আহজারে  
যায়ত' নামক ঈদগাহে পড়তেন এবং দুই হাত মুখ বরাবর তুলতেন, তা  
মাথা পর্যন্ত ওঠাতেন না (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত, ১৩১  
পৃষ্ঠা)।

হাতের (তালু উল্টে) পিঠটা আসমানের দিকে করতেন এবং ইস্তিসকা  
ছাড়া অন্য কোন সময়ে হাত দুটোকে সামনের দিকে অত বাড়াতেন না,  
যার ফলে তাঁর বগলের তলা দেখা যেত (মুসলিম, মিশকাত, ১৩১

পৃষ্ঠা)।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ বলেন, রসূলুল্লাহ(সঃ) ইস্তিকার সময় চাদর পাল্টান। অর্থাৎ চাদরের ডান দিকের কিনারা বাম কাঁধে রাখেন এবং বামদিকের কিনারা ডান কাঁধে রাখেন। তারপর দুআ করেন (আবু দাউদ, মিশকাত., ১৩১ পৃষ্ঠা)। চাদর পাল্টানোর কারণ হল যাতে দুর্ভিক্ষও পাল্টে যায় (দারাকুতনী পৃষ্ঠা ১৮৯, বুলুগুল মারাম, ৩৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, ইস্তিসকার নামায সন্নত নয় (হিদায়া ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)। একথার প্রতিবাদে আল্লামা যায়লায়ী হানাফী বলেন, ঐ দাবী ঠিক নয়। কারণ, নাবী (সঃ) ইস্তিসকার নামায পড়েছেন—একথার প্রমাণ সহীহ হাদীস আছে (নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)। তাই এই নামায পড়া অবশ্যই সন্নত।

তাই ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে ঐ নামায বিনা আযানে ও বিনা ইকামাতে জামাআত সহকারে পড়া এবং খুতবা দেওয়া সন্নত (শামী, ৭৯১ পৃষ্ঠা)। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তিসকার জন্য দু রাকআত নামায পড়েন। যাতে তিনি কিরাআত চেষ্টা করে পড়েন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

একটি যয়ীফ হাদীসে আছে যে, তিনি প্রথম রাকআতে সাত (৭) তকবীর দিয়ে সূরা ‘সাবিবহিস্মা রবিবকাল আ’লা’ পড়েন এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ (৫) তকবীর দিয়ে সূরা ‘হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ’ পড়েন (হাকিম, ১ম খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী, ১৮৯ পৃষ্ঠা, বায়হাকী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)।

মুসনাদে শাফিয়ীতে আছে, নাবী (সঃ) এবং আবু বাকর ও ওমর রযিয়াল্লা-হু আনহুমা ইস্তিসকার নামাযে সাত ও পাঁচ তকবীর দিতেন (আল্‌আসয়িলাহ অল্‌ আজ্জিবিবাতুল ফিক্‌হিয়াহ, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, দু রাকআত নামায এবং দুই খুতবা দ্বারা ইস্তিসকা করা উত্তম। দুই খুতবা নামাযের পরে হবে এবং কোন রং ঢং না করে, খুশবু না মেখে, পাকসাফ হয়ে মিসওয়াক কোরে, রোযা রেখে বুধবার দিন ইস্তিসকার জন্য বেরোতে হবে। আর বাচ্চা-বুড়ো এবং

জন্মদেরও সঙ্গে নিয়ে বের হওয়া উচিত (রওযাতুত তলবীন, ২য় খণ্ড, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা)।

## ইস্তিস্কার অন্যান্য দুআ

আমর ইবনে শুআইব বলেন, নাবী (সঃ) যখন ইস্তিসকা করতেন তখন বলতেন:-

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمَّتِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ  
بَلَدَكَ الْمَيِّتَ \*

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাসকি ইবা-দাকা ওয়া বাহীমাতাকা অনশুর  
রহমাতাকা ওয়া আহয়ি বালাদাকাল মাইয়িতা।

তরজামা: আল্লাহ গো! তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং জন্মদেরকে  
পানি পান করাও এবং তোমার রহমত ছুড়িয়ে দাও, আর তোমার মরা  
শহরকে জ্যাস্ত কোরে দাও (মুঅত্তা মালিক, আবু দাউদ, মিশকাত, ১৩২  
পৃষ্ঠা)।

জাবের (রযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দুই হাত তুলে এই  
দুআ করতে দেখেছি:-

اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْنًا مُغِيثًا مِرْيَا نَا فَاغَيْرِ مِرْيَا نَا فَاغَيْرِ عَيْنًا غَيْرَ أَجَلٍ \*

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাসকিনা গাইসাম মুগীসান মারীয়াম মুরীআ'ন না  
-ফিআ'ন গাইরা যা-ররিন আ' -জিলান গায়রা আ-জিলিন।

তরজামা: আয় আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান  
করাও যা ফরিয়াদ দূরকারী, পিপাসা নিবারণকারী, স্বাচ্ছন্দ্যদানকারী ও  
শস্য উৎপাদনকারী, উপকারী, নয় অপকারী, শীঘ্র আগমনকারী, নয়  
বিলম্বকারী। হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেন, এই দুআর পর আসমান মেঘে  
ভরে যায় (আবু দাউদ, মিশকাত, ১৩২ পৃষ্ঠা)।

সাআদ (রযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সঃ) এই দুআ পড়েন:-

اللَّهُمَّ جَلَّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا قَصِيفًا دَلُوقًا ضَحْرًا كَأَمْطَرْنَا مِنْهُ رُذَاذًا أَقْطَعُطًا  
سَجْلًا يَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা হুয়া জালিলনা সাহা-বান কাসীফান ক্বাসীফান দালুকান  
যাহুকান তুমতিরুনা মিনহু ক্বা-যান কিতকিতান সাজলান ইয়া-যাল  
জালা-লি অলইকরা-ম০।

তরজমাঃ আল্লাহ গো ! তুমি আমাদের উপর এমন মেঘ ছেয়ে দাও  
যা ঘন, গর্জনকারী, মুষণধারে বর্ষণকারী, বিদ্যুৎ-চমকিতকারী হয়। যা  
আমাদের উপরে ধীরে ধীরে, ছোট ছোট বিন্দুর আকারে গড়িয়ে পড়ে হে  
মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী (সহীহ আবু আওয়া-না, বুলুগুল মারাম,  
৩৭ পৃষ্ঠা)।

নোটঃ-পাকিস্তানের মওলানা সাদেক শিয়ালকোট সাহেব বুলুগুল মারামের  
বরাত দিয়ে উক্ত দু'আর 'দালুকান' শব্দের শেষ বর্ণটি কাফ (ك) লিখেছেন  
(সলাতুর রসুল, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)। এবং বীরভূমের আঞ্জুমানে ইসলামুল  
মুসলিমীন কর্তক প্রকাশিত নামায শিক্ষার ৮৬ পৃষ্ঠায় সুবলুস সালা-  
মের হাওয়ালা দিয়ে যুলুকান (ذُلُوكَان) লেখা আছে। কিন্তু আমি দিল্লী  
রশীদিয়াহ ছাপা বুলুগুল মারা-ম, বেরুত ছাপা হাশিয়াতুত দেহলাভী  
আলা-বুলুগিল মারাম, এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসানের ছাপা ফতহুল  
আল্লা-ম এবং দিল্লী ফারুকী ছাপা সুবলুস সালাম, ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠায়  
(ذُلُوكَان) পেয়েছি। অর্থাৎ ঐ শব্দের প্রথম বর্ণে দা-ল আছে, যা-ল নেই  
এবং শেষ বর্ণে ক্বা-ফ (ق) আছে কা-ফ (ك) নেই। উক্ত দুই গ্রন্থের  
বানান তফাতের মধ্যে কি রহস্য আছে বুঝতে পারলাম না।

ইমাম সাহেব মিস্বারে উঠে এই বইয়ের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত খুতবার  
শব্দগুলো মুক্তাদীদের দিকে মুখ কোরে পড়বেন। তারপর কিবলার দিকে  
মুখ কোরে ইমাম ও মুক্তাদী সবাই মিলে দুই হাত উল্টে কিবলার দিকে  
বাড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য দু'আগুলো পড়বেন। ঐ দু'আগুলো পড়ার মাঝে  
তারা চাদরটা উল্টে নেবেন। তারপর দু'আ শেষ কোরে ইমাম সাহেব হাত  
ওঠানো অবস্থায় মুক্তাদীদের দিকে মুখ কোরে মিস্বার থেকে নামবেন এবং  
বিনা আযান ও বিনা একামতে দুই রাকআত নামায পড়বেন।

কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, প্রথমে খুতবা না দিয়ে



ইস্তিসকার নামায দু রাকআত পড়ে, তারপরে খুতবা দেওয়া যেতে পারে (ইবনে মাজা, নাসায়ী, আহমাদ)। তেমনি বিনা মিম্বারে যমীনে দাঁড়িয়েও খুতবা দেওয়া যায় (বুখারী)।

এই নামায কয়েকদিন পড়া যেতে পারে। যতদিন পানি না হয় ততদিন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে তওবা, ইস্তিগফার এবং আল্লাহর যিক্র জারী রাখা উচিত। ওমর (রাযিঃ) কখনো ইস্তিসকার নামায না পড়ে কেবল ইস্তিগফার অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন (যা-দুল মাআ-দ ও নায়লুল আওতার প্রভৃতি)।

### ভূমিকম্পের নামায

সাহাবী শাহর ইবনে হাওশাব বলেন, নাবী (সঃ)-এর যুগে একবার মদীনাতে ভূমিকম্প হয়েছিল। তখন তিনি (সঃ) বলেন, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে শাসাচ্ছেন। অতএব তোমরা তাঁর শাসানি দূর করো। এই হাদীসটি যরীফ ও মুরসাল (তালখীসুল হাবীর, ১৪৮ পৃষ্ঠা, ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা)।

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, একদা বসরাতে হযরত আলীর খেলাফতী যুগে ইবনে আব্বাস গভর্ণর ছিলেন। তখন ওখানে ভূমিকম্প হলে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মসজিদে গেলেন এবং লোকেদের সঙ্গে নিয়ে ছয় (৬) রুকু ও চার (৪) সিজদা সহকারে দু (২) রাকআত নামায পড়লেন। তাতে মোট তকবীর ছিল ২৪ বার এবং প্রতি রাকআতে রুকু ছিল তিনটি (ইবনে জরীর, কানযুল ওমমাল, ৮ম খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)।

হযরত আলী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার জামাআত কোরে ভূমিকম্পের নামায পড়েন। যার প্রথম রাকআতে পাঁচ (৫) রুকু ও দুই সেজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে এক রুকু ও দুই সেজদা ছিল। (বায়হাকী, তালখীসুল হাবীর ১৪৮ পৃষ্ঠা, বুলুগুল মারাম ৩৬ পৃষ্ঠা)।

### ইস্তিখারার নামায

আরাবী ইস্তিখারা শব্দের অর্থ কোন বিষয়ের ভাল দিকটা খোঁজা। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন সফর করা, বিয়ে করা, ঘর বাঁধা প্রভৃতি কাজ

করবার আগে কেউ যদি তার ভাল দিকটা জানার চেষ্টা করে তাহলে তাকে ইস্তিখারার নামায পড়তে হবে। এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইস্তিখারা করে সে নিরাশ হয়না এবং যে (লোকেদের) পরামর্শ চায় সে লজ্জিত হয়না আর যে মিতব্যয়ী হয় সে কাঙাল হয়না (তাবারানী আওসাত)। অন্য হাদীসে আছে, আদম সন্তানের একটি সৌভাগ্য আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করা (তিরমিযী, হাকেম, কানযুল ওমমাল, ৭ম খণ্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)।

ইস্তিখারার নিয়ম সম্পর্কে সাহাবী জাবের বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ইস্তিখারা করার শিক্ষা ঐভাবে দিতেন যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শেখাতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে তখন সে যেন ফরয নামায ছাড়া দু রাকআত (নফল) নামায পড়ে, তারপর নিম্নের দুআটি পড়ে (বুখারী, মিশকাত, ১১৬ পৃষ্ঠা)।

### ইস্তিখারার দুআ

تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي  
فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي وَفِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَبَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي  
فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي وَفِي عَاجِلِ أَمْرِي  
وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইম্মী আত্তাখীরুকা বিই'লমিকা অআত্তাখদিরুকা  
বিকুদরাতিকা অআস্আলুকা মিনা ফাযলিকাল আ'যীমঃ ফইমকা তাকদিরু  
অলা আকদিরু অতা'লামু অলা-আ' লামু অ আত্তা আ'ল্লা-মুল গুম্ববঃ  
আল্লা-হুম্মা ইন কুত্তা তা' লামু আম্মা হা-যাল আমরা খাইরুন লী ফী দীনী  
অমাআ'-শী ওয়াআ'-ক্বাতি আমরী অফী আ'-জিলি আমরী অআ-  
-জিলিহী ফকদিরু লী ওয়াইয়াস্সিরু লী সুম্মা বা-রিক লী ফীহঃ অইন  
কুত্তা তা'লামু আম্মা হা-যাল আমরা শাররুন লী ফী দীনী অমাআ'-শী

ওয়া আ'- কিবাতের আমরী অফী আ'-জিলি আমরী ওয়া আ-জিলিহী ফাসরিফহু আমরী অসরিফনী আ'নহু অকদির লিয়াল খইরা হাইসু কা-না সুন্না আরযিনী বিহী০

তরজামাঃ- আয় আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে ভালটা জানতে চাচ্ছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি আর তোমার কাছে তোমারই মহাদান ভিক চাচ্ছি। কারণ, নিশ্চয়ই তুমি শক্তির অধিকারী, কিন্তু আমি মোটেই শক্তি রাখিনা আর তুমি সবই জানো, অথচ আমি কিছুই জানিনা। আর তুমি তো অদৃশ্যের জ্ঞানী। (তাই) আল্লাহ গো! তুমি যদি জানো যে, আমার এই কাজটা আমার জন্য ভাল হবে আমার ধীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ কোরে দাও। তারপর ওতে আমার জন্য বরকতও দাও।

আর যদি তুমি জানো যে, এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং শেষ পরিণামে কিংবা জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ওকে আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও ওথেকে দূরে রাখো। আর আমাকে ভালর শক্তি দাও, তা যেখানে আছে। তারপর ওদ্বারা আমাকে সন্তুষ্টও করাও।

নোটঃ এই দুআ পড়বার সময় 'হা-যাল আমরা' শব্দের জায়গায় ঐ কাজটার উচ্চারণ করতে হবে যার জন্য ইস্তিখারা করা হবে (বুখারী, মিশকাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

## ইস্তিখারা কয়দিন করতে হবে

বোম্বাইয়ের মওলানা মুখতার আহমাদ নদভী বলেন, ইস্তিখারা কেবল একবারই করা হয়। একটি জিনিষের ব্যাপারে একাধিক ইস্তিখারা প্রমানিত নেই (সলাতুল্লবী, ৯৬ পৃষ্ঠা)। এইরূপ মিসরের আল্লামা সাইয়েদ সাবেকও বলেন, একটি ব্যাপারে একাধিক ইস্তিখারার প্রমান নেই (ফিক্‌হুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু হাদীস দ্বারা একই বিষয়ে একাধিক ইস্তিখারা প্রমাণিত হয়।

যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা আনাসকে বলেন, যখন তুমি কোন কাজের সংকল্প করবে তখন ঐ ব্যাপারে তোমার প্রভুর নিকট সাতবার (৭) ইস্তিখারা করো। তারপর দেখ কোনদিকে তোমার মন ধাবিত হয়। কারণ, ওতেই কল্যান নিহিত আছে (ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অল্লাইলাহ, ১৬১পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী বলেন, এই হাদীসটির সূত্র দুর্বল। এটা যদি ঠিক হয় তাহলে হাদীসটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নবভী বলেন, ইস্তিখারার দু রাকআত নামাযে সূরা কাফেরন ও সূরা ইখলাস পড়া উচিত (শা-মী ১ম খণ্ড, ৬৪২ পৃষ্ঠা)। হাফেয ইরাকী তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, আমি এর দলীল পাইনি এটা মনে হয় ইমাম নবভীর ব্যক্তিগত মত (মিরআত, ২য় খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা)।

যে ব্যাপারে ইস্তিখারা করা হবে সে সম্পর্কে ইস্তিখারার আগে যেন দৃঢ় সংকল্প না করা হয়। কারণ, তাহলে ইস্তিখারা করার পরও তার ঐ দৃঢ় সংকল্পই তার মনে উদ্ভিত হবে। তাই কোন কাজ করার ব্যাপারে যখন কারো মনে আবছা ধারণা আসবে তখন সে ঐ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প না কোরে বরং সাদা মনে ইস্তিখারা কোরবে। অতঃপর ইস্তিখারা শেষ কোরে যদিকে তার মন টানবে সেই কাজই তাকে কোরতে হবে। তাহলে ইন-শা -আল্লাহ্ সে নিরাশ হবেনা। ইস্তিখারা করার পরে সে হয় স্বপ্ন দেখবে কিংবা ব্যাপারটি তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে—এমন কোন শর্ত নেই। বরং মনের আকর্ষণ যদিকে যাবে সেইভাবেই সে কাজ করবে (ঐ ২৪৯ পৃষ্ঠা)।

হানাফী ফকীহরা বলেন, দু রাকআত নফল নামায পড়ার পরে খুব মনোযোগ দিয়ে ইস্তিখারার দুআ পড়ে পাকসায় বিছানায় কিবলা মুখী হয়ে অযু অবস্থায় শুয়ে পড়তে হবে (তারপর শুয়ে উঠে) মনের টান যদিকে খুব বেশী যাবে সেই মোতাবেক কাজ করতে হবে (দুররে মুখতার, ১ম খণ্ড, ৭১৮ পৃষ্ঠা)।

ফরয হজেয যাবার জন্য ইস্তিখারা করা যে, হজেয যাব কি না? তা করা উচিত নয়। <http://www.fiqhbook.com/11894513> ইস্তিখারা করা উচিত

(ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)।

ইস্তিখারার নামায দিন ও রাতে যখন ইচ্ছা পড়া যায়। তবে এশা বাদ শোবার আগে পড়াটা উত্তম এবং তারপর কথা বলা উচিত নয়।

## সলা-তুত তাসবীহ

একদা নাবী (সঃ) তাঁর চাচা আব্বাস (রাযিঃ)-কে বললেন, হে আব্বাস! হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে খবর দেবো না? আমি কি আপনার সাথে দশটা অভ্যাসের ব্যবহার করবো না, যা আপনি করলে আল্লাহ তাআলা আপনার প্রথম ও শেষের এবং পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়ো, গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহ মার্ফ কোরে দেবেন? তাহলে আপনি চার রাকআত নামায পড়ুন, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও একটি সূরা পড়ুন। অতঃপর প্রথম রাকআতের কিরাআত পড়া যখন আপনি শেষ করবেন তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললেনঃ-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ  
সুবহা-নাল্লা-হ অল্হামদু লিল্লা-হ অলা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ অল্লা-হ আক্বার ১৫ বার।

তারপর রুকুতে যান এবং রুকু অবস্থায় ঐ তসবীহটি ১০বার পড়ুন। তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ তসবীহ ১০বার পড়ুন। তারপর সেজদায় পড়ে যান এবং সেজদা অবস্থায় ঐ শব্দগুলো ১০বার পড়ুন। তারপর দ্বিতীয় সেজদা করুন এবং সেজদার মধ্যে ১০বার ঐ তসবীহ পড়ুন। তারপর সেজদা থেকে মাথা তুলে বসে বসে আবার ১০বার ঐ তসবীহ পড়ুন। এই হল প্রত্যেক রাকআতে ৭৫বার তসবীহ।

এইরূপ আপনি চার রাকআতে করুন। যদি আপনি পারেন তাহলে প্রত্যেক দিনে এই নামায একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি জুমআয় একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি বৎসরে একবার পড়ুন। যদি তাও না পারেন তাহলে আপনার জীবনে একবার পড়ুন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বাইহাকীর দাঅতুল কাবীর, মিশকাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

একদা নাবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আমরিবনে আসকে বলেন, দিন

যখন চলে যায় তখন তুমি দাঁড়াও। অতঃপর চার রাকআত নামায পড় (আবু দাউদ)। এই হাদীসের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, সূর্য জ্বলার পর এবং যোহরের আগে সলা-তুত তসবীহ পড়া উত্তম (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)।

পাকিস্তানের মওলানা সাদেক শিয়ালকোট বিদ্যা বরাতে লিখছেন যে, সলাতুত তসবীহের চার রাকআতে ইবনে আব্বাস থেকে এই চারটি সূরা পড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়:

১) সূরা তাকা-সূর। ২) সূরা আসর। ৩) সূরা কাক্বরুন এবং ৪) সূরা ইখলাস-স (সলাতুর রসূল ৩৮৮ পৃষ্ঠা)।

কেউ বলেন, কখনো সূরা যালযালাহ ও আ-দিয়া-ত এবং ফাত্হ ও ইখলাস পড়তে হবে এবং কখনো পূর্বোক্ত চারটি সূরা পড়তে হবে। কারো মতে সূরা হাদীদ ও হাশর এবং সফফ ও তাগাবুন পড়া উত্তম। কিন্তু এই ১২টি সূরা পড়া সম্পর্কে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, রসূলুল্লাহর কোন হাদীস কিংবা সাহাবীদের কোন আসার থেকে ঐ সূরাগুলো পড়ার প্রমাণ আমি পাইনি (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, সলাতুত তসবীহের নামায কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যদিও একদল ফকীহ ঐ নামাযের উল্লেখ করেছেন। ঐ হাদীসকে মোহাক্কেক ও গবেষকগণ যয়ীফ, বরং জাল বলেছেন (বাবুল মানফাআহ, ৪৩ পৃষ্ঠা)। তাঁরা হলেন ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনে মারীন প্রমুখ।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, ইবনুল জাওযী এই হাদীসটিকে জাল বলেছেন এবং ইবনুল আরাবী, নবভী, ইবনে তাইমিয়াহ ও মিশযী এবং হাফেয আস্ কালানী একে যয়ীফ বলেছেন। কিন্তু আমার মতে হাদীসটি জাল তো নয়ই, যয়ীফও নয়, বরং হাসান। এর প্রমাণে তিনি ২১ জন আল্লামার মত পেশ করেছেন (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)।

ইমাম তিরমিযী কিতাবুল লুমআহ ফী রাগা-য়িব ইয়াওমিল জুমআহ গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতী আলকালিমুত তাইয়িব গ্রন্থে ইমাম আহমাদ থেকে তিন শো বার তসবীহ পড়ার পর সালাম ফেরার আগে একটি লম্বা দুআ বর্ণনা করেছেন (মিরআত, ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)।

## সলাতুত তাসবীহের জামাআত হবেনা

তাসবীহের এই নামায রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেরীনে ইযাম থেকে জামাআত সহকারে পড়ার কোন প্রমাণ নেই। না মসজিদে না ঘরে, না রমযানে, না অন্য মাসে। তাই এর জামাআত করা এবং জামাআতের ব্যবস্থা করা বিদআত থেকে খালি নয়। সেজন্য এই নামায জামাআত কোরে পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। যাতে এই কাজ বিদআতে পরিণত না হয়ে যায়।

### তওবার নামায

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কোন লোক যদি গোনাহ করে তারপর উঠে দাঁড়ায়, অতঃপর সে অযু কোরে নামায পড়ে, তারপর আল্লাহর কাছে মাফ চায় তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

সহীহ ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ও আবু দাউদে আছে যে, ঐ নামায দু রাকআত (মিরআত, ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)। ওতে সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পড়া উচিত (মিরআত, ২য় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

### অভাব মোচনের নামায

হোযায়ফা বলেন, নাবী (সঃ) যখন কোন সমস্যায় পড়তেন তখন নামায পড়তেন (আবু দাউদ, মিশকাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)। তাই তিনি (সঃ) বলেন, আল্লাহর কাছে কিংবা কোন আদম সন্তানের কাছে যে ব্যক্তির প্রয়োজন থাকে সে যেন অযু করে, ভাল কোরে অযু করে, তারপর সে দু রাকআত নামায পড়ে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নাবী (সঃ)-এর উপরে দরুদ পড়ে, তারপর এই দুআ পড়ে:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِوَالْحَمْدِ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ  
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ  
وَلَا هُمَا إِلَّا فَرَجَتُهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুল কারীম। সুবহা-নাল্লা-  
-হি রব্বিল আর'শিল আ'যীম। আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আ-  
লামীন। আসআলুকা মুজিবা-তি রহ'মাতিকা অআ'যা-যিমা  
মাগফিরাতিকা অল'গানীমাতা মিন কুল্লি বিররিন অস'সালা-মাতা মিন  
কুল্লি ইস্মিন। লা-তাদাঅ' লী যামবান ইল্লা-গাফারতাহু অলা হান্মান  
ইল্লা ফাররাজতাহু। অলা-হা-জাতান হিয়া লাকা রিয়ান ইল্লা-কাযাইতাহু  
ইয়া আর হামার র-হিমীন।

তরজামাঃ ধৈর্যশীল-উদার আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।  
আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই আল্লাহর যিনি মহা আরশের মালিক!  
আর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আমি  
তোমার কাছে তা চাচ্ছি, যা তোমার দয়াকে অপরিহার্য করে এবং তোমার  
ক্ষমাকে অবধারিত করে। আর আমি প্রত্যেক পূণ্য থেকে উপকার পাবার  
এবং প্রত্যেক পাপ থেকে নিরাপদে থাকার কামনা করছি। তাই তুমি  
আমার কোন অন্যায়কে ক্ষমা না কোরে ছেড়োনা এবং কোন দুশ্চিন্তাকে  
দূর না কোরে রেখে দিওনা। আর এমন কোন অভাব যা তোমারই  
পছন্দনীয় তাকে পূরণ না কোরে ছেড়ে না, হে দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ  
দয়াবান (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

ইবনে হাজার আঙ্কালানী (রহঃ) বলেন, শনিবার সকালে নিজ  
অভাব পূরণের নামায পড়া পছন্দনীয়। কারণ, একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ(সঃ)  
বলেন, যে ব্যক্তি শনিবার সকালে নিজ প্রয়োজনের খোঁজ করে এবং ঐ  
প্রয়োজন যদি হালাল হয় তাহলে তার তা পূরণের জামিন আমি হই  
(মিরকাত, ২য় খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা রহমানী বলেন, এই হাদীসের সব সনদগুলোই দুর্বল (মিরআত,  
২য় খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)। তথাপি হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী ও  
হাফেয মুনিযরী বলেন, এইরূপ হাদীসের উপরে আস্থা অভিজ্ঞতার  
ভিত্তিতে হয়। যেমন ইমাম হাকেম বলেন, আহমাদ ইবনে হারব বলেছেন  
যে, আমি এর পরীক্ষা করেছি এবং সঠিক ফল পেয়েছি। ইবরাহীম ইবনে  
আলী দাবেলী, ও আবু যাকারিয়া এবং ইমাম হাকেম প্রত্যেকই বলেন,



আমি এর পরীক্ষা করেছি এবং একে সঠিক পেয়েছি (ইত্তিখাবুত তারগীব অত্তারহীব, ২য় খণ্ড, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা)।

### শুকর ও কৃতজ্ঞতার সিজদা

সাহাবী আবু বাকরাহ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যখন কোন খুশীর ব্যাপার ঘটতো তখন তিনি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সেজদায় পড়ে যেতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)। যেমন একবার তিনি মক্কা থেকে মদীনা যাবার পথে আল্লাহর কাছে তিনটি দুআ করেন। তিনটি দুআই কবুল হোয়ে যায়। ফলে তিনি তিনবারই শুকরের সেজদা দেন (আহমাদ, মিশকাত, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

একদা নাবী (সঃ) হযরত আলীকে ইয়ামনে পাঠান। অতঃপর সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ কোরলে হযরত আলী পত্র দ্বারা তাঁকে জানান। ফলে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ নাবী (সঃ) তখনই সেজদায় পড়ে যান (বায়হাকী, বুলুগুল মারাম, ২৫ পৃষ্ঠা)।

খলীফা আবু বাকর যখন মুসাইলামাহ কায্যাবের হত্যা হবার সংবাদ পান তখন সেজদা দেন (সুনানে সায়ীদ ইবনে মনসুর)। হযরত আলী যখন সুদাইয়্যাহওলাকে নিহত খারেজীদের মধ্যে পান তখন তিনি সেজদা করেন (আহমাদ, যাদুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

যায়নাব (রযিঃ) যখন আল্লাহ কর্তৃক নাবী (সঃ) এর সাথে বিয়ের সুসংবাদ পান তখন সেজদায় পড়ে যান। ইমামাহ বিজয়ের সংবাদ পেয়ে ওমর (রযিঃ) সেজদা দেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)।

ইমাম শওকানী বলেন, সেজদায়ে শুকর সংক্রান্ত হাদীসগুলো দ্বারা একথা প্রমানিত হয় না যে, ঐ সেজদার জন্য অযু করতে হবে এবং কাপড় ও জায়গা পাক হতে হবে, আর সিজদা দেবার সময় তকবীরও দিতে হবে (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম শাফিযী ও ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে শুকরের সেজদা দেওয়া সুন্নত। আল্লামা সিন্ধী হানাফীও বলেন, উক্ত হাদীসগুলো প্রমান করে যে, সেজদায়ে শুকর সুন্নত। কিন্তু

ইমাম আবু হানীফার (কিরাসী) মতে তা সুনত নয় (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)। আহলে হাদীসদের মতে ঐ সেজদা সুনত।

### কুরআন তিলাঅতের সেজদা

আবু হুরাইরা (রযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) জুমআর দিন ফজর নামাযের ১ম রাকআতে সুরায়ে সেজদা এবং ২য় রাকআতে সুরা দাহর পড়তেন (বুখারী, মুসলিম)। ইবনে মাসউদের বর্ণনায় আছে, তিনি (সঃ) প্রত্যেক জুমআর দিনে ফজর নামাযে সুরা সেজদা পড়তে পড়তে সেজদার আয়াত এলে সেজদায় যেতেন এবং একটি সেজদা দিয়ে উঠে আবার কিরাআত পড়তেন। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, কুরআনে সেজদা কয়টা?

### তিলাঅতে কুরআনের সেজদা কয়টা?

সাহাবী আমর ইবনে আ-স বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআনে ১৫টি সেজদা পড়ান (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত, ৯৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমাদের মতে তিলাঅতে কোরআনের সেজদা (১৫) পনেরটা। আল্লামা তীবী বলেন, ইমাম শাফেয়ীর মত ও তাই, এবং ইমাম মালেক থেকেও একটি বর্ণনায় ১৫টা পাওয়া যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে তা ১৪টা (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)।

তিনি সুরা হজ্জের শেষ সেজদাটিকে গন্য করেন না। অথচ হাদীসে আছে যে, উক্বা ইবনে আ'মের বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল দুটি সেজদা দ্বারা সুরা হজ্জকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়নি কি? তিনি বললেন, হাঁ! এবং যে ব্যক্তি এই সেজদা দুটি দেয়না সে যেন ঐ আয়াত দুটি না পড়ে (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, ৯৩ পৃষ্ঠা)।

কারণ, সুরা হজ্জের শেষ আয়াতে শব্দ আছে অস্জুদু-অর্থাৎ তোমরা সিজদা করো। এই সিজদাটা না দিলে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করা হয় না কি? এই সিজদা অমান্যকারীকে আল্লাহ সূমতি দিন আ-মীন।

### এই সেজদার গুরুত্ব ও নিয়ম

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে এই সেজদা সুনত। কিন্তু হানাফী মতে অজেব (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)। আহলে হাদীসদের মতেও

সুন্নত। এই সেজদা একটি। এই সেজদা দেবার সময় হাত তুলতে হবে না, দাঁড়াতে হবে না, তাকীয়া পড়তে হবে না এবং সালামও ফিরতে হবে না (মিরআত, ২য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)। নামাযের জন্য যা যা শর্ত এই সেজদার জন্য হানাফী মতে তা তা শর্ত (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)।

কিন্তু ইমাম ইবনে হাযম বলেন, এই সেজদা সূর্যের উদয় ও অস্ত এবং মাথার উপরে থাকার সময়সহ সব সময়ই দেওয়া চলবে। কেবলা ও বিনা কেবলার দিকেও চলবে। অযু ও বিনা অযুতেও চলবে (আল মোহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)।

তিনি বলেন, ভয়ের ও বিতরের এক রাকআত নামাযকে এবং জানাযার নামাযকে যেমন নামায বলা হয়েছে তেমনিভাবে তেলাঅতে সেজদাকে নামায বলা হয়নি। তাই এর জন্য অযু ও কেবলা শর্ত নয় (ঐ, ১১১ পৃষ্ঠা)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বিনা অযুতে এই সেজদা দিতেন। ইবনে আব্বাসকে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তিনি সেজদার আয়াত পড়ে, কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ কোরে সেজদা দেন। জবাবে তিনি বলেন, তাতে কোন আপত্তি নেই (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২য় খণ্ড, ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম শওকানী বলেন, সেজদায়ে তিলাঅত সংক্রান্ত হাদীসগুলো দ্বারা একথা প্রমানিত হয়না যে, সেজদা দেনেওলাকে অযু ওলা হতে হবে। নাবী (সঃ) এর সঙ্গে যাঁরা তিলাঅতের সেজদা দিতেন তাঁদের কাউকে তিনি অযুর নির্দেশ দিয়েছেন এমন প্রমানও পাওয়া যায়না। আর তাঁর (সঃ) সঙ্গী সেজদা দানকারীগণ সবাইও যে অযু অবস্থায় ছিলেন এটাও বিবেকে আসেনা (নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)।

কোন ওস্তাদ ও ছাত্র যদি একটি সেজদার আয়াত বারংবার পড়ে তাহলে তারা কয়বার সেজদা দেবে-এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারো মতে প্রথম তিলাঅতের পর একটি সেজদা দেবে। তারপর আর দিতে হবে না। কারো মতে তাদেরকে সেজদা মোটেই দিতে হবে না (মিরকাত ২য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)।

অধিকাংশ আলেমের মতে সেজদার আয়াত পড়া কিংবা শোনার পর সেজদা দেওয়া উত্তম। যদি কেউ দেবী করে এবং ঐ জায়গা থেকে না ওঠে তাহলে দেবী করে দিলেও চলবে। কিন্তু যদি সে দেবী করে এবং ওখান থেকে উঠে চলে যায় তাহলে তাকে কাযা সেজদা দিতে হবেনা (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)।

১৫ টি সেজদা কোথায় কোথায় দিতে হবে তা কুরআন খুলে দেখে নিন। প্রত্যেক সেজদার আয়াতের পাশে কোরআনের টীকায় ‘সেজদা’ শব্দটি লেখা আছে।

### তিল্লাতে সেজদার খাস দুআ

আয়েশা (রযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে কোরআনের সেজদাসমূহে এই দুআ পড়তেন:-  
 سَجْدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ  
 تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

উচ্চারণ:- সাজাদা অজ্জিয়া লিল্লা-যী খলাকাহু অশ্বও'আরাহু অশাক্বা সামআ'হু অবাব্বারাহু বিহাওলিহী অক্বুও'অতিহী ফতাবারাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিকীন।

তরজমা:- আমার চেহারা তাঁর জন্য সেজদা করলো যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন আর তা ফেড়ে তিনি কান ও চোখ বানিয়েছেন নিজ শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা। অতএব বরকতময় আল্লাহ তিনি, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত, ৯৪ পৃষ্ঠা, বাইহাকী, হাকিম, নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)।

নোট:- ‘অশ্বও'আরাহু’ শব্দটি বাইহাকীতে এবং ‘ফতাবারাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিকীন’ শব্দটি মুস্তাদরকি হা-কিমে আছে। আর ইবনুস সাকানের বর্ণনায় দুআটি তিনবার পড়বার কথা আছে (নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)।

উক্ত দুআ ছাড়া আরো একটি দুআ সুনান গ্রন্থাবলীতে এবং তিনটি দুআ মোসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার ২য় খণ্ড, ২০ ও ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। বইয়ের কলেবর বাড়বে বলে ঐ দুআগুলো এখানে দিলাম না, কেবল

হাওয়ালা দিয়ে ক্ষান্ত হলাম।

কারো কারো মতে তিলাঅতে সেজদাতে উক্ত খাস দুআ না পড়ে নামাযের সেজদার দুআও পড়া যেতে পারে। তবে যারা রসূলুল্লাহর ভক্ত তাদের উচিত নাবীজীর ঐ খাস দুআ পড়া।

### কতিপয় বিদআতী নামায

সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও রাতে ইমাম গায্বালী এবং বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহমাতুল্লাহে আলায়হেমা) কতিপয় বিশেষ নামাযের কথা তাঁদের বইয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন, রবিবার দিনে ৪ রাকআত এবং রাতে ২০ রাকআত, সোমবার দিনে ২ অথবা ১২ রাকআত এবং রাতে ৪ রাকআত, মঙ্গলবার দিনে ১০ এবং রাতে ২ কিংবা ১২ রাকআত, বুধবার দিনে ১২ এবং রাতে ২ অথবা ১৬ রাকআত, বৃহস্পতিবার দিনে ২ এবং রাতেও ২ রাকআত, শুক্রবার দিনে ২ কিংবা ৪ অথবা ১২ রাকআত এবং রাতে ১২ কিংবা ১৩ রাকআত, শনিবার দিনে ৪ এবং রাতে ১২ রাকআত নামায (ইহইয়া-উ উলুমিদ্দীন, মওলানা ফযলুল করীমের বাংলা অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৪৫ থেকে ৩৪৮ পৃষ্ঠা এবং গুনিয়াতুত তলিবীন মওলানা মোঃ মেহরুল্লাহর বাংলা অনুবাদ ২য় খণ্ড, ৫৯ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠা)।

উক্ত দুই মনীষী বলেন, উপরোক্ত নামাযগুলো তাঁদের গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পড়লে বহু অকল্পনীয় নেকী পাওয়া যাবে। কিন্তু মজার কথা এই যে, ঐসব নামায এবং ওর সওয়াবের প্রমাণে তাঁরা একটিও সহীহ হাদীস পেশ করতে পারেনি। তাই আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) উক্ত দুই মনীষী বর্ণিত সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের বিশেষ নামায সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, ঐ সব হাদীসগুলোই জাল (আল্লাআ-লিল মসনুআহ, ২য় খণ্ড, ৪৮-৫২ পৃষ্ঠা)।

তাই হিজরী তের শতকের মোজাদ্দের ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, ঐ নামাযগুলো কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়না (বাযলুল মানফাআহ লিয়ীয়াহিল আরকা-নিল আরবাআহ, ৪২ পৃষ্ঠা)।

তিনি আরো বলেন ঐসব নামাযগুলো সুফী ও সাধকগণ সময়

কাটাবার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর তাঁরা ঐসবের জন্য এমন সব নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য তৈরী করেন যে, মুহাঙ্কিক ও গবেষক আলেমগন ও গুলোকে বিদআত বলতে যাধ্য হয়েছেন (ঐ ৪৪ পৃষ্ঠা)।

### রজবের বিদআতী নামায সলা-তুর রাগা-য়িব

ইমাম গাযযালী এবং বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমআর দিন মগরিব ও এশার মাঝখানে কেউ যদি ১২ রাকআত নামায (তাঁদের বইয়ে বর্ণিত বিশেষ ঢঙে) পড়ে তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা ও গাছের পাতা এবং বালুকারাশির মত অসংখ্য হয় (ইহুইয়াউ উলুমিদীন, বাংলা অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, গুনিয়াতুস্তা-লিবীন বাংলা অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠা)।

এই নামাযের নাম সলা-তুর রাগা-য়িব। এ সম্পর্কে হিজরীয় ১৩ শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) বলেন, এই নামায কোন সহীহ, কিংবা হাসান অথবা যরীফ হাদীস দ্বারাও প্রমানিত নেই। (বায়লুল মানফাতাহ, ৪৩ পৃষ্ঠা)। তাই মুহাঙ্কিকগণ এই নামাযকে বিদআত বলেছেন।

মুহাদ্দিস আবু শা-মাহ ‘আলবা-য়িস’ নামক গ্রন্থে বলেন, ইহুইয়াউল উলুমে এই নামাযের বর্ণনা থাকায় অনেকে ধোকায পড়েছেন। কিন্তু হাদীসের হাফেযগণ এই সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জাল বলে অভিহিত করেছেন। হাফেয আবুল খাত্তাব বলেন, সলাতুর রাগা-য়িবের হাদীসটি জাল করার অপবাদ আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্যামের উপর দেওয়া হয় (ইসলা-হুল মাসা-জিদ, উর্দু অনুবাদ, ১২৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ুতী বলেন, এই হাদীসটিও জাল হাদীস (আল্লাআ-লিল মসনুআহ, ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)। আল্লামা শামী হানাফী বলেন, এই নামাযটি বিদআত। মুনয়্যাতুল মুসল্লী হানাফী ফিক্হগ্রন্থের দুই ব্যাখ্যাকার বলেন, এ ব্যাপারে যা যা বর্ণিত হয়েছে সে সবই জাল হাদীস। (রদুল মুহতা-র ১ম খণ্ড, ৬৪২ পৃষ্ঠা)।

এই নামাযটি ৪৮০ হিজরীর পর আবিষ্কৃত হয়েছে (ঐ, ৬৬৪ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনে হাজার আঙ্কালানী ও হাফেয যাহাবী এবং আল্লামা ইরাকী ও ইবনুল জাওযী আর ইবনে তাইমিয়াহ ও ইমাম নবতী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী প্রমুখ আল্লামাগণ উক্ত হাদীসকে জাল বলেছেন। (আল্আমরু বিলইত্তিবা'- অননাহয়্যু আনিল ইবতিদা-অ' ১৬৭ পৃষ্ঠার ২নং টিকা, আসসুনান অলমুবতাদাআ-ত ১২৪ পৃষ্ঠা)।

### শবেবরাতের বিদআতী নামায হাযারী নামায

ইমাম গাযযালী ও বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, শাবানের ১৫ই রাতে যদি কেউ ১শো রাকআত নামাযে এক হাযার বার সূরা আহাদ পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ৭০ বার দৃষ্টিপাত কোরবেন এবং প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে তার ৭০টি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরবেন (ইহুইয়া উল উলুম ১ম খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা ও শুন্ইয়াতুত্ ত্ব-লিবীন ১ম খণ্ড, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) বলেন, এই নামাযেরও প্রমান হাদীস থেকে পাওয়া যায়না (বায়লুল মানফাআহ, ৪৩ পৃষ্ঠা)।

সিরিয়ার মোজাদ্দের আল্লামা মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী (রহঃ) বলেন, ১৫ই শাবানের রাতে ৪৪৮ হিজরীতে 'হাযারী নামাযের' বিদআত আবিষ্কৃত হয়েছিল। যাতে ১শো রাকআত নামাযে এক হাযার বার কুল হুঅল্লাহ আহাদ পড়া হয়। ইবনে অযযাহ বলেন, ইবনে আবী মুলাইকাহকে বলা হয় যে, যিয়াদ নুমাইরী বলতেন, শাবানের ১৫ই রাত লায়লাতুল কদরের মত। একথা শুনে ইবনে আবী মুলাইকাহ বলেন, আমার হাতে যদি লাঠি থাকতো এবং তাঁকে ঐকথা বলতে শুনতাম তাহলে তাঁকে পিটিতাম। যিয়াদ হল বক্তা। হাফেয আবুল খাস্তাব বলেন, কিছু অজ্ঞাত পরিচয় লোক শাবানের ১৫ই রাতের নামায সংক্রান্ত জাল হাদীস তৈরী কোরে লোকেদের উপর ১শো রাকআত নামাযের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। (ইসলাহুল মাসা-জিদ, উর্দু তর্জমা, ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)।

এই নামায সম্পর্কে আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) কতিপয় হাদীস বর্ণনা কোরে মন্তব্য করেছেন যে, সবকটা হাদীসই জাল (আল্লাআ-লি মফ্ফুআহ, ২য় খণ্ড, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা)।

কিছু সালাফ বা পূর্ববর্তী আলেম বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যেসব কাজ করেনি তাকে ভাল মনে কোরে তা করা ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি। ঐরূপ বাড়াবাড়ি আমলের জন্য আল্লাহ তাআলা কখনই কোন সওয়াব দেননা যা তাঁর রসূল করেনি কিংবা তিনি হুকুম দেননি। ঈমানের মিস্তি এবং এহসানের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের মাহাত্ম্য বাড়াবাড়ি না করার মধ্যে আছে (বায়লুল মানফাআহ, ৪৪ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুমুতী ১০ই মোহাররম আশুরার রাতে ৪ রাকআত এবং ঈদুল ফেতরের রাতে ১০ রাকআত ও দিনে ৪ রাকআত এবং হজ্জের দিনে যোহর ও আসরের মাঝে ৪ রাকআত ও দিনের যেকোন সময়ে ২ রাকআত এবং ঈদুল আযহার রাতে ২ রাকআত নামায পড়ার অকল্পনীয় ফযীলতপূর্ণ হাদীস পেশ কোরে প্রমানসহ মন্তব্য করেছেন যে, ঐসব হাদীসই জাল (আল্লাআ-লিল মশ্বনুআহ, ৫৪ এবং ৬০-৬৩ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা তাহের পটনী হানাফীও (রহঃ) উক্ত সমস্ত রিওয়াযাতগুলো বর্ণনা করার পর প্রমানসহ মন্তব্য করেছেন যে, ঐসব হাদীসই জাল (তায়কিরাতুল মউযুআ-ত, মিসরী ছাপা, ৪১ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠা)।

অতএব যেসব নামাযের প্রমান সহী হাদীসে পাওয়া যায়না ঐরূপ বিদআতী নামায পড়ে আমরাও যেন বিদআতী না হই। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন-আমিন!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম গায়যালী নিজেই স্বীকার করতেন যে, তিনি ভাল হাদীস জানতেন না (ইবনে তাইমিয়াহর শারহুল আকীদাতিল ইসফাহা-নিয়্যাহ, ১১২ পৃষ্ঠা)।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, ইমাম গায়যালী এলমে কালাম ও দর্শনের পাঁকে এভাবে পুঁতে যান যে, তিনি নিজেও তথেকে বের হতে পারেনি এবং অপরকেও তা থেকে বের করতে পারেননি (ইবনে তাইমিয়াহ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)।

উক্ত কারণে তাঁর রচিত ইহুইয়া-উল উলূম গ্রন্থে বহু জাল হাদীস স্থান পেয়েছে। যেগুলোকে হাফেয ইবনে হাজার আশ্কালালানীর ওস্তাদ হাফেয যয়নুদ্দীন ইরাকী 'ইহুইয়াউল উলূমের' তাখরীজ গ্রন্থে ধরিয়ে দিয়েছেন।



এইরূপ বড়পীর সাহেবের গুনিয়াতুত্তালিবীন গ্রন্থেও বেশ কিছু জাল হাদীস রয়েছে। যার প্রমান পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক ও দৈনন্দিন নামায এবং রজবের সলা-তুর রাগায়িব ও শবেবরতের একশো রাকআত নামায সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

আমার যেসব ভায়েরা উক্ত দুই পীরের ভক্ত আছেন তাঁরা তাঁদের পীরের বিরুদ্ধে জাল হাদীস বর্ণনার মন্তব্য দেখে ক্ষেপে না গিয়ে প্রকৃত বিষয় সন্ধান কোরে আসল ব্যাপারটা জানার চেষ্টা কোরলে তাঁরা ভ্রান্তিমুক্ত হবেন এবং আমিও কৃতার্থ হব। আল্লাহ আমাদেরকে কোন ব্যক্তির অন্ধ ভক্ত না কোরে হক বুঝবার তওফীক দিন-আমিন!

### পাঁচঅক্ত জামাআতের পর জামাআতী দুআ প্রসঙ্গে

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর তেইশ বছরের নাবী থাকার জীবনে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) নামায পড়েছেন (মিরকাত ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)। কিন্তু কোন 'ফরয নামাযের' পর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জামাআতী দুআ করেননি। তথাপি কিছু আলেম উক্ত জামাআতী দুআকে নাবীজীর সুন্নত মনে করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যেসব হাদীস দলীলস্বরূপ পেশ করেন তার পর্যালোচনা নিম্নে দেওয়া হল।

১) আনাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, দুআ ইবাদতের মগজ (তিরমিযী, মিশকাত ১৯৪ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটি দ্বারা বোঝা যায় না যে, ঐ দুআ একা একা হবে, না জামাআতীভাবে হবে? অছাড়াও এই হাদীসটি যরীফ। কারণ, এর সনদে আছেন ইবনে লাহিয়াহ নামে এক রাবী। যাঁর স্মরণশক্তিতে গোলমাল ছিল (আল্লামা আলবানীর তাহকীককৃত মিশকাত ২য় খণ্ড, ৬৯৩ পৃষ্ঠা, ২নং টিকা)। যরীফ হাদীস দলীলের যোগ্য নয়। অতএব এ দলীলটা অকেজো।

২) আবু উমা-মাহ বলেন, বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! কোন দুআ বেশি কবুল হয়? তিনি (সঃ) বললেন, শেষরাতের মাঝে এবং ফরয নামাযগুলোর পরে (তিরমিযী, মিশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসও প্রমান করে না যে, ফরয নামাযের পরে যে-দুআ বেশি কবুল হয় তা একা একা, না জামআআতী দুআ? সেইসাথে এই হাদীসটিও যরীফ। কারণ, এর একজন রাবী ইবনে জুরাইজ এই হাদীসটি ‘আন’ আন’ কোরে বর্ণনা করেছেন, যাকে হাদীসের নীতিশাস্ত্রের পরিভাষায় তাদলীস বলা হয়। মুহাদ্দিস দারাকুতনী বলেন, তাদলীসের ব্যাপারে ইবনে জুরাইজ অতি জঘন্য (তাহযীবুত তাহযীব ৩য় খণ্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটির এই সুত্র ছাড়া আরো পাঁচটি সুত্র আছে। কিন্তু এসব সুত্রের বর্ণিত হাদীসে এই হাদীসের শেষ টুকরা “দুবুরাস সলাতিল মাকতূবা-ত” অর্থাৎ ফরয নামাযগুলোর পর-শব্দগুলো নেই। (আল ফুতুহা-তুর রব্বা-নিয়াহ ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)।

৩) উমার (রযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন দুআতে দুই হাত ওঠাতেন তখন তিনি ঐ দুটোকে নামাতেন না যতক্ষণ ঐ দুই হাত তিনি নিজ চেহারাতে বুলাতেন (তিরমিযী, মিশকাত, ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা দুআর আদব-কায়দা প্রমানিত হয়। কিন্তু ঐ দুআ একা একা, না জামআআতী তা বোঝা যায়না। সেইসাথে এই হাদীসটিও যরীফ। কারণ, এর এক রাবী হাম্মাদ ইবনে ঈসা সম্পর্কে ইমাম হা-কিম ও নাক্বাশ বলেন যে, তিনি ইবনে জুরাইজ ও জাফর সাদিক থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন (তাহযীবুত তাহযীব ২য় খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)।

৪) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘তোমরা তোমাদের হাতের তালু পেটের দিকে কোরে আল্লাহর কাছে চাও। আর ওর পিঠের দিক কোরে চেয়োনা। অতঃপর যখন তোমরা চাওয়া শেষ করবে তখন ঐ দুটোকে চেহারাতে বুলাবে’ (আবু দাউদ, মিশকাত ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা দুআ করার চং প্রমানিত হয়। কিন্তু তা একা একা, না জামআআতী দুআ? তা প্রমানিত হয়না। সেই সাথে এই হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব থেকে কতিপয় সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবকটি সুত্রই অত্যন্ত যরীফ। আর ওর মধ্যে কেবল এই সুত্রটি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এটাও যরীফ (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, চেহারাতে দুটো হাত বুলানো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে একটি কিংবা দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা (যয়ীফ হবার কারণে) দলীল হিসেবে দাঁড়াতে পারেনা (মাজমুউ ফাতা-ওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২২ খণ্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা)।

৫) সালমানের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল উদার। তাঁর কোন দাস যখন নিজের হাত দুটো তাঁর দিকে তোলে তখন ঐ দুটোকে খালি ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন (তিরমিযী, আবুদাউদ, বাইহাকীর দা'ওয়াতে কাবীর, মিশকাত ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা দুআ করার মাহাত্ম্য প্রমানিত হয়। কিন্তু তা একা একা, না জামাআতী দুআ এবং তা কখন করা হবে, তা প্রমানিত হয়না। অতএব ফরয নামাযের পর সালাম ফেরা ইমাম ও মুক্তাদী মিলে জামাআতী দুআ করার দলীল হিসেবে এটা ধোপে ঢেকেনা।

৬) আনাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে বান্দাহ প্রত্যেক নামাযের পরে তার দুটো হাতের তালুকে পেতে দিয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার উপাস্য এবং ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের উপাস্য। আর জিবরীল, মীকায়েল ও ইসরাফীলের উপাস্য! আমি তোমার কাছে আমার দুআ কবুলের ভিক চাচ্ছি.....তখন আল্লাহর উপরে অবধারিত হোয়ে যায় তার হাত দুটোকে নিরাশ কোরে ফেরত না দেওয়া (ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অল্লাইলাহ)।

এই হাদীস দ্বারাও ফরয নামায বাদ জামাআতী দুআ প্রমানিত হয়না। তদুপরি এটা যয়ীফ হাদীস। কারণ, এর এক রাবী খাসীফ। যিনি আনাস থেকে না শুনেও হাদীস বর্ণনা করতেন (তাহযীবুত তাহযীব ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং এটাও দলীলের অযোগ্য।

৭) আসাদ আ-মিরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি যখন সালাম ফিরলেন, তখন তিনি তাঁর দুটো হাতকে তুললেন এবং দুআ করলেন-আলহাদীস (আবুবাকর ইবনে আবী

শায়বাহ, ফাতা-ওয়া নাযীরিয়াহ, ১ম খণ্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবী (সঃ) একবার ফজরের নামায বাজেই দু হাত তুলে দুআ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ, ফাতা-ওয়া নাযীরিয়ার উক্ত পৃষ্ঠায় দুটো ফাতওয়াতে ২টি হাদীসের একটির শেষে আছে—আলহাদীস এবং অন্যটির শেষে আছে আলখ— অর্থাৎ ইলা আ-খিরিহী। যার অর্থ ফাতা-ওয়া নাযীরিয়াহতে উক্ত হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মজার কথা এই যে, বর্তমানে বোম্বাইয়ের দা-রুস সালাফিয়াহ থেকে মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবার যে সংস্করণ ছাপা হয়েছে তার ১ম খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ঐ হাদীসটি ওর চেয়েও সংক্ষিপ্ত আছে। ওতে “অরাফাআ য়াদাইহি ওয়া দাআ” অর্থাৎ তিনি তাঁর হাত দুটি তুললেন এবং দুআ করলেন শব্দগুলিই নেই।

এই হাদীসটিই আবু দাউদ ও নাসায়ীতেও আছে এবং মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতেও বিশদভাবে আছে। কিন্তু তাতেও তিনি (সঃ) দুই হাত তুললেন এবং দুআ করলেন শব্দগুলি নেই। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ফাতা-ওয়া নাযীরিয়াহ-তে উদ্ধৃত হাদীসটি টুকতে ভুল হয়েছে। ফলে এই হাদীসটিও দলীলযোগ্য হচ্ছেনা। এই হাদীসে একথারও উল্লেখ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামও ঐ দুআতে শরীক হোয়ে আজকের যুগের কিছু লোকের মত আ-মীন, আ-মীন বলেছিলেন।

৮) সূরা নিসার ৫৫ নং আয়াতের অধীনে আবু হুরাইরার বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সালাম ফিরে হাত তুলে কিবলামুখী হোয়ে দুআ করেনঃ আয় আল্লাহ! তুমি অলীদ ইবনে অলীদ....প্রমুখদের মুক্তি দাও (তফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা, তফসীরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)।

হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন, এই হাদীসটির একজন রাবী আলী ইবনে যায়দ ইবনে জুদআন যযীফ (তাকরীবুত তাহাবীব ২৭১ পৃষ্ঠা)। ফলে এই হাদীসটিও দলীলযোগ্য নয়। তাছাড়াও এই হাদীস দ্বারা জামাআতী দুআও সাব্যস্ত হয়না।

৯) ফাযল ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নামায দুই

দুই রাকআত পড়। প্রত্যেক দু রাকআতে তাশাহুদে বসো (অর্থাৎ সালাম ফেরো) এবং বিনয়চিহ্ন ও জড়সড় হও। তারপর নিজের হাত দুটিকে তোমার প্রতিপালকের দিকে সোজা বাড়িয়ে দাও এবং বল হে প্রভু, হে প্রভু। যেব্যক্তি এরূপ করবেনা তার নামায অসম্পূর্ণ হবে (বাইহাকী ২য় খণ্ড, ৪৮৭-৪৮৮ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মুসনাদে ও কিতাবুয্ যুহুদে এবং মুসনাদে আহমাদের ১ম খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, আবু ইয়ালা, ইবনে খুযাইমাহ, তাবারানী প্রভৃতিতে লাইস ইবনে সা'দের সুত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং অন্য সুত্রে শু'বার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, এর একজন রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে না-ফি ইবনুল আময়্যা যয়ীফ (তাহযীবুত তাহযীব ৩য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা)।

তাছাড়াও এই হাদীসটির সম্পর্ক ফরয নামাযের সাথে নয়, বরং নফলের সাথে। কারণ, এতে দুই দুই রাকআত পড়ার কথা আছে। এর বিপরীত মগরেবের ফরয তিন রাকআত এবং যোহর, আসর ও এশা চার রাকআত ফরয। সুতরাং এ হাদীসটিও জামাআতী দুআর দলীল হচ্ছেনা।

১০) একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষে আছে:- যেব্যক্তি কোন কওমের ইমাম হয় তিনি যেন কেবল নিজের একার জন্য দুআ না করেন। যদি তিনি তা করেন তাহলে তিনি ঐ কওমের খিয়ানত (আত্মসাৎ) করবেন (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসের 'ইমাম' শব্দটা প্রমান করে যে, ঐ দুআ নামাযের মধ্যে হবে। যেমন রমাযানে বিত্‌র নামাযের মধ্যে দুআয়ে কুনুতে ইমাম দুআ পড়লে মুক্তাদীরা তার পেছনে আমীন আমীন বলেন। কিংবা ফরয নামাযের মধ্যে কুনুতে না-যিলাহ পড়লে তা হতে পারে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ তাই বলেন (যা-দুল মাআ-দ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা)।

কোন ব্যক্তি যখন তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নামায পড়ানো শুরু করেন তখন ঐ ব্যক্তি ইমাম হন এবং তাঁর পেছনে যারা নামায পড়েন তারা তাঁর মুক্তাদী হন। অতঃপর ইমাম যখন নামাযের শেষে সালাম ফিরে দেন তখন

তিনি আর ইমাম নন এবং তাঁর পেছনের নামাযীরা আর মুক্তাদী নন। সুতরাং সালাম ফেরার পর যখন ইমাম ইমামই থাকছেন না তখন নামাযের বাইরে ইমাম হিসেবে তাঁর কওমের জন্য দুআ না কোরে খিয়ানতের প্রশ্নই ওঠেনা। এই হাদীসটিকেও আল্লামা আলবানী যরীফ প্রমান করেছেন (যায়ীফুল জা-মি, হাদীস নং ৬৩৪৯, বেনারসের মুহাদ্দিস পত্রিকা, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ যুগ্ম সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠা)।

হানাফী আলেমদের মধ্যে আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী, আল্লামা আন'অর শাহ কাশ্মীরী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী ও মাওলানা যাকার আহমাদ উসমানী প্রমুখ আলেমগন উক্তরূপী জামাআতী দুআকে রদ করেছেন (মাওলানা ইমাদুদ্দীন হানাফী দেওবন্দী বেলুচিস্তানীর কিতাব আত্তাহকীকুল হাসান ফী নাফিয়িদ দুআ-য়িল ইজতিমা-য়ী বা'দাল ফারা-য়িযি অসসুনান ১৭-৪৭ পৃষ্ঠা ও উক্ত পত্রিকা-১০৫ পৃষ্ঠা)।

### ফরমায়েশী জামাআতী-দুআ বৈধ

যদি কখনো কোন ব্যক্তি নামাযের পর দুআর আবেদন করে তাহলে সমবেতভাবে ঐ দুআ করা বিদআত নয়। যেমন নামাযের শেষে কেউ হয়তো বললো, আমি রোগী কিংবা অমুক বিপদে ফেঁসে আছি। অথবা আমার অমুক অসুখ আছে, কিংবা আমার অমুক আত্মীয় বিপদে পড়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার জন্য আপনারা সবাই দুআ করুন। তাহলে ঐ ফরমায়েশের ভিত্তিতে সমবেত দুআ করা বৈধ হবে।

যেমন আনাস বলেন, একবার জুমআর দিনে এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টি না হবার কারণে) জীবজন্তু ধ্বংস হল। ছেলেপুলে মরে গেল এবং মানুষ মরে গেল। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন। (বুখারী ১৪০ পৃষ্ঠা, বাইহাকী ৩য় খণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)। এই হাদীস প্রমান করে যে, প্রয়োজনের সময়ে কিংবা কোন কারণের দরুনে জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করা বৈধ।

একদা উসমান রযিয়াল্লাহু আনহু মিস্বারের উপরে ছিলেন। এমতাবস্থায় সাহাবী আমর ইবনে আস তাঁকে বলেন, হে উসমান! আপনি এই

উম্মতের ব্যাপারটা ধ্বংসের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই আপনি তাওয়া করুন এবং লোকেরাও আপনার সাথে তাওয়া করুক। ফলে তিনি নিজের চেহারাটা কিবলার দিকে ফেরালেন। অতঃপর নিজের হাত দুটি তুলে বললেন, আল্লাহ গো! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তাওয়া করছি। এমতাবস্থায় অন্যান্য লোকেরাও তাঁদের হাত তুললেন (ইবনে সা'দের তাবাকাত-তে কুবরা, ৩য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)।

তৃতীয় খলীফা উসমান গণী (রযিঃ) এর এই কাজটাও প্রমাণ করে যে, ফরমায়েশী দুআ জামাআতবদ্ধভাবে করা যাবে।

### যয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য কিনা?

যয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য কিনা-এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের দুটি মত আছে। সিরিয়ার মুজাদ্দিদ আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম, ইয়াহুইয়া ইবনে মারীন ও ইবনুল আরাবী, ইবনে হায্ম ও ইবনে তাইমিয়াহ প্রমুখ মুহাক্কিক আলিমগণের মতে ফযীলত হোক কিংবা আমল, কোন ব্যাপারেই যয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য নয় (কাওয়া-য়িদুত তাহদীস, ৯৫ পৃষ্ঠা)। তাই এঁদের মতে ফরয নামাযের পর ইমাম এবং মোক্তাদী মিলে জামাআত সহকারে হাত তুলে দুআ করা বিদআত।

অন্যদল বলেন, ৪টি শর্তে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল, করা যেতে পারে। তা হল এইঃ- ১) ঐ বিষয়টির সম্পর্ক যেন আকীদা ও কোন হকুম সংক্রান্ত না হয়। ২) তা যেন কোন প্রচলিত আমলের বিরোধী না হয়। ৩) ঐ হাদীসটির সনদ যেন অত্যন্ত দুর্বল না হয়। ৪) আমলকারী ঐ হাদীসটিকে যেন সহী হাদীস মনে করে আমল না করে, বরং সতর্কতামূলক অবস্থা হিসেবে আমল করে (তাওজীহন নযর ও নবভী শারহে মুসলিম প্রভৃতি)।

এই ধারণা পোষণকারী আলেমদের মতে ফরয নামাযের পর কোন কোন অঙ্কে 'জামাআত' কোরে দুআ করা যেতে পারে। তবে ঐ দুআর সময় কোন মসবুক মুসল্লী যদি তার বাকী নামায পড়তে থাকে তাহলে ইমাম সাহেব দুআর শব্দগুলো চিলে চিলে না পড়ে মনে মনে পড়বেন এবং মুক্তাদীদের আমীনও মনে মনে হবে তা আওয়ায কোরে হবেনা।

কেউ যদি পাঁচঅঙ্ক ফরযের পর পাঁচঅঙ্কেই 'জামাআতী' দুআ অপরিহার্য মনে করে তাহলে এই দ্বিতীয় দলের মতেও তা বিদআত হবে। সুতরাং যারা জামাআতী দুআর পক্ষপাতী তারা উক্ত শর্তানুযায়ী কোন অঙ্কে দুআ কোরবেন এবং কোন অঙ্কে তা ছেড়ে দেবেন। পরিশেষে জামাআতী দুআ একেবারেই ছেড়ে দিন এবং নিজ নিজ প্রয়োজন মত একা একা যতক্ষণ পারেন দুআ করুন।

### কতিপয় বিশেষ দুআ

নিম্নের দুআগুলো তখনই ফায়দা দেবে যখন কোন মুসলিম নামায ও রোযার পাবন্দ হবেন এবং হারাম খাওয়া ও হারাম পরা আর মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবেন।

### জুরের দুআ

আ-য়িশা (রযিঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি রোগী হোত তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজ ডান হাত দিয়ে রোগীর দেহে বুলাতেন। তারপর এই দুআ পড়তেন।

أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي  
لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يَغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ:- আযহিবিল বাস রব্বান না-স অশ্ফি আন্তাশ শা-ফী লা-শিকা-আ ইল্লা শিকা-উকা শিকা-আন লায়ুগা-দিকু সাকামান।

তরজমা:- হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এর কষ্ট দূর করো এবং একে আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্যদান ছাড়া আর কোন আরোগ্যই নেই। তা এমনই আরোগ্য, যা কোনরকম রোগকেই ছাড়েনা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৩৪ পৃষ্ঠা)।

### ফোড়া-ফুস্কুড়ী ও ঘা-এর দুআ

আ-য়িশা (রযিঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি রোগে পড়তো কিংবা তার ফোঁড়া ফুস্কুড়ী হোত অথবা চোট লাগতো তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর আঙুলে থত লাগিয়ে তা মাটিতে ঠেকিয়ে ঐ আঙুলটি



রোগীর চোটে রেখে এই দুআ পড়তেন:-

بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا\*

উচ্চারণ:-বিসমিল্লা-হি তুরবাতু আরযিনা বিরীকাতি বা'যিনা লিয়্যুশ্ফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা

তরজমা:- আল্লাহর নামের বরকতে আমাদের মাটি আমাদের কারো খুতুর সাথে মেশানোর ফলে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করুক আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশে (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ১৩৪ পৃষ্ঠা)।

### দাঁত ও কান ব্যথার দুআ

আলী (রযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হাঁচি শোনার সময় বলবে

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ\*

উচ্চারণ আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আ-লামীন আ'লা- কুল্লি হা-লিন মা-কা-না।

তরজমা:- সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগত প্রভুর জন্য যেকোন অবস্থায়ই হোক। সে দাঁতের ও কানের ব্যথা কখনই পাবেনা (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১০ম খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)।

### চোখের রোগ দূর করার দুআ

আনাস ইবনে মা-লিক বলেন, নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর কোন সাহাবী যখন চোখের রোগে ভুগতেন তখন নাবী (সঃ) এই দুআ পড়তেন।

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بَصَرِي\* وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي وَارِنِي فِي الْعِلْوِ لَرَأْي\*  
وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي\*

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বি-বাস্বারী০ অজ্'আ'লহল ওয়া-রিসা মিল্লী ওয়া আরিনী ফিল আদুওয়ি সা-রী০ অন্বুরনী আ'লা-মান যালামানী০

তরজমাঃ হে আল্লাহ! আমার চোখ দ্বারা আমাকে উপকৃত করাও এবং ওকে আমার উত্তরাধিকারী বানাও। আর শত্রুর মধ্যে আমার

প্রতিশোধ দেখাও এবং আমার উপরে যে অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে তুমি সাহায্য করো (ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অল-লাইলাহ ১৫৩ পৃষ্ঠা, হা-কিম ৪র্থ খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হিসনে হাসান ৩৭৭ পৃষ্ঠা)।

### আগুন নেভাবার দুআ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা আগুন লাগতে দেখবে তখন তাকবীর দাও (আল্লা-হু আকবার ধ্বনি দাও)। তাকবীর আগুনকে নিভিয়ে দেয় (ইবনে সুন্নী, ৮০ পৃষ্ঠা, আবু ইয়াল্লা, হিসনে হাসান ৩৭৪ পৃষ্ঠা)।

### রাগ দূর করা ও গাধার ডাক শোনার পর দুআ

সুলাইমান ইবনে সুরাদ বলেন, একবার নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকটে দুজন লোক গালিগালাজ করে। তখন আমরা তাঁর (সঃ) কাছে বসেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন রেগে মুখ লাল কোরে অন্যজনকে গাল দিচ্ছিল। তখন নাবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমি এমন একটি বাক্য অবশ্যই জানি যা ঐ ব্যক্তি যদি বলে তাহলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে। তা হল। **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**।

উচ্চারণ: আউ'যু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ট্‌আ-নির রজীম

তরজমা: বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ২১২ পৃষ্ঠা)।

আবু হুরাইরার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন তোমরা গাধার ডাক শুনে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ, সে শয়তানকে দেখা পায়। (ঐ-ঐ, ২১৩ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ তোমরা আউ'যু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ট্‌আ-নির রজীম বলো।

### হারানো মাল পাওয়ার উপায়

ইবনে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা রা কাছে এক ব্যক্তি হারানো জিনিষ পাবার উপায় জানতে চান। তিনি বলেন, অযু কোরে দু রাকআত নামায

পড় এবং নামাযের শেষে এই দুআ পড়:-

اللَّهُمَّ رَاذِ السَّالَةِ هَادِي السَّالَةِ رُذِّ عَلَى صَائِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ  
فَأَنْهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ\*

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা র-দ্দায্ য-ল্লাতি হা-দিয়ায্ যলা-লাতি তাহ্দী মিনায্  
যালা-লি রুদ্দা আলইয়্যা য-ল্লাতী বিই-য্যাতিকা অসুলতা-নিকা ফাইল্লাহা  
মিন ফায়লিকা ওয়া আ'ত্বা-য়িকা।

তরজমা: হে আল্লাহ! হারানো জিনিষের ফেরত-দানকারী! পথভ্রষ্টকে  
সুপথে পরিচালনাকারী! তুমিই ভ্রান্ত পথ থেকে সুপথে চালিয়ে থাক। তুমি  
তোমারই সম্মান ও বাদশাহীর বদৌলতে আমার হারানো জিনিষটা ফেরত  
দাও। কারণ, এটা তো তোমারই অনুগ্রহ ও অনুদানের মধ্যে একটা বস্তু  
(বাইহাকী, আযকারে মাসনুনাহ ২২১-পৃষ্ঠা)।

### প্রমাণপঞ্জী

১) আলকুরআন ২) তাফসীর ইবনে কাসীর, দারুল ফিকর, কাতার  
১৯৮০ ইং সংস্করণ। ৩) সহীহ বুখারী, দিল্লী ৪) সহীহ মুসলিম, রশীদিয়াহ  
দিল্লী। ৫) নাসারী, রহীমিয়াহ দিল্লী ৬) আবু দাউদ, কানপুর। ৭)  
তিরমিযী, রশীদিয়াহ দিল্লী। ৮) ইবনে মাজাহ, বাশীর হাসান, কলিকাতা।  
৯) মুত্তা মা-লিক, মুজতবায়ী দিল্লী। ১০) তাহাভী শরীফ, রহীমিয়াহ  
দেওবন্দ। ১১) সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, বেরুত। ১২) মুসান্নাফ ইবনে  
আবী শাইবাহ, বোম্বাই। ১৩) মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, বেরুত। ১৪)  
দারাকুত্নী, ফারুকী দিল্লী। ১৫) সুনানে দা-রিমী, মদীনা, ১৯৬৬ সংস্করণ।  
১৬) আলমুস্তাদরক লিল হা-কিম, হায়দরাবাদ। ১৭) সুনানে কুবরা লিল  
বাইহাকী, হায়দরাবাদ। ১৮) মিশকাত, কানপুর ও দিল্লী। ১৯) বুলুগুল  
মারাম, রশীদিয়াহ দিল্লী। ২০) কানযুল উম্মা-ল, হায়দরাবাদ। ২১)  
তরজুমা-নুল কুরআন ২২) তালখীসুল হাবীর, আনসারী, দিল্লী। ২৩)  
ইত্তিখা-বুত তারগীব অন্তারহীব, নদওয়াতুল মুস্বান্নিফীন, দিল্লী। ২৪)  
নাসবুর রা-য়াহ, সুরাট।

## হাদীসের ব্যাখ্যা ও ফাতা-ওয়া গ্রন্থসমূহ

২৫) ফাতহুল বারী, রিয়ায। ২৬) উমদা-তুল কা-রী ওরফে আইনী, দারুল ফিকর। ২৭) আওনুল বারী, বুলাক মিসরী। ২৮) ফাইযুল বারী, সুরাট। ২৯) নবভী শারহে মুসলিম, রশীদিয়াহ দিল্লী। ৩০) তুহফাতুল আহুদী, হামীদিয়াহ দিল্লী। ৩১) আলআরফুশ শাযী, রহীমিয়াহ দেওবন্দ। ৩২) আওনুল মা'বুদ, দিল্লী। ৩৩) আওজাযুল মাসা-লিক, সাহারানপুর। ৩৪) মিরকাত, বোম্বাই। ৩৫) মিরআ-ত লখনৌ। ৩৬) সুবুলুস সালা-ম, ফারুকী দিল্লী। ৩৭) ফাতহুল আল্লাম, বুলাক মিসরী। ৩৮) মাওলানা আহমাদ হুসাইন দেহলাভীর হা-শিয়াতুদ দেহলাভী আলা বুলুগিল মারা-ম, মাকতবা ইসলামী দামিশক। ৩৯) মুশ্বফফা শারহে ফারসী মুত্তা, রহীমিয়াহ দিল্লী। ৪০) আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুত্তা মুহাম্মাদ। ১) ইবনে হায্মের আলমুহাল্লা, মুনীরিয়াহ মিসরী। ২) ইবনে কুদা-মার আলমুগনী, রিয়ায। ৪৩) ইমাম নবভীর রওয়াতুত ত-লিবীন, আলমাকতবুল ইসলামী, দামিশক। ৪৪) ইমাম শা-ফিয়ীর কিতা-বুল উম্ম, বোম্বাই। ৪৫) ইমাম মা-লিকের আলমুদাও'নাতুল কুবরা, মিসরী। ৪৬) ইমাম শাওকানীর নাইলুল আওতা-র, বুলাক মিসরী। ৪৭) ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মাজমুউ ফাতা-ওয়া শাইখুল ইসলাম, রিয়ায। ৪৮) ইবনুল কাইয়িমের যা-দুল মাআ-দ, মিসরী। ৪৯) ইবনে রুশ্দের বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহা-য়াতুল মুকত্তসিদ, কাব্বায়ে। ৫০) সাইয়িদ সা-বিক মিসরীর ফিক্হুস সুন্নাহ, বেরুত। ৫১) শাহ আলিউল্লাহর হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ, রশীদিয়াহ দিল্লী। ৫২) আল্লামা সুয়ূতীর আলহা-ভী লিলফাতা-ভি, মিসরী। ৫৩) রিয়াযের অধ্যাপক আল্লামা আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ সালমানের আল আস্সিলাহ অল আজতিবাতুল ফিক্হিয়াহ, রিয়ায। ৫৪) ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অললাইলাহ, হায়দারাবাদ। ৫) ইমাম গাযালীর ইহুইয়া-উ উলুমিদীনের বাংলা অনুবাদ, ঢাকা। ৫৬) আব্দুল কা-দীর জীলা-নীর গুন্যাতুত ত-লিবীনের বাংলা অনুবাদ, ঢাকা। ৫৭) আল্লামা সুয়ূতীর আল লাআ-লিল মাসনুআহ ফিল আহা-দীসিল মাউযুআহ, হুসাইনিয়াহ মিসরী। ৫৮) ফাতা-ওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লী। ৫৯) ইমাম

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের বায়লুল মানফাআহ, আগ্রা। ৬০) আল্লামা আব্দুল জালীল সামরুদীর যাহরাতু রিয়া-যিল আব্রার, বোম্বাই। ৬১) ওঁরই ই'যা-ছল হাকিস সরীহ ফী মাসআলাতিত্ তরাবীহ, দিল্লী। ৬২) মাওলানা ইউনুস দেহলভীর দসতুরুল মুস্তাকী, কলিকাতা। ৬৩) মাওলানা আব্দুস সালাম বাস্তভীর কিতা-বুল জুমআহ। ৬৪) ফাতা-ওয়া উলামা-য়ে হাদীস, দিল্লী।

### হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থাবলী

৬৫) ইমাম সারাখসীর আলমাবসূত, মিসরী। ৬৬) হিদায়াহ্, দিল্লী। ৬৭) ফাতহুল কাদীর, নওলকিশোর লাখনাউ। ৬৮) দুররে মুখতার, দিল্লী। ৬৯) রদুল মুহতার ওরফে শা-মী, দুর্রে সাআ-দাত মিসরী। ৭০) আলজাওহরাতুন নাইয়িরাহ, দেওবন্দ। ৭১) শারহুল অকা-য়াহ, মজীদী কানপুর। ৭২) শারহুন নিকা-য়্যাহ, ই'যা-যিয়্যাহ দেওবন্দ। ৭৩) বাদা-য়ে সানা-য়ে, মিসরী। ৭৪) আলবাহরুর রা-য়িক, দা-রুল কুতুবিল আরবিয়্যাহ, মিসরী। ৭৫) হা-শিয়াতুত্ তাহত-ভী আ'লা-মারা-কিল ফালা-হ্, দামিশ্ক ১৩৮৯ হিঃ। ৭৬) গুনয়্যাতুল মুস্তামলী ওরফে কাবীরী, কাইয়ুমী কানপুর। ৭৭) শারহ ফিক্‌হি আকবার, আশরাফী দেওবন্দ, ১৯৮৬ সংস্করণ।

### জীবনী ও বিবিধ

৭৮) ইবনুল জাওযীর সিফাতুস্ সফ'অহ, হায়দরাবাদ। ৭৯) ইবনে সা'দের আত্তাবাকা-তুল কুবরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ সংস্করণ। ৮০) ইবনুল কাইয়িমের কিতা-বুর রুহ, মিসরী। ৮১) ইবনে হাজার আস্কালানীর তাহযীবুত তাহযীব, বেরুত, ১৯৯১ ইং সংস্করণ। ৮২) ওঁরই তাকরীবুত তাহযীব, নওলকিশোর লাখনাউ। ৮৩) ওঁরই আদ দুরারুল কা-মিনাহ, হায়দরাবাদ ছাপা। ৮৪) তারীখে ইবনে খালদুন। ৮৫) আল্লামা আব্দুল হাইয়ের নুযহাতুল খাওরা-তির, হায়দরাবাদ ছাপা। ৮৬) আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমীর ইসলা-ছল মাসা-জিদ মিনাল বিদায়ে অল আওয়া-য়িদ এর উর্দু তরজমা, বোম্বাই। ৮৭) মাওঃ মুহাম্মাদ সারফারায় খান সাফদারের রা-হে সুন্নত, মাকতাবা দা-নেশ, দেওবন্দ ছাপা। ৮৮) মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল গুজরানওয়ালার রসূলে আকরম কী নামায, দিল্লী।

৮৯) মাওলানা আব্দুর রউফ রহমানীর নামায কে আহকা-ম ওয়া মাসা-  
 যিল, লাখনাউ। ৯০) মাওলানা সা-দিক শিয়ালকোটের সলা-তুর রসূল,  
 বোম্বাই। ৯১) মাওলানা ই'সমাতুল্লাহ রহমানীর সলাতুল মুস্তফা, এলাহাবাদ  
 ছাপা। ৯২) ইমাম মারঅযীর কিয়ামুল লাইল, মুলতান। ৯৩) আল্লামা  
 আব্দুল অহহাব মুলতানী সাদরীর হিদায়াতুন নাবী। ৯৪) কানুনে শারীআ'ত,  
 করীমী, এলাহাবাদ। ৯৫) বেহেশতী যেওর, আশরাফী আকসী। ৯৬)  
 শাহ অলিউল্লাহর আলবালাগুল মুবীন, উর্দু তরজমা, দেওবন্দ ১৯৮৩ ইং  
 সংস্করণ। ৯৭) ইমাম য়া-গিব ইস্পাহানীর মুফরাদা-তু গারীবিল কুরআন।  
 ৯৮) আল মুনজিদ। ৯৯) মাজমাউ বিহা-রিল আনওয়ার। ১০০)  
 তাওজীহুন নাযার। ১০১) ইরওয়া-উল গালীল লিল আলবানী। ১০২)  
 তাফসীরে তাবারী। ১০৩) আলফুতুহা-তুর রব্বা-নিয়াহ। ১০৪) নওয়ায  
 সিদ্দীক হাসান খানের আলমাক্বা-লাতুল ফাসীহাহ ফিল অসিয়াহ  
 অননাসীহাহ ১০৫) শারহে যুরকানী। ১০৬) আইনুল হিদা-য়াহ, লাহোর।  
 ১০৭) ফাতা-ওয়া রশীদিয়াহ। ১০৮) ফাতাওয়া মাহমুদিয়াহ। ১০৯)  
 ফাতাওয়া দা-রুল উলুম। ১১০) ফুযূযে কা-সিমিয়াহ। ১১১) আলকাসিম  
 পত্রিকা, মুহাররম সফর, ১৩৭৭ হিজরী সংখ্যা। ১১২) বেনারসের মুহাদ্দিস  
 পত্রিকা, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী যুগ্ম সংখ্যা ১৯৯৩। ১১৩) আল্লামা সুযুতীর  
 আল আমরু বিলইত্তিবা-অ অন্নাহ্য আনিল ইবাতিদা-অ, দাম্মাম ছাপা,  
 ১৯৯০ সংস্করণ। ১১৪) মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ হাওয়া-মিদীর আসসুনান  
 অব মুবতদাআ-ত, আসসুনাতুল মুহাম্মাদিয়াহ ছাপা, ১৯৪৮ ইং সংস্করণ।  
 ১১৫) আল্লামা জাযারীর হিসনে-হাসীন, দেওবন্দ ১৯৯৬ ইং সংস্করণ।  
 ১১৬) মাওলানা মুখতার আহমাদ নদভীর সলাতুল্লাবী, বোম্বাই। ১১৭)  
 ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমি অল্লাইলাহ, হায়দারাবাদ। ১১৮) মাওলানা  
 দাউদ রা-যের মুকাদ্দাস মাজমুআহ, দিল্লী।

## এক নয়রে লেখক

কলিকাতা মেটিয়ার্জের বাশিন্দা মেটিয়ার্জের অন্তরগত খোবাপাড়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রাইমারী পাশ করেন। তারপর মাত্র ১ বছরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার আকড়া মাদ্রাসা থেকে কুরআন হিফয কোরে ১৯৯৫ সালে এক চমক সৃষ্টি করেন। ১৯৬৩, ১৯৬৫, ও ১৯৬৭ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে আলিম, ফাযিল, মুমতায়ুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষাসমূহে ১৭টি লেটার মার্ক পেয়ে যার মধ্যে ৩টি পেপারে শতকরা ৯৫ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার কোরে পঃ বঃ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও কলিকাতা মাদ্রাসার ইতিহাস অনন্য নজীর সৃষ্টি করেন। ১৯৬৯-৭০ সালে আদীবে উর্দু ও আদীবে কামেল পরীক্ষায় লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে প্রথম হোয়ে রেকর্ড করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৫ মার্চ পর্যন্ত পঃ বঃ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী ছিলেন। তারপর থেকে তিনি ওর সভাপতির পদ অলংকৃত করছেন।

১৯৭৫ ৭ই নভেম্বর থেকে কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ায় অধ্যাপনা করছেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় জমঈয়তের আহলে হাদীস হিন্দের পূর্বাঞ্চলের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ঐ জমঈয়তের সহসভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তারপরে তিনি ২০০৫ পর্যন্ত ওর সদস্য ছিলেন। অতঃপর ২০০৬-২০১১ আবার সহসভাপতি আছেন। ১৯৮০ থেকে বেনারসের জামেআ সালাফিয়াহ এবং ১৯৮২ থেকে মহারাস্ট্রের জামেআ মোহাম্মাদিয়াহ ও বোম্বাইয়ের ইদারা ইসলামুল মাসাজিদ ও ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য, সেক্রেটারী ও সহ সভাপতি পদের শোভাবর্ধন করছেন।

১৯৯৫ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মৌখিক পেপারে শতকরা ৮৬ মার্কসহ আরাবী সাহিত্যে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৯১ সালে তিনি মক্কার বিশ্ব মুসলিম সংস্থার দাতা হজ্জ এবং ১৯৯২,

১৯৯৩, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ এবং ২০০৪ ও ২০০৫ সাল পর্যন্ত  
বারবার উমরা কোরে এবং ২০০৬ সালে আবার হজ্জ করে আল্লাহর  
কৃপায় ধন্য হন।

১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি সৌদী আরবের আই-ডি-বি জেদদার  
সাহায্য গ্রহনকারী ভারতের পূর্বাঞ্চল কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭  
সালে তিনি ঐ কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্যপদে উন্নীত হন। তারপর ২০০১  
সাল থেকে তিনি ঐ কমিটির কনভেনার আছেন। ২০০০ সালের আগস্টে  
তিনি ইংল্যান্ডের লণ্ডন ও বার্মিংহাম শহরে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে  
যোগদান করেন এবং ম্যাঞ্চেস্টার, অক্সফোর্ড, স্টাটফোর্ড ও লেকডিষ্ট্রি  
প্রভৃতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক এলাকা পরিদর্শন করেন।

তারপর ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি ৫০ এর বেশী গবেষণামূলক বই  
লিখে ভারত ও বহির্ভারতে যশস্বী হয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত সূরা  
ফা-তিহা ও ইয়াসীন, সূরা রহমান ও ক-ফ এবং সূরা ওয়া-ক্বিআ'হর  
তফসীর ও আমপারার তফসীর এবং নামায ও রোযা, হজ্জ ও কুরবানী,  
কুরআন ও হাদীসের ইতিহাস এবং জীবনী ও বিবিধ মসলা সংক্রান্ত ৫০  
খানা বই প্রকাশিত হয়েছে। সূর্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলা কথ্যভাষায়  
তাঁর অনূদিত গোটা কুরআনের অনুবাদ এর ২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

## এই লেখকের ইসলামী গ্রন্থাবলী

- ১) আল কুরআনুল হাকীম (বাংলা ও আরবী উচ্চারণসহ যাংলা অনুবাদ
- ২) তফসীরে আইনী, আমপারা প্রথমার্ধ ৩) ঐ শেষার্ধ। ৪) সূরা ফা-  
তিহার তফসীর ৫) তফসীর সূরায়ে ইয়াসীন ৬) তফসীর সূরা আর-  
রহমা-ন্ ৭) তফসীর সূরা ক-ফ । ৮) তফসীর সূরা ওয়া-ক্বিআহ ৯)  
বিশ্বনবীর অমৃতবানী ১০) প্রিয়নবীর অমিয়বাণী ১১) নাবী ও রসূল ১২)  
সলাতে মুস্তফা ১ম খণ্ড ১৩) ঐ ২য় খণ্ড ১৪) সিয়াম-ও রমাযান ১৫)



ঈদুল আয্হা ও কুরবানী ১৬) আকীকা ও নাম রাখা ১৭) ঈমান ও আকীদা ১৮) একমাত্র অহিকেই মানতে হবে ১৯) দৈনন্দিন জীবন ও ইসলামী দর্পন ২০) পাকা মাযার ও অসীলার তত্ত্বসার ২১) স্বপ্নের দেশে তেইশ দিন। ২২) সংক্ষেপে হজ্জ উম্‌রা ও যিয়ারাহ্ ২৩) মীলাদুননবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী ২৪) কাদিয়ানী কাহিনী ২৫) কুরআন ও তফসীরের ইতিবৃত্ত ২৬) হাদীসের ইতিবৃত্ত ২৭) হাদীসের সংরক্ষন যুগে যুগে। ২৮) ছয়জন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ২৯) চার-পাঁচশো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসূলে-হাদীস ৩০) বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইবনে তাইমিয়াহ। ৩১) অনুরসরণ যোগ্য ছয় ব্যক্তিত্ব ৩২) রসূলুল্লাহর মি'রাজ। ৩৩) ইসলাম ও মা-বাপ। ৩৪) ভাগ্য ও ইসলাম। ৩৫) শরীআত বিরোধী প্রচলিত কিছু রীতি। ৩৬) ভারতের মুসলিম পার্সোনাল 'ল'। ৩৭) কালিমায়ে তুইয়িবার শব্দাবলী ৩৮) ইসলামী তালাকবিধী ৩৯) ইলয়াসী তবলীগ ও দ্বীনে ইসলামের তবলীগ ৪০) তালাকপ্রাপ্তার খোরপোষ ও সুপ্রীমকোর্ট ৪১) আকীদার শুদ্ধি (অনুবাদ) ৪২) আহলে সুন্নাত অল জামাআতের আকীদা (অনুবাদ) ৪৩) সালাফী কায়দা (আরাবী) ৪৪) সালাফী বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ ৪৫) ঐ ২য় ভাগ ৪৬) সালাফী সাহিত্য বীথি। (ছাপার অপেক্ষায়)- ৪৭) তফসীর সূরা মূলক ৪৮) ইংল্যান্ডে ১৪ দিন। ৪৯) বিবাহ ও ইসলাম ৫০) শবেবরাতের প্রকৃত তত্ত্ব

## তফসীর সূরা ইয়াসীন, সূরা আর-রহমান,

## সূরা ওয়া-কিয়া ও সূরা কা-ফ

যাংলার অনুপম ইসলামী গবেষক অধ্যাপক মওলানা হাফেয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী রচিত আরবী ও উর্দু (৩০) টি নির্ভরযোগ্য তফসীরের সমন্বয়ে লিখিত সূরা ইয়াসীন ও সূরা আর-রহমান এবং সূরা ওয়া-কিয়া ও সূরা কা-ফ এর অনুপম তফসীর অবশ্যই পড়ুন। দাম :- ২০ ও ২৫ টাকা। পাবার ঠিকানা :- আহলে হাদীস কার্যালয়, ১নং মারকুইস লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১৬

## জ্ঞানীশুনীদের দৃষ্টিতে এই লেখক

এই লেখকের রচনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দুই বাংলার বিশিষ্ট রিজালবিদ আল্লামা আলীমুদ্দীন (রহঃ) তাঁকে “বাংলার ইবনে তাইমিয়াহ” নামে আখ্যায়িত করেছেন।

ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বক্তা ও ইসলামী বিদ্বান দিল্লীর মাওলানা মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী ও মাদানী সাহেব তাঁকে “এযুগের ইবনে হাজার আঙ্কালানী” বলে মন্তব্য করেছেন।

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট শাইখুল হাদীস আল্লামা আহমাদ হোসায়ন শ্রীমন্তপুরী তাঁকে “বাংলার আবুল কালাম আযাদ” বলে অভিহিত করেছেন।

পঃ বঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু আকড়া সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাওলানা আতাউল্লাহ সাহেব তাঁকে দুই বাংলার অনন্য প্রতিভা বলেছেন।

বাংলার বিশিষ্ট শাইখুল হাদীস ও প্রথিতযশা বক্তা মাওলানা আব্দুর রউফ শামীম সাহেব তাঁকে “বিপ্লবী সংস্কার, মন্ত্রমুগ্ধকর বাগ্মী ও মহিমুখী প্রতিভা” বলে উল্লেখ করেছেন।

মিশকাতের বাংলা অনুবাদক বাংলা-র বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আমীর আলী সাহেব তাঁকে “দুই বাংলার যুগ সংস্কারক, যুগস্রষ্টা ও অননুকরণীয় প্রতিভা” বলে মন্তব্য করেছেন।

বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উসমান গনী (এম,এ,পি,এইচ ডি, ডি-লিট)। সাহেব তাঁকে “কালজয়ী, অনন্য সাধারণ ও বিরল প্রতিভা” বলে মনে করেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁকে “বাংলার অনন্য ইসলামী গবেষক, অনন্য সাধারণ স্মৃতিধর ও ক্ষুরধার লেখক” বলে বিবেচনা করেছেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুনীরুজ্জামান সাহেবের মতে তাঁর লেখনীধারা গবেষকদের জন্য অনুকরণীয়।

বাংলার বিশিষ্ট আ-লেমে দ্বীন ও আধুনিক শিক্ষাবিদ মাওলানা আব্দুল কারীম ফাইযী (ফাযিল, ফাইযে-আ-ম, ইউ,পি, ও এম,এ ডবল, পি,জি,বি,টি, এম, এম, কোবিদ বলেন:-

কুরআন ও হাদীসের গবেষক সুযোগ্য অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেবের কয়েকখানি বই পড়ার পর আমার প্রতিক্রিয়া হল, তাঁর উপস্থাপনা এবং কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বরাত, মুহাদিস ও মুহাক্কিকীনদের সুচিন্তিত মতামত, মূলগ্রন্থের পাতা ও লাইন ইত্যাদির বরাত দিয়ে লেখার টেকনিক অভিনব।

এর এই কালজয়ী গবেষণার জন্য মুসলিমদের কাছে তিনি স্বয়ং গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক জওহরলাল নেহেরু পুরস্কারপ্রাপ্ত মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহঃ) (এম,এম, ফাস্ট ক্লাশ এম,এ, থিওলজি, ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, (আলীগড়) তাঁর সারগর্ভ মন্তব্যে বলেন:- কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের ছাত্রমুখকর সিনিয়র অধ্যাপক ও বাংলাভাষায় ইসলামী বইলিখনে অনুপম গবেষক এবং সমাজ সেবায় জনপ্রিয় সেবক মাওলানা হাফেয আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেব রচিত ৪০ এর অধিক বই পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। যার তুলনা ভারত পাক-বাংলাদেশে নেই বললেই চলে।

জুট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন সহকারী অর্থনৈতিক ম্যানেজার জনাব আব্দুস সালাম (এম,কম)) সাহেব বলেন:- আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাওলানা হাফেয শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেব বর্তমান যুগে এশিয়া মহাদেশের সুপণ্ডিত আলেমদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখনী ও বক্তৃতায় গবেষণামূলক তথ্য ও তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা অভাবনীয় ও বিতর্কের উর্দে। তাঁর লিখিত কতিপয় তফসীর আমি পড়েছি।



**Price Rs. 60/-**

<https://www.facebook.com/178945132263517>

প্রকাশক :- সুফিয়া প্রকাশনী